সেরা স্বনির্বাচিত গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পুষ্প
তের, বাঙ্গুর অ্যাভিন্যু, কলকাতা-পঞ্চান্ন

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্ণেন্দু চাকী

প্রথম প্রকাশ ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫, প্রকাশক ভারতী দত্ত, পুষ্প, প্রযত্নে ঘোষ লাইব্রেরী, বাঙুর অ্যাভেন্যু, 'বি' ব্লক, কলকাতা-৫৫। মুদ্রক ঃ নেপালচন্দ্র পান, সোনালী প্রেস, ২/এ ভোলানাথ পাল লেন, কলকাতা-৬। প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ প্রসেস সিনডিকেট।

আগুনের ঘর, জাফরির ছায়া

(১)

সকাল বেলাতেই খেলনা ভাঙার জন্য অভী মায়ের হাতে মার খেয়েছিল। অভী ভাবলো সে খেলনার দোকান দেবে। খুব সহজেই জায়গাটায় পৌঁছে যাওয়া যায়। যেন জানালার পর্দা সরালেই সেই জায়গাটাকে দেখতে পাবে সে। সে জায়গাটা এখানকার মতো নয়। সেখানে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে রেল লাইনটা সোজা চলে গেছে। ভারী বাতাসে বুনো গন্ধ। আর পাখি ডাকছে। কত রকমের পাখির ডাক—হরিয়াল, রাধেশ্যাম, ঘুঘু, কোকিল; বগুরী। মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, রেল লাইন আর পাথুরে নুড়ি থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তাপ। চারদিকে পাহাড়গুলো গভীর নীল। দেহাতী কুলিরা লাইন মেরামত করছে। স্টেশনটা খুব ছোট—একটা খেলনার মতো। চারদিকে মস্ত উঁচু গাছগুলো প্রকাণ্ড ডালপালা নামিয়ে স্টেশনটাকে ছায়া দেয়। সেই ছোট্ট স্টেশনটায় লোকজন নেই, কিংবা আছে হয়ত কিন্তু তাদের দেখা যায় না। সেইখানে অভী খেলনার দোকান দেবে।

সে জায়গাটা আছে কোথাও। কোনোদিন অভী সে জায়গাটা খুঁজে বের করবে। 'সেখানে যাওয়া যায়', অভী ভাবে—'আমি বাবার সঙ্গে যাবো। সেখানে মা যাবে না। মা'কে আমি নেবোনা। মা তখন আমার জন্য কাঁদবে।'

মা কাঁদবে, একথা ভাবতে অভীর ভালো লাগলো।

অভী বাবাকে গিয়ে বললো,—'বাবা, আমি খেলনার দোকান দেবো।'

বাবা হাসলো—বেশ তো। কোথায়?

—সে জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—ঠিক। আর একটু বড় হও, তখন দেখা যাবে।

—কত বড়?

—বারো বছর।

অভী মনে মনে হিসেব করলো।: বারো বছরের হতে এখনো পাঁচ বছর দেরী আছে।

(২)

কিভাবে যে গুলতি থেকে পাথরটা ছিটকে গেল অভী তা বুঝতে পারেনি।

জেরী মাটিতে বসে পড়লো, হাতের এয়ারগানটা ছিটকে পড়লো দূরে। আর ঝাপ থেকে কাকটা সতর্কভাবে দুবার ডেকে উড়ে গেল। জেরী দু'হাত দিয়ে

বুক চেপে ধরে নিঃশ্বাস টানবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অভী ভাবলো—'ও ম
যাবে।' একবার অভীর ইচ্ছে হ'ল পালিয়ে যেতে। সাহেব পাড়ার রাস্তাটা ভয়ঙ্ক
নির্জন। কিন্তু সে নড়তে পারলো না।

জেরী উঠে দাঁড়ালো। দুটো হাতে মুঠো পাকালো। দু পা এগিয়ে এসে প্র
করল—কে তুমি? অভী বললো—'অভি'। জেরী হাল্কা পায়ে এগিয়ে এলো দাঁতে
দাঁত চেপে ইংরিজিতে বললো—'তুমি আমাকে মেরেছো। এখন?'

অভী ইচ্ছে করে মারেনি। আসলে অভী কাকটকে মারতে চেয়েছিল; ঝোপে
ওধারে জেরীকে সে দেখতেই পায়নি। কিন্তু কথাগুলো বলবার সময় পেলোনা সে
জেরী তাকে মারলো। প্রথম ঘুঁষিটাই অভী আটকাতে পারলো না। ঘুষিটা পে
লাগলো। ভয়ংকর জোরে। অভীর মনে হল তার চোখের সামনে সবকিছুই একবা
পাক খেয়ে গেল। সে দুটো হাত উঁচু করে একটা কিছু ধরতে চাইলো। দ্বিতী
ঘুষিটা নাকে এসে লাগলো। অভী পড়ে গেল। জেরী জুতোসুদ্ধু পা দিয়ে লাথ
মারলো তার কোমরে। বললো,—'ব্লাডি।'

অভীর মনে হল তার মাথার ভেতরটা হাল্কা হ'য়ে ধোঁয়াটে হয়ে গেল। সে
অনুভব করলো, তার মুখের পাশে, গালে নরম মিহি ধুলো লেগে যাচ্ছে। দাঁতে
দাঁত চাপলো সে। মুখের ভেতর ধুলো কিরকির করলো। নাকে ধুলোর গন্ধ
আস্তে আস্তে তার যন্ত্রণার অনুভূতি লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছিল। তার কি হ'য়েছে তা'ও সে
ভুলে যাচ্ছিল। সেই অস্পষ্ট ঘুমের মতো অনুভূতির মধ্যেও সে টের পেলো কেউ
যেন ছুটে এলো। ধাক্কা মেরে জেরীকে সরিয়ে দিয়ে কি যেন চিৎকার ক'রে বললো।
আর তারপর নরম সুগন্ধী দুটো হাত তাকে জড়িয়ে ধরলো। টেনে তুললো তাকে
মাটি থেকে। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস তার মুখে লাগলো। সে জেন—অভী পরে
জেনেছিল। বারো বছর বয়সেও অভীর দেহটা হাল্কা। এতো হাল্কা যে পনেরো
বছর বয়সের মাঝারি গড়নের জেন তাকে অনায়াসে দুই হাতের ভেতর তুলে নিল।

অভী ভাবলো—'শোধ নেবো'।

মা বলতো,—খবরদার ওই ড্রয়ার খুলো না।

—কেন?

— প্রশ্ন কোরো না, যা বলছি শোনো। ওখানে কখনো হাত দিও না।

কিন্তু অভী জানতে পেরেছিল ওই ড্রয়ারে কি আছে। দুপুরবেলা চুপি চুপি অভী এসে যেই 'চেস্ট-ড্রয়ার্স' এর কাছে দাঁড়ালো। ড্রেসিং টেবিলের ওপর চাবির গোছাটা প'ড়ে ছিল, যেটা আনতে অভীর ভয় করেনি।

অভী চাবিটা ঘোরালো। কোনো শব্দ হ'ল না। অভী ড্রয়ারটা টানলো। কাগজ ছেঁড়ার মতো খস্ খস্ শব্দ ক'রে ড্রয়ারটা খুলে গেলো। অভী হাত বাড়ালো। হাত টানলো। তারপর তাকালো।

তার হাতের তেলোয় ছোট্ট, ভারী রিভলভারটা ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠলো। অভী

কয়ে রইল। তার বাবার রিভলভার। ঘরটা নির্জন। কেউ নেই। ও ঘরে মা মাচ্ছে। অভী রিভলভারটা তুললো, তর্জনীটা বেঁকিয়ে ট্রিগারটার ওপর রেখে দাঁড়ালো। এখন সে অনায়াসে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। কেউ বাধা র না। জেরী তাকে মেরেছে। সে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে, তার নাক কেটে ছ, মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছে। কেন ও তাকে মারলো? সে ইচ্ছে ক'রে জেরীকে রনি, জেরীকে সে দেখতেই পায়নি। হঠাৎ এই নির্জন ঘরে ভয়ঙ্কর রাগ হ'ল ি'র। জেরীর বাবা মা দু'বেলা এসে তার খোঁজ নিয়েছে, জেন তার পাশে ব'সে ালেটের মোড়ক খুলে তাকে খাইয়েছে, জেরীকে তিন দিন ঘরে বন্ধ করে রাখা য়েছে—এ খবরও তাকে দিয়েছে জেন। তবু অভীর রাগ গেল না।

জানালা দিয়ে দুপুরের রোদ হ্রস্ব হ'য়ে এসে পড়েছে কার্পেটের ওপর। একটা ছর ছায়া ছবির মতো কার্পেটে আঁকা। ছায়াটা দুলছে। অভী তাকিয়ে রইল। া ঠাণ্ডা? সেই ঠাণ্ডা ভাবটা অভীকে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে রইল। অভী লো—'জেরী মরে যাবে। ওকে আমি মেরে ফেলতে পারি।' অভী বললো—ডি। জেরীটা ব্লাডি।' আর কোনো কথা তার মনে এলো না।

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে অভীর মনে হ'ল সে চলতে পারছে না। পা' টা আড়ষ্ট। অভী বাড়িয়ে দেওয়া পা'কে আবার টেনে নিল। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ল। 'আমি ভয় পাচ্ছি',—অভী ভাবলো। তার কপালে একটু একটু ক'রে ঘাম লো। তার পা দুটো থর থর ক'রে কাঁপলো। তবু অভী দাঁড়িয়েই রইল।

অভী দাঁড়িয়েই রইল। কতক্ষণ যে সে জানে না। তারপর হঠাৎ তার চট্‌কা লো। খেয়াল হ'ল অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ? একঘণ্টা, না, ও বেশী! জানালার রোদটা দীর্ঘ হয়েছে, রঙটা হলদে হ'য়ে গেছে। এক্ষুনি ল হবে।

অভী ফিরে এলো। রিভলভারটা রাখলো। চাবি ঘোরালো। সে ভাবলো,— ভলভারটায় গুলী ছিল না'। বাবা কখনো গুলী ভরে রাখে না। পরীক্ষা করে তে তার সাহস হ'ল না। অভী বেরিয়ে এলো।

ল্যাংড়া আমের বাগান পার হ'য়ে রেল লাইনের ঢালু জমিটা দিয়ে নেমে এসে , জল জমে থাকা খাদটা লাফিয়ে গেলেই সেই দ্বীপের মতো জায়গাটা। মুকুন্দ রের সঙ্গে অনেকবার এখানে এসেছে অভী। মুকুন্দ মিশির কাঠ কাটতো আর ী বসে বসে পাখি দেখতো। যখন তার সাত বছর বয়েস ছিল তখন সে মুকুন্দ রের কাঁধে চড়ে এখানে আসতো। এখন আর আসে না। আজ এলো অনেকদিন ।

শিমুল গাছটার তলায় অভী চুপ ক'রে বসলো। একটা পাতা তুলে নিয়ে আস্তে ত ছিঁড়তে লাগলো। তার চারদিকে পাখির ডাক। পাতা ঝ'রে পড়ার অস্পষ্ট । অভী ভাবতে লাগলো।

এখানে নয়। এখানে নয়। অনেক দূরে কোথাও। সেই ঘোড়াটা তাকে নিয়ে

যাবে। কতোবার সেখানে যেন গিয়েছে অভী নিজে নিজে। একা। মস্ত উঁচু কা
রঙের সেই ঘোড়া, পিঠে জিন পরানো। ঘোড়াটা হাওয়ার আগে ছুটতে পারে।
জায়গাটা অভী চেনে না, তবু যেন চেনে। লাল কাঁকরের পথটা এগিয়ে গিয়ে শিম
গাছে ঘেরা সেই আশ্চর্য শান্ত স্বচ্ছ দীঘিটা পার হ'য়ে সেখানে পেঁছে যাওয়া যা
ওখানে আবার সবাইকে দেখতে পাবে সে,—মা, বাবা, মুকুন্দ মিশির, জেন। এখানক
মতো কোনো কিছু সেখানে ঘটবে না, সেখানে সব অন্যরকম হ'বে। অভীর ইচ্ছে মা
হবে। জেনকে মনে পড়লো অভীর।—জেরীর বোন। নরম, উষ্ণ, সুগন্ধী হা
গন্ধটা যেন ও-রকম হাতে এমনিতেই থাকে—কোনো সুগন্ধী মাখতে হয় না। সেই হ
দুটো তার কাছে কাছে থাকবে। সে পড়ে গেলে, দুঃখ পেলে সেই হাত দুটো ত
টেনে নেবে।

'মুকুন্দ মিশিরের কাছে আমি কুস্তি শিখব'—অভী ভাবলো। 'জেরীর ব
সতেরো, আমার বারো। তাই ও আমাকে মেরেছে মারতে পেরেছে। কিন্তু অ
তখন ছোটো থাকবো না। অনেক অনেক বড়ো হবো। তখন আমার বয়স পঁচিশ
ছাব্বিশ হবে।'

উরুতে চাপড় মেরে নরম মিহি মাটির ওপর সে মুকুন্দ মিশিরের সঙ্গে কুস্তি লড়া
হাপরের মতো দম ছাড়বে দু'জন, ইঞ্জিনের মতো হাঁফাবে। গা দিয়ে ঘাম ঝরবে দর
ক'রে। তার গায়ে জোর হবে। রোজ সকালে ছোলা ভেজানো খাবে সে, আর বাদা
অনায়াসে সে জেরীকে 'চিৎ' করে দিতে পারবে তখন। ইচ্ছে মতো শাস্তি দিতে পা
তাকে। সে কাউকে ভয় পাবে না, অথচ আর সবাই তাকে ভয় পাবে।

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে যেন কতোবার ঐ দেশে পেঁছে গেছে অভী
দূর থেকে ট্রেনের বাঁশীর কান্নার মতো শব্দটা তাকে ডেকে গেছে যেন। চারদি
নির্জন পৃথিবীটা ছাড়িয়ে ওই ট্রেনটা দূর থেকে দূরান্তরে, যেন অন্য কোনো
চলেছে। চারদিকে ঘন অন্ধকার আর অস্পষ্ট কুয়াশা ভেদ করে ট্রেনটা চলেছে, চলে
যেন কোনোদিন থামবে না। সেই ট্রেন তাকে ডেকে যায়। বালিশে কান রেখে
শুনতে পায় মাটি থেকে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজের মতো একটা শব্দ ট্রেনটার গতির
তাল রেখে বাজতে থাকে। ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্।

'আমার যখন পঁচিশ বছর বয়স হবে'—চারদিকে ঘন হ'য়ে আসা বিকেলের
বিষণ্ণ চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে অভী ভাবলো—'আমি তখন ভয় পাবো না।'

অভী উঠে দাঁড়ালো।

'আমি ভেবেছিলাম খেলনার দোকান দেবো।'

'দিতে পারলে?' মৌ হেসে ফেললো—'বেশ মানাতো কিন্তু তোমাকে। চার
অনেকগুলো মরা খেলনার মধ্যে একটা জ্যান্ত খেলনা! দেবে দোকান?'

'হ্যাঁ, এই তো দোকান—আমার চারদিকে। তুমি আমি সবাই সেই দো

ছ।' অভী মনে মনে বললো। মুখে কিছু বললো না। বলতে সাহস হ'ল না।
ী চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল।

ঘরটাতে বিকেলের হলদে রোদ আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। অভী মৌকে দেখতে লো। মৌ শাড়িটাকে আঁট ক'রে পরেছে, আঁচলটা ঘুরিয়ে কোমরে বাঁধা। পা'য়ের ার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হাল্কা বাঁশের আগায় লাগানো ঝাড়ন দিয়ে ছাদের ঝুল চ্ছে ও। ওর মস্ত খোঁপাটা কাঁধের ওপর ভেঙে পড়েছে। ঘামে ভেজা লালচে খর একটা পাশ দেখতে পাচ্ছে অভী। ও উঁচু হ'য়েছে, শরীরটাকে যতদূর সম্ভব্ ারিত করতে চেষ্টা করছে। অভী ওর কোমরের সামান্য অনাবৃত অংশ দেখতে লো। সাদা, মসৃণ চামড়া। অভীর হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল আর একটু সাহসী হ'তে। ী ভাবলো—'ওর কাছে যাবো? ওকে ছোঁবো একটু?' অভী উঠলো না। সে কে দেখতে লাগলো। ঘরের ভেতর থেকে রোদটা চুপি চুপি সরে যাচ্ছিল। সেই দটা অভীর পা ছুঁয়ে তারপর তার পায়ের কাছেই নিভে গেল।

—বাঃ, চুপ ক'রে আছো যে? মৌ হাল্কা বাঁশের ঝাড়নটা ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে খ অভীর দিকে ফিরলো। আঁচলটা খুলে মুখ মুছলো তারপর সেই আঁচলটা রয়েই বাতাস খেতে লাগলো।

—কি বলবো? অভী বললো।

—যা খুশি তোমার, কি হতে চেয়েছিলে তুমি আর কি হ'তে চাও সব বলো। ামার বক্‌বকানি থামলে আমার ভালো লাগে না।

'আসলে তুমি ভয় পাচ্ছো।' অভী মনে মনে বললো—'বাড়িতে কেউ নেই, তাই ামাকে তোমার ভয়। ঠিক আমাকেও ভয় নয়, আমার চুপ করে থাকাকে ভয়। চুপ রে থাকলে আমি বেশী বিপজ্জনক হ'তে পারি।'

—কি ভাবছো?

—সব কথা বলা যায় না। বলতে নেই।

—যা বলা যায়, তাতো বলতে পারো! মৌ হাসলো।

অভী তাকালো। মৌ হাসলো। অভী দেখলো ওর বড়ো বড়ো চোখ দুটো পলো, কুঞ্চিত হ'য়ে গেলো, ঈষৎ পুরু ঠোঁট দুটো প্রসারিত হ'ল, একটা তরঙ্গ গালের পর দুটো টোলকে ঘিরে কাঁপতে লাগলো। ঠোঁট দুটো সম্পূর্ণ সরে গেল না; দাঁত- লো অর্ধেক ঢাকা রইলো। ওর সমস্ত মুখটা উজ্জ্বল হ'য়ে হাসতে লাগলো। সিটা অদ্ভুত। যেন কোনো মানে নেই এই হাসির, তবু যেন আছে। হাসিটা যেন ভীকে বললো—'ভয় কি?' অভী মৌ'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। চেয়ারের তল থেকে হাত দুটো নামিয়ে কোলের ওপর জড়ো ক'রলো অভী। সে মনে মনে লো 'জানো আমি রাজপুত্র হ'তে চেয়েছিলাম! আমি ভেবেছিলাম সেই কালো পিঠে চড়ে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। কোথায় যাবো, ঠিক। সে খুব ছোটবেলাকার কথা, আমার ভালো মনেও নেই। তবে আমি জানি, কটা কিছু হতে চেয়েছিলাম। তুমি শুনলে হাসবে। হাসবে আমি জানি।

কিন্তু তুমি কাঁদবে। মনে ক'রে দেখো, তুমিও একটা কিছু হ'তে চেয়েছিলে। স
আমরা একটা কিছু হতে চাই, অথচ অন্যের সাধ শুনলে হাসি। সেই হওয়াটা
হ'য়ে ওঠে না। মৌ, তখন আমরা কাঁদি।'

—মৌ, তুমিই বলো না, তুমি কি হতে চাও।

—কি আবার! মৌ ভ্রূ দুটো কোঁচকালো বিরক্তিতে। তারপর শরীরটাতে এ
ঝাঁকানি দিল।

ওর শরীরটাকে দেখলো অভী। ওর হাতে, আঙুলে, কণ্ঠায়, মুখে কোথাও এ
হাড় উঁচু হ'য়ে নেই। হাড়গুলো পরিমিত, সুন্দর মেদে ঢাকা। সেই মেদও সু
মসৃণ চামড়ায় মোড়া। একটু দীর্ঘও, তাই সামান্য রোগা দেখায়। মুখটা
শরীরের তুলনায় বেশ ছোট, তাই বোধ হয় বয়সের তুলনায় ওকে ছোট দেখায়। কপা
প্রশস্ত নয়, কপালের ঠিক মাঝখান থেকেই যেন সেই নিবিড় কালো চুলের গোছাটা
হয়েছে। ওর কাঁধ দুটো নোয়ানো—ও দাঁড়ালে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা একটু অসহায়
হয়। সেই অসহায় ভঙ্গিটা বদলাতে চাইলো মৌ, শরীরটাতে ঝাঁকানি দিয়ে দৃপ্ত
চাইলো। তির্যকভাবে অভীকে দেখলো ও।

—ওভাবে তাকিয়ে রয়েছো কেন?

—ভাবছি। অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে গেল।

—ওভাবে তাকিয়ে কেউ ভাবে নাকি! তুমি একটা পাগল।

—পাগল হওয়ার বয়েস কি এখনো আমাদের আছে মৌ?

—কি জানি বাপু, ওসব কথা বুঝি না। মৌ ঠোঁট দুটো ছুঁচোলো কর
তারপর হেসে ফেললো,—'আসলে তুমি এখনো ছেলেমানুষ। ছাব্বিশ বছর
খোকা একটি।'

—কোনো কোনো মানুষ আছে যারা বয়েস বাড়াটাকে টের পায় না। কেমন
যে বড় হ'য়ে যায় তা বুঝতেই তাদের বিস্তর সময় লেগে যায়। অথচ তারা ি
খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। আমি বোধ হয় সেই রকম।

—তোমার তত্ত্বকথা রাখো। আমার শোনবার সময় নেই। রান্নাঘরে মা একা

—বেশ, কি করতে হবে বলো।

মৌ হাসলো। তর্জনিটা উঠিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ালো। বললো—চুপ
থাকো।

—তাহলে মৌ-নব্রত? অভী একটু টেনে উচ্চারণ করলো।

ঘরটা অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। অভী মৌ-র মুখটা দেখতে পেলো না।
মৌ কাছে এলো। ওর ঘামে-ভেজা শরীরের অস্পষ্ট মিষ্টি গন্ধ অভীর নাকে এ
তারপর সুডৌল, নরম একটা হাত অভীর মুখটাকে চেপে ধরলো। অভী
উঠলো। একটা অস্পষ্ট চেনা সুগন্ধ। মৌ হাতটা চট ক'রে সরিয়ে নিল।
ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো—'অসভ্য'।

অভী হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু মৌকে পেলো না। মৌ এই প্রথম তাকে

ক'রে ছুঁলো। সে নিঃশ্বাস টানলো। মৌ সরে গেছে।

খুট ক'রে সুইচ টিপে মৌ আলো জ্বাললো। আলোটা যেন অভীকে জোরে একটা চড় মারলো। সে চমকে উঠলো।

আলোতে মৌকে আবার দেখলো অভী। ওর মুখটা লাল টুকটুক করছিল। মৌ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পর্দাটা হাত দিয়ে অল্প একটু ফাঁক করলো। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

—অভী চুপ ক'রে রইলো। অভী ভাবতে লাগলো। মৌ হঠাৎ কথা বললো।

—এই, তুমি যাবে না? সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। বাড়ি যাও এবার।

—এত তাড়া?

—তাড়াতে চাই যে। বাবার আসবার সময় হ'ল, কাবেরীও ফিরবে এইবার। মৌ অভীর দিকে ফিরে একটু হাসলো। হাসিটা ম্লান নয়। হাসিটা উজ্জ্বল।

অভী উঠে দাঁড়ালো।

অভী ছোট্ট উঠোনটা পার হল। তালা খুলল। নির্জন ঘরটায় ঢুকলো। কেউ নেই যেন চারদিকে। কেউ ছিলও না। অভী চেয়ারটা টেনে বসলো। টেবল্ ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে একটা বই টেনে নিল। কিন্তু পড়তে বসলো না। কেবলই যেন একটা অস্পষ্ট সুগন্ধী কোমল হাত তার মুখে হাত বুলিয়ে দিল। চোখের সামনে মৌ যেন হাসলো। সেই নিঃশব্দ, সুদৃশ্য হাসি।

'এই নির্জন লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটা'—অভী ভাবলো, ভাবতে লাগলো—'এই বাড়িটা এ রকম থাকবে না। কারো আশ্চর্য হাতের স্পর্শে ভরে উঠবে এই বাড়ি। মৌ আসবে একদিন। আমাকে ঘিরে রাখবে মৌ, আমাকে বন্ধন দেবে, সুখ দেবে, সন্তান দেবে। আমার ছোট্ট দুটো সুস্থ সবল ছেলেমেয়ে ঐ উঠোনটাতে খেলে বেড়াবে। ওদের উচ্ছকিত হাসির শব্দ আমি ঘরে বসেও শুনতে পাবো। অনেক দূর থেকে কর্মক্লান্ত সময়গুলোর যতিতে ওদের আশ্চর্য সুখস্পর্শ পাবো আমি। আমাকে ওরা টেনে আনবে। আমাকে ওরা টেনে আনবে। এইখানেই সেই আশ্চর্য নতুন পৃথিবীর শুরু হবে। মৌ আমাকে বন্ধন দাও।'

নিজেকে বড়ো ক্লান্ত মনে হ'ল অভীর। কতোদিন ধরে সে যেন একা। এই নির্জন ঘরটা তাকে মাঝে মাঝে ক্লান্ত করেছে। প্রথমে বাবা মারা গেল, তারপর মাও। অভী কেঁদেছিল। সেই কান্নার যেন কোনো ছেদ ছিল না। সে ভেবেছিল—'আমি বাঁচবো কি ক'রে? কি ক'রে আমার চারদিকের এই পৃথিবীটা চলবে?' অভী ভেবেছিল তার নিঃসঙ্গতা কোনোদিন ঘুচবে না। 'কিন্তু মৌ এলে আবার আমি সব কিছু ফিরে পাবো'—অভী ভাবলো। অভী নির্জন ঘরে খুব আস্তে নিজেকে শুনিয়ে ডাকলো—'মৌ, মৌ, মৌ।' অভী নামটাকে বারবার উচ্চারণ করলো, নামটাকে ভাঙলো, বদলালো। বারবার বললো—'মৌ, তুমি আমাকে সেই শান্তি দাও, সেই বন্ধন দাও।'

পাঁচ বছর পর। অভী বললো,—'মৌ আমাকে মুক্তি দাও'। তার কথা কেউ শুনলো না। অভী নিজেকেই নিজে বললো।

অভী বিছানার ওপর উঠে বসলো। অনেক রাত। অভী হাত বাড়িয়ে জানালাটা খুলে দিল। আকাশে মস্তো চাঁদ। অভী গরাদের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বিছানার দিকে তাকালো। ঠিক তার পাশেই বিকু—তার চার বছর বয়সের মেয়ে। বিকু বালিশ থেকে মাথাটা সরিয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। বিকুর পাশে টুকু—ওর বয়েস তিন বছর। টুকু চিৎ হ'য়ে হাঁ ক'রে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার ওপাশে মৌ-র কোল ঘেঁষে, ওর বুকের সঙ্গে লেগে শুয়ে আছে টুলু,—অভীর এক বছর বয়সের ছেলে। মৌ বাঁ হাতটা দিয়ে টুলুকে জড়িয়ে আছে, মৌ-র মুখটা এপাশে ফেরানো। অভী তাকিয়ে রইলো। মৌ অনেকটা দূরে—অভী ভাবলো। অথচ মৌ কাছে ছিল। বুকের কাছে মৌ-র নরম মুখটা চেপে লেগে থাকতো ওর চুলগুলো অভীর গলায় জড়িয়ে যেতো, গালে মুখে স্পর্শ করতো। হাত বাড়ালেই, কিংবা হাত না বাড়ালেও মৌকে পাওয়া যেতো তখন। বিকু, টুকু, টুলু এলো তারপর। মৌ আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। এখন অভী আর মৌ-র মাঝখানে বিকু, টুকু, টুলু। এখন হাত বাড়ালেই মৌকে পাওয়া যায় না, ওদের ডিঙিয়ে যেতে হয়।

'মৌকে পাওয়া যায় না'—অভী ভাবলো—'মৌকে পেতে নেই। স্পর্শ করলেই মৌ মরে যায়, আর তাকে কিছুতেই বাঁচানো যায় না'। অভী নিঃশব্দে উঠলো। দরজা খুললো। বাইরে এলো। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তাকে স্পর্শ করলো। চাঁদের আলো জাফরি ঘেরা বারান্দায় পড়েছে। জাফরির ছায়া একটা সুন্দর জালের মতো বিছিয়ে আছে। অভী পা বাড়ালো।

অভী নিজের ছায়ার দিকে তাকালো। ঈষৎ তির্যক ছায়া, মাথাটা দোমড়ানো, কাঁধদুটো উঁচু নিচু। চাঁদের আলোটা বেঁকে পড়েছে।

'একটু সাহসী হ'লে'—অভী ভাবলো—'আর একটু সাহসী হ'লে এই উঠোনটা পার হ'য়ে যাওয়া যায়। তারপর মৌ থাকবে না, বিকু, টুকু, টুলু কেউ থাকবে না অথচ এরা সবাই থাকবে। এই ঘর, এই দেয়াল ওদের বন্ধ ক'রে রেখেছে। মৌ এই দেয়ালের মধ্যে থাকতে থাকতে, এই ঘরের মধ্যে থাকতে থাকতে দেয়ালের মতো হ'য়ে গেছে। ঘরটা আগুনের, সেই অসহ্য আগুন ওকে পুড়িয়ে মেরেছে'।

এই আগুনের ঘর থেকে বাইরে যাওয়া যায় না। এই ঘরে বিকু টুকু টুলু বড় হ'তে থাকবে। ওরা আমাকে জড়িয়ে থেকে, আমাকে অবলম্বন ক'রে বড় হ'তে থাকবে আর আমি মরে যাবো।

মৌও মরে যাবে। আর একজন মৌ অভীর বুকের ভেতর ঘুরে ঘুরে কাঁদবে সেই কান্নার বাঁত নেই। অভী সেই কান্নাকে শুনবে। আর একজন মৌ কাঁদছে—অভী শুনতে পাবে, একটা শালিখের মৃতদেহকে ঘিরে আর একটা শালিখ যেমন কাঁদে অভী অস্থির হবে, হাত বাড়াবে। কিন্তু মৌকে পাবে না।

অভী ঘরে ঢুকলো। দরজা বন্ধ করলো।

বুকচাপা অন্ধকার ঘরটা তাকে চেপে ধরলো অন্ধকারটা নির্মম, কঠিন। একটা কুয়োর মতো একমুখী, গভীর, নিশ্চিত।

অথচ যেন যাওয়া যায়। এখনো যেন চলে যাওয়া যায়। কোনোদিন যাবে অভী সেইখানে। ভাবতে ভাবতে অভী নিশ্বাস ফেললো। তখন আবার ওরা নিবিড় হয়ে ফিরে আসবে। আগুনের ঘর থেকে মুক্তি পাবে ওরা।

'কিন্তু আমি তো সুখেই আছি। কেন ভাবছি মৌ মরে গেছে, কেন ভাবছি এখানে সুখ নেই। এই তো আমার আত্মীয়রা আমাকে ঘিরে আছে। সুস্থ সবল বিকু টুকু টুলু আর ওদের মা। আমার যা আয় তাতে বেশ চলে যায় আমাদের ক'জনের।' অভী নিজেকেই নিজে বললো। 'পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ঘর, উঠোনে তুলসীর মঞ্চ—রোজ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, শাঁখ বাজে। আমাকে ঘিরে শান্ত, সংযত সুন্দর সংসার। আমি লাইনে গেলে, যাওয়ার সময় দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মৌ—আমার নিরাপদে ফিরে আসবার জন্য মনে মনে প্রার্থনা করে, ওর ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল পরম বিশ্বাসে আমার পকেটে গুঁজে দেয়। আবার আমার ফিরে আসবার প্রতীক্ষা করে, রাত জেগে বসে থাকে, ঘড়িতে সময় দেখে, ট্রেনের শব্দ কান পেতে শোনে। আমার বিরক্তিকে ওরা বোঝে, আমার অবসরকে ওরা জানে, আমার আনন্দে ওরা সায় দেয়। এই তো সুখ আমাকে জড়িয়ে আছে।'

কোথায় যেন খুব সূক্ষ্ম তারে মৃদু আঘাতে বাজলো। সেই আঘাতটা বিস্তৃত হ'ল, একটা সুরের পর্দায় বাঁধা পড়লো। অভী ভাবলো তার দুঃখটা যেন বিলাস।

অভী চোখ বুজলো। অভী যেন শুনতে পেলো ঝাউগাছে বাতাস আছড়ে পড়ার শব্দ। ঝাউগাছ দুললো। দুলতে লাগলো। সমস্ত পাহাড়গুলোকে এতক্ষণ আলো দিচ্ছিল সূর্যটা। এখন ডুবে গেল। অন্ধকার।

শুকনো পাতা মাড়িয়ে অনেকদূর বন-বনান্তর থেকে তারা ফিরে এলো। ওরা শিকারে গিয়েছিল সবাই। ক্লান্ত দেহে ওরা নিজেদের গ্রামে ফিরে এলো। একটু পরে মহুয়া বনের কাছে ওরা জড়ো হ'ল। বাতাসে মহুয়ার তীব্র গন্ধ। ফুল ঝ'রে পড়ার টুপ্‌টাপ্‌ শব্দ। আগুন জ্বললো। গাঁয়ের সবচেয়ে বুড়ো লোকগুলো গাছের গুঁড়ির চারপাশে চুপ করে বসেছে। ওদের মুখে আগুনের শিখা কাঁপলো। তারপর নাচ শুরু হ'ল।

যাদের বয়েস অল্প তারাই হাত ধরাধরি করে নাচ শুরু করলো। ওরা ঝুঁকলো, শালিখের ধান খুঁটে খাওয়ার ভঙ্গিতে দুললো, ছিলা ছিঁড়ে যাওয়া ধনুকের মতো ওরা সোজা হ'ল, পিছনের দিকে ঝুল খেয়ে আকাশের দিকে তাকালো। আগুনটা ঠিক মাঝখানে জ্বলতে লাগলো, কাঁপতে লাগলো। একটা করে মেয়ে আর একটা করে ছেলে পাশাপাশি—এ ওর কোমর জড়িয়ে ধরে। ওদের বৃত্তটা কখনো বড় হচ্ছে, কখনো ছোট। ওরা গোল হয়ে নাচছে।

একটু আগে ওরা মহুয়ার মদ খেয়েছে, আর আগুনে ঝলসে নেওয়া মাংস। ওরা সবাই মাতাল। ওদের চোখ নেশায়, শ্রমে আর ঘুমে ঢুলে আসছে। তবু ওরা নাচছে। ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া মাঠ পার হয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ওদের দেহগুলোকে ছুঁয়ে মহুয়ার বন আর ঝাউগাছকে দুলিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে।

তবু ওরা নাচছে, নাচছে, আর নাচছে। 'এই নাচ যেন কোনো দিনই না থামে' অভী ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো—'আমি থাকবো না, তখনো নয়।'

ওরা সবাই সাহসী। আবার সকাল হবে। রাত্রির সমস্ত অবসাদ আর আনন্দকে ভুলে গিয়ে ওরা কাঁধে ধনুক নেবে। তারপর জোয়ান মদ্দ মানুষগুলো পাহাড়ের দিকে পাড়ি দেবে। মেয়েরা ফসলের ক্ষেতে যাবে। কেউ কাউকে মনে রাখবে না। ওদের শিশুরা বড় হবে, ওদের মতোই সাহসী হবে। বেঁচে থাকাকে ওরা পরোয়া করবে না, তাই বাঁচতে বাঁচতে ওরা ক্লান্ত হবে না।

হরেন দত্ত একটা গল্প বলছিলেন। বাকী তিনজন তাকে ঘিরে বসে শুনছিলেন। সকলেরই বয়স ষাটের ও-পাশে।

টেবিলের ওপর একটা ঢাউস লণ্ঠন জ্বলছে। অভী টেবিলের ওপর বাঁ হাতের কনুইটা চেপে সেই হাতেরই তেলোর ওপর বাঁ গালটা চেপে তাকিয়ে আছেন। তার বাঁ দিকে অম্বুজাক্ষ মিত্র চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মাথাটা কাত করে চোখের কোণ দিয়ে হরেন দত্তকে দেখছেন। অভীর ডান দিকে চন্দন সিং। চন্দন সিংয়ের দাড়িগুলো সাদা, মাথার পাগড়িটাকে দেহের তুলনায় মস্ত মনে হয়। দু হাতে লাঠিটাকে ধরে হাতের ওপর থুঁতনিটা রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছেন উনি। দাড়িগুলো চাপ বেঁধে এগিয়ে এসেছে—অনেকটা পরচুলার মতো। বুড়ো পুতুলের মতো চোখ বুজে মাথা নাড়ছেন চন্দন সিং। হরেন দত্ত অভীর মুখোমুখি—টেবিলের ও-পাশে। হরেন দত্ত টেবিলের ওপর দু' হাতের ভর দিয়েছেন—কারো দিকে না তাকিয়ে গল্প বলছেন তিনি। গল্পটা প্রেমের এবং একঘেয়ে। হরেন দত্তের কথায় শ্রী-ছাঁদ নেই—বায়না ধরা রোগা ছেলের কথার মতো বিরক্তিকর। অভী ভাবলেন, গল্পটা কেউ বোধহয় শুনছে না। হরেন দত্তর মুখটা বিচিত্র রেখার আঁকিবুঁকিতে প্রবীণ এবং নীরস, কিন্তু চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। হরেন দত্ত গল্প বলায় বেশ উৎসাহী—এ আসরে তিনিই সবচেয়ে ছোট, সবে ষাট পেরিয়েছেন। অম্বুজাক্ষ মিত্র তাকিয়ে আছেন, কিন্তু কিছু শুনছেন না। বোধ হয় অন্য কিছু ভাবছেন। তাঁর বয়স প'য়ষট্টি। চন্দন সিং জেগে আছেন না ঘুমুচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না। তিনিই সবচেয়ে প্রবীণ। বয়স সত্তর। অভী নিজের কথা ভাবলেন। তাঁর বয়স চৌষট্টি।

হরেন দত্তর গল্পটা একঘেয়ে। তবু গল্পটা যেন অভীকে টেনে রাখছে। অভী অন্য কিছু ভাবতে চাইলেন, পারলেন না। গল্পটা প্রেমের। কবে প্রথম বয়সে হরেন

দত্ত কমলা নামে মেয়েটিকে ভালবেসেছিলেন। তাকে পাননি। গল্পটা জমজমাট হয়ে এসেছে। অভী শুনতে লাগলেন। একটা মৃদু, টোকার মতো শব্দ করে একটা পোকা ঢাউস লণ্ঠনটায় ধাক্কা খেলো আর তারপর ঘুরতে লাগলো।

হরেন দত্ত বললেন—'একটা বিবর্ণ শুকনো পাতার মতো মুখ করে কমলা বসে রইল। আমার যেন মনে হচ্ছিল পরাশর আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। আমি জ্বলে উঠতে চাইলাম। সবকিছুই যেন স্পষ্ট হয়ে এলো।' হরেন দত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অম্বুজাক্ষ মিত্র টেবিলের দিকে না তাকিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দোক্তার কৌটোটা খুঁজতে লাগলেন। দেয়ালে গভীর গর্তের মতো একটা জানালা। অভী ভাবলেন হরেন দত্তর গল্পটা যেন একটা অন্তহীন গানের মতো। একটা অনুভূতির বৃন্তকে ঘিরে গল্পটা যেন ফুলের মতো ফুটে উঠছে। মনের কোন্ আবছা কক্ষে একটা যন্ত্র বাজছে—একটা অদৃশ্য হাত পুরোনো, ভুলে-যাওয়া কোন এক সুরকে বাজিয়ে যাচ্ছে। চন্দন সিং ঘুমের ঘোরে কি যেন বললেন, শোনা গেল না।

'তারপর বয়স বাড়লো। আগুন নিভলো। কিন্তু কোথায় যেন ছোট্ট আগুনের মতো একটু জ্বালা থেকেই গেল। সেই জ্বালা থেকেই গেল। সেই জ্বালা যায় না। সেই জ্বালা গেলে আমি বাঁচতাম না। কেউ বাঁচে না।' হরেন দত্ত বলে চললেন।

অভী ভাবলেন 'জ্বালা আর নেই। যন্ত্রণাও নয়। ব্লাডপ্রেসার ছাড়া কোনো উত্তেজনা নেই। অম্বলের জ্বালা ছাড়া অন্য কোনো জ্বালা নেই। তবু তো বেঁচেই আছি।' এ গল্পের শেষটা যেন অভী জানেন। যেন এরকম গল্পগুলো মনের মধ্যেই থিতিয়ে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে। ওদের যেন আলাদা প্রাণ আছে। মাঝে মাঝে ওরা জেগে ওঠে, কথা বলে। পলকের জন্যে যেন একটা পর্দা সরে যায়। একমুহূর্তের জন্যে যেন আশ্চর্য এক রঙ্গমঞ্চ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।'

'পরাশরের জন্যে আমি কমলাকে ত্যাগ করলাম। অথচ পরাশরও তো কমলাকে পুরোপুরি পেলো না। ও নিজের মতো করে কমলাকে ভালবাসলো। যে ভালবাসা ফুটন্ত দুধের মতো টগ্‌বগ্ করলো, ঘন হল—' হরেন দত্ত হাসলেন। হাসিটাকে আর একটু টেনে রেখে নিজেকে প্রায় হাল্কা করে দিয়ে তিনি বললেন,—'তারপর একদিন বোধহয় সেই দুধ পুড়ে গেলো। আমি ঠিক জানি না। তবে এরকমই হয়। ওদেরও বোধহয় মৃত্যু হল। একবার ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে নতুন করে আর তা শুরু করা যায় না।'

তা হয় না। অভী জানেন, তা হয় না। ঘরটা একটা ধোঁয়াটে অন্ধকারের সমুদ্র যেন। মাঝখানে টেবিলের ওপর ঢাউস লণ্ঠনটা যেন একটা দ্বীপ। একটা গুবরে পোকা কোথা থেকে এসে আলোর চার ধারে কয়েকটা চক্কর খেলো তারপর দেয়ালে গিয়ে লাগলো। পড়ে গেল। ধোঁয়াটে অন্ধকার। কেরোসিনের গন্ধ। ধোঁয়ার ঘোমটা-পরা লণ্ঠনটাকে একটা পরিচিত মুখের মতো মনে হল অভীর কাছে।

গল্পটা একসময়ে শেষ হল। সবাই চুপ করে রইলেন।

সেই চুপ করে থাকাটা একসময়ে অসহ্য হল। হরেন দত্ত পুরোনো গল্পের জের টেনে বললেন—'এ জন্মে আর না।'

অভী মনে মনে বললেন—'এ জন্মে আর না।' চন্দন সিং বোধহয় ঘুম ভেঙে শেষটুকু শুনছিলেন। তিনি ব্যথিত হয়ে মাথা নাড়লেন। অম্বুজাক্ষ মিত্র পান চিবুনো বন্ধ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

হরেন দত্ত বললেন,—অন্য জন্মে কি হবে জানি না, কিন্তু এ জন্মটা নেশার ঘোরে কাটিয়ে গেলাম। যা যা পাইনি সে সব কিছুকে মিশিয়ে একটা অদ্ভুত নেশা।

'বড় যন্ত্রণা' অভী ভাবলেন—'বড় যন্ত্রণা। আগুনের ঘর আমাকে ঘিরে আছে। আমাদের সবাইকে ঘিরে আছে।'

অম্বুজাক্ষ মিত্র নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। তর্জনীতে খানিকটা চুন তুললেন কৌটো থেকে। পানের কষে প্রায় কালো হয়ে আসা জিভটা বের করে চুনটা লেপটে দিলেন তার ওপর। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—'তবে শুনুন। ঠিক গল্প নয় এটা—'

তারপর ওরা সবাই একটা করে গল্প বললেন। অম্বুজাক্ষ বললেন, অভী বললেন, চন্দন সিং বললেন।

'গল্পগুলো আলাদা আলাদা। এক নয়। কিন্তু কোথায় যেন সবগুলো গল্পই এক।' অভী ভাবলেন—'সবগুলো গল্পই এক সুরে বাঁধা।'

গল্পগুলো ফুরোলো। তারপর ওঁরা আরো ঘন হয়ে বসলেন। ঢাউস লণ্ঠনটার চার দিকে ওঁরা চারজন। অভী নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আর তিনজনের মুখ দেখে নিজের মুখটাও যেন দেখতে পেলেন অভী। ওরকমই ঘোলাটে চোখ, রেখাঙ্কিত চামড়া। অভী ভাবলেন—'আমাদের পোষা ইচ্ছেগুলো চারজনের মাঝখানে আগুনের মতো জ্বলছে। সেই আগুনে আমরা হাত সেঁকছি।'

তার পর প্রসঙ্গ পালটালো। ওঁরা কথা বলতে লাগলেন। হাসতে লাগলেন। হরেন দত্ত একটা রুমালকে পাকিয়ে পুতুল তৈরী করলেন। সেই পুতুলটাকে টেবিলের ওপর নাচাতে লাগলেন। যৌবনে উনি নামকরা ম্যাজিসিয়ান ছিলেন।

অম্বুজাক্ষ মিত্র বললেন,—অনেক রাত হল।

হরেন দত্ত বললেন—হ্যাঁ, এবার উঠতে হবে। চলুন সিংজী, আপনাকে পেঁছে দিয়ে যাই।

—বহুৎ সুক্রিয়া। চলুন। চন্দন সিং বললেন।

ওরা উঠলেন। অভী ওদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

ঢাউস লণ্ঠনটা কমিয়ে দিলেন অভী। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসলেন। মেয়ে দুজন শ্বশুরবাড়িতে। টুলু বিলেতে। মৌ পাঁচ বছর আগে মারা গেছে।

অভী ভাবলেন—'এই বোধহয় মুক্তি। অথচ এও ত নয়। ওরা সবাই সরে গেছে। আমি একা। পা বাড়ালেই অন্য কোথাও চলে যেতে পারি। কেউ দেখতে আসবে না। কিন্তু যেখানে আমি যেতে চাই সেখানে কেউ কখনো যেতে পারে না; কেউ যায় না। সবাই যেতে চায়—হরেন দত্ত, অম্বুজাক্ষ মিত্র, চন্দন সিং। কিন্তু ওরাও কখনো যায়নি। সেই দেশ নেই বোধহয়। কিংবা আছে হয়ত অন্য জন্মে তাকে পাওয়া যাবে।'

অভী চোখ বুজলেন।

অন্ধকার ঘর। দরজাটা খোলা। অভী অনুভব করলেন সেই দরজা দিয়ে অজেয় অসংখ্য প্রেতের মতো নিঃশব্দে পরীরা ঢুকছে। পরীরা তাকে ঘিরে ধরলো। তারা বায়বীয়—তাদের স্পর্শ করা যায় না। তাঁর চার ধারে পরীরা খেলা করতে লাগলো। নাচতে লাগলো।

পরীরা তাকে বললো,—যাবে তুমি?

—কোথায় যাবো? কোথায়?

—যেখানে যেতে চাও।

—যাবো।

পরীরা তাকে নিয়ে গেল। মা, বাবা, জেন, মৌ সবাই তাকে ঘিরে ধরলো। অভী তাঁর চেনা খেলনার দোকান দেখলেন। মুকুন্দ, মিশির এসে বললো,—কুস্তি লড়বে খোকাবাবু?

ঘুম ভেঙে গেল। অভী তাকালেন। চাঁদের আলো আর জাফরির ছায়া জালের মতো বারান্দায় পড়ে আছে। অভী ভাবলেন—'আমি যেখানে আছি সেটাই কি সত্যি? আর সেখানে আমি নেই সেই জায়গাটা কি মিথ্যে? অভী নিজেকেই নিজে বললেন, 'তবে বেঁচে থেকে কি লাভ? এতদিন বেঁচে আছিই বা কেন?'

নিজের ক্লীবত্বকে অনুভব করলেন তিনি। অনুভব করলেন জরা তাকে ভারী কম্বলের মতো জড়িয়ে আছে। তিনি ভাবলেন—'মরবো। কোনোদিন মরবো। তখন?'

'এই ঘর থেকে আমি চলে যেতে পারি। আমার জীবনটাই তো আগুনের ঘর। আমরা সবাই এক একটা আগুনের ঘরে আছি।'

অভী ভাবলেন 'কখনো যেখানে যাওয়া যায় না সেই দেশ, আর কখনো যাদের পাওয়া যায় না সেই আত্মীয়রা কোথায়? কোথাও নেই। অথচ আছে। আমি তো সেখানেই বারবার যাই, আবার ফিরে আসি।'

বুকের বাঁ ধারে হাত রাখলেন অভী। হৃৎপিণ্ডটা চলছে ঘড়ির কাঁটার নিষ্ঠায়। অভী বললেন—'আছে, তারা আছে। তাই আমি বেঁচে আছি।'

অভী উঠলেন। এগিয়ে গেলেন।

চাঁদের আলো আর জাফরির ছায়ার সুন্দর জালের ভেতর অভীর ঈষৎ তির্যক, দোমড়ানো, কুঁজো ছায়াটা নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

ঘরের পথ

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। মা গিয়েছিল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে। কেউই আর ফিরল না।

আমাদের বাড়িটা ছিল মাটির। তাতে ফাটল ধরেছিল। যখন বাতাস বইত তখন সেই ফাটলের মুখে শিস্ দেওয়ার মতো শব্দ হত। যেন বাইরে থেকে কেউ ডাকছে। কখনো কখনো রাত্রিবেলা সেই শব্দে ভয় পেয়ে আমি মাকে জড়িয়ে ধরতাম, মা আমাকে। মাটির দাওয়ায় কিংবা দেয়ালে অশ্বত্থ গাছের চারা দেখলেই মা আমাকে সেটি কেটে ফেলতে বলত। অশ্বত্থ চারা কাটতে কাটতে আমার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবসর পেলেই আমি দা হাতে অশ্বত্থ চারা খুঁজে বেড়াতাম।

ঘরের চালে ভাল খড় ছিল না। বর্ষাকালে জল পড়লে আমাদের ভিজতে হত। সারা ঘর যখন জলে থইথই করত তখন মা আমাকে আধখানা আঁচলের আড়ালে রেখে আমাদের আগের দিনের সুখের গল্প বলত। আমাকে আঁচল দিয়ে ঢাকা ছিল মার স্বভাব। শীতে কিংবা বর্ষায় কিংবা ঝড়ে আমি মার আঁচলের আড়ালে চাপা থাকতাম।

আমার বাবার একটা বুড়ো ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা কোনো কাজ করত না। আমি ঘাস কেটে এনে ওকে খাওয়াতাম। ঘোড়াটাকে বাবা খুব ভালবাসত। আমি বাবাকে দেখিনি। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। তারপর আর ফেরেনি। আমি বাবার ঘোড়াটাকে ভালবাসতাম। ওরা গায়ের গন্ধে আমার বাবার কথা মনে পড়তো।

বাবা ফিরল না দেখে মা পাহাড়ে কাঠ-পাতা কুড়োতে যেত। আমাদের গাঁয়ের গরীব মানুষেরা সবাই কাঠ কুড়োত। মা তাদের সঙ্গে খুব ভোরে চলে যেত। ফিরত সন্ধ্যেবেলায়, কখনো কখনো রাত্রি হ'ত। যাওয়ার সময় মা বলত, সারা দিন ঘর পাহারা দিও। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিও। সন্ধ্যেবেলায় শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটা আগুন জেবলে তার পাশে বসে থেকো। পাহাড় থেকে আগুনটি দেখতে পেলেই আমি বুঝবো তুমি ভাল আছো, ঘরে আছো। তা হলেই আমার ভাবনা থাকবে না।

আমি সারা দিন ঘরে থাকতাম। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিতাম। আর সন্ধ্যে হলেই শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটি মস্ত আগুন জ্বালতাম। আগুনের পাশে বসে দেখতাম দূরে বহু দূরে নীল পাহাড় দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁ দিকে মস্ত মাঠের ওপাশে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পাহাড়টি মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হয়ে যেত। তবু পাহাড়টি আমার চোখ থেকে কখনো হারিয়ে

যায়নি। ছবির মতো হয়ে পাহাড়টা আমার চোখের ওপর স্থির থাকত। আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিবে আসত।

পাহাড়টিকে আমার বড়ো ভয়। ঐ পাহাড় পেরিয়েই আমার বাবা চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। মা কখন ফিরবে ভাবতে ভাবতে আমি কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ে মা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখতাম।

কখনো কখনো মা আমাকে বাবার গল্প বলত। ঐ পাহাড়ের ওপাশে অনেক নদী-নালা খাল-বিল পেরিয়ে বাবা বিদেশে গেছে। সেখানে যেতে হলে ক'টা নদী ক'টা পাহাড় পার হতে হয় তা মা জানে না। মা শুধু জানে, একদিন বাবা অনেক রোজগার করে ফিরে আসবে। তখন আমি নতুন জামা জুতো পরে একটা বাচ্চা ঘোড়ায় চড়ে বাবার বুড়ো ঘোড়াটার পাশে পাশে টগবগিয়ে কোথাও চলে যাব।

মা কখনো কখনো পাহাড়টাকে অভিশাপ দিত, ওটা গোটা পৃথিবীটাকে আড়াল করে আছে বলে। আবার কাঠ-পাতা কুড়োতে ঐ পাহাড়েই যেত।

একদিন মা আর ফিরল না।

অনেকক্ষণ জ্বলে জ্বলে আগুনটা নিবল। দূরের নীল পাহাড় মেঘ আর কুয়াশার মত আবছা হ'ল। মা ফিরল না।

ভোর হতেই আমি মার খোঁজে বেরোলাম।

যারা কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরেছে, শুধু আমার মা বাদে।

তাদের মধ্যে একজন বলল, 'তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। তুই ছিলি গলার কাঁটা, তাই তোকে ফেলে গেছে।'

আমার বিশ্বাস হ'ল না। ওরা হাসল প্রাণ খুলে। আমার পিঠে চওড়া হাতের চাপড় মেরে বলল, "তার জন্য ভাবনা কি, তুইও তো জোয়ান মরদ হয়ে উঠবি দু-দিন বাদে। খেটে খেতে পারবি না? চিরকাল কি মায়ের আঁচল-চাপা থাকে কেউ, না কি আমাদের তাই করলে চলে?"

মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে ভেবে সারা গাঁ পাতি পাতি করে খুঁজলাম।

ওরা বলল, "খুঁজে কি করবি! তার চেয়ে পাহাড়ে চল। পাতা কুড়োবি।"

আমি পাহাড়ে গেলাম। কিন্তু কাঠ-পাতা কুড়োতে মন গেল না।

ওরা বলল, "তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। আয়, কাঠ কুড়োবি।"

আমি জেনেছিলাম যে আমি আছি বলেই মার সুখ। সুখ মানেই দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি। আমি আছি বলেই মার সেই শক্তি আছে। অনেক বড় হয়ে জেনেছিলাম যে আমিই মা'র দুঃখ, আমি ছিলাম বলেই মা সুখের খোঁজে চলে যেতে পারছিল না। দুঃখ মানেই সুখের পথ আগলে যে দাঁড়ায়।

আমার বাবা গেল পাহাড়ের ওপারে, আমার মাও আর ফিরল না।

রইল শুধু ঘোড়াটি।

সেই ঘোড়াটাও বুড়ো হয়েছে। কাজকর্ম করতে পারে না। কথনো মাঠে চরতে যায়, বেশীর ভাগ সময়েই ঘরে বসে ঝিমোয়। আমি ঘাস কেটে এনে খাওয়াই, জল দিই। যেমন বাপ বুড়ো হলে ছেলে তার কাজকর্ম করে। মাঝে মাঝে ওর প্রকাণ্ড বুড়ো মাথাটি আমার কাঁধে নামিয়ে রাখত। তথন ওর ঘন, গাঢ় দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। সে নিঃশ্বাসে ওর গায়ের চামড়া থরথর করে কাঁপত। ওর মুখে, চোয়ালে, ঘাড়ে শিরাগুলো থাকত ফুলে, ওর ভাঙাচোরা মুখটা ছিল গাছের কাণ্ডের মত এবড়োখেবড়ো। ওর প্রকাণ্ড ঘাড়টা দু হাতে জড়িয়ে থেকে আমার মনে হত যেন বহুদিনের পুরোনো একটা বটগাছ শাখা-প্রশাখা মেলে আমায় আশ্রয় দিয়েছে।

একদিন ঘোড়াটিকে দেখে গাঁওবুড়ো বলল, "ঘোড়াটাতে চেপে তোর বাপ বিয়ে করতে গিয়েছিল। ঘোড়াটি তোর বাপের মতন। ওকে যত্ন-আত্তি করিস।"

ঘোড়াটিকে নিয়ে ছিলাম মেতে।

বাদবাকি সময়টা কাটতো চুপচাপ দাওয়ায় বসে। সারা দিন বাতাস আমাদের ফাঁকা বাড়িটায় শিস দিয়ে খেলা করত। দেখতাম, গুড়মি শাকের জঙ্গলে চড়াই নেচে বেড়াচ্ছে, ধনে পাতার গন্ধে বাতাস ভারী, সরসর করে গাছের শুকনো পাতায় বাতাস বইছে। কুয়োর পারের মাটিতে ছোট্ট একটু গর্তে জমে থাকা জলে শালিক চান করছে জল ছিটিয়ে। ও চলে গেলে জলের কয়েকটা সরু রেখা থাকতো মাটিতে, কয়েকটা পালক বাতাসে। আমার চকচকে দা'টাতে মরচে পড়ল। সারা বাড়িটায় অশ্বত্থ চারা উঠলো গজিয়ে।

দিন কাটে। সন্ধ্যে হ'লে পাতা জড়ো করে আগুন জেবলে চুপ করে শুয়ে থাকি। আগুনটা মরে এলে তার নরম আঁচ অনেকটা মা'র শরীরের তাপের মত মনে হয়। তাই কথন ঘুম আসে শরীর অবশ করে দিয়ে।

যে দাই আমার নাড়ি কেটেছিল সে এসে একদিন বলল, "এমনি করে কি না খেয়ে মরবি? তার চেয়ে আমার কাছে চল। আমার তো ছেলে নেই একটা মাত্র মেয়ে। দু'জনে বেশ থাকবি।"

"উঁহু। আমি রাতে স্বপ্ন দেখি বাবা ফিরে আসছে।"

"হ্যাঁ, যেমন তোর মা মুখপুড়ী ফিরল। তা খাস কি?"

"শাকপাতা যখন যা হয়।"

বুড়ী গজগজ করে আমাকে বকতে বকতে চলে গেল।

তারপর থেকে দাইমার মেয়ে চন্দ্রা আমার জন্য ভাত আনত। রোজ। ভাতের থালাটা মাটিতে রেখে বেড়ালের মত থাপ পেতে আমার দিকে চেয়ে থাকত চন্দ্রা, যেন শহরের মানুষ দেখছে।

একদিন আমি বললাম, "কি দেখছিস ? কি দেখিস রোজ ?"

ও বলল, "তোকে। তুই একটা বুড়ো জানোয়ারের সঙ্গে থাকিস কেন ?"

"ওকে আমি আমার বাপের মতো ভালবাসি।"

ও খিলখিল করে হাসল। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে থামল। ল, "ভালবাসার আর লোক পেলি না ! ওটা চড়ে তুই কোন দেশ জয় করতে যাবি ?"

আমি ভাবলাম, যাব, একদিন যাব। পূবদিকে যাব—যে দিকে সূর্য ওঠে। চদিন আমি রাজা হয়ে ফিরব, দেখিস।

আমি বললাম, "জানি না রে।"

ও হাত তুলে আমাকে আমার ঘর দেখাল। বলল, "ওই দেখ গাছের শেকড়গুলো পের মতো দেয়ালের মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। তোর চারপাশের দেয়াল আর বেশী ন থাকবে না, ধসে পড়বে। সময় থাকতে শত্রুরগুলোকে মুড়িয়ে কাট।"

আমি ঠাট্টা করে বললাম, "ওরা আমার মায়ের মত। কেটে ফেললে বাইরে থেকে লপালা দেখা যায় না, কিন্তু মনের মধ্যে ওদের শেকড় থাকে।"

শুনে ও রাগ করে চলে গেল। বলে গেল, "তোর মরণ এসেছে ঘনিয়ে। একদিন ই দেয়ালচাপা হয়ে মরবি।"

আমি ভাবলাম, শেকড়গুলো গর্ত খুঁড়বে, আরো গভীর হবে। মনের দেয়ালে ড় ধরবে, ফাটল হবে। তারপর একদিন চৌচির হয়ে ভাঙবে। সেদিন আমি আমার ড়ো ঘোড়ায় চেপে পূবদিকে রওনা দেব। গাঁয়ের লোকেরা দেখবে আমার লাঠির াগায় বাঁধা পুঁটলিটা আস্তে আস্তে দূর থেকে দূরে পাকা ধানের ক্ষেতের আড়ালে িলিয়ে গেল। ওরা জানবে, আমি ফিরে আসবো একদিন। রাজা হয়ে।

একদিন চন্দ্রা আমার ভাত নিয়ে এল না। ফাগনলালের ঘরের পাশ দিয়ে মৌরি-ক্ষেতের কিনারায় কিনারায় যে পথটা ধরে চন্দ্রা আসে, সে দিকে চেয়ে সারা দুপুর টল। চন্দ্রা এল না। তার পরদিনও না। তার পরদিনও না। চন্দ্রা এল না খে আমি উঠে খুঁজে পেতে আমার পুরোনো মরচে ধরা দা'টা বের করে পাথরে শান ত বসলাম।

সারাটা দুপুর পাথরে মুখ ঘষে দা'টা ঝকঝক করে হেসে উঠল। ওর গায়ে আগুন ুটল। দা'য়ে শান দিয়ে দিয়ে আমার হাতপায়ের মাংসগুলো ফুলে উঠল, শিরায় য় গরম রক্ত ছুটল টগবগিয়ে। কেমন যেন খুশী লাগল, নেশা পেল।

ভেবেছিলাম সূর্য ডোবার আগেই অশ্বত্থের চারাগুলো কেটে ফেলব। এমন চন্দ্রা এল হাতে ভাতের থালা নিয়ে। রোজ যেমন আসত।

আমি বললাম, "এতদিন আসিসনি কেন ?"

ও গম্ভীর হয়ে বলে, "একটা বাঘ রোজ আমার পথ আগলে থাকে। বলে, কোথায় িচ্ছস ? থালা নামিয়ে রাখ আমার সামনে, আর বসে বসে আমার লেজে হাত বুলিয়ে । নইলে তোকে যমের বাড়ি পাঠাবো। রোজ এমনি করে বাঘটা তোর ভাত ফেলে।"

আমি বললাম, "জানি। এ গল্প আমি মার কাছে শুনেছি। এক বুড়ী রোজ তার ছেলের কাছে খাবার নিয়ে যেত, আর পথ আগলে থাকত বাঘ।"

"হ্যাঁ, শুনেছিস। তাতে কি? এমন বুঝি হয় না?"

আমি ভেবেছিলাম, বড় হয়ে আমি বাঘটাকে মেরে ফেলব। খিদেকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই, ভেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। পথ আগলে যেই থাকবে তাকে সাফ করে দাও।

চন্দ্রা খিলখিল করে হাসল মুখে আঁচল দিয়ে। বলল, "তুই বাঘটাকে মারবি, না ওর লেজে হাত বুলিয়ে দিবি?"

আমি বললাল, "জানি না।"

ও বলল, "মা দেখেছিল তুই খিদের জ্বালায় আমাদের বাড়ি যাস কি না। মা তোকে যাচাই করছিল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মা বলেছে, তুই মানুষ নয়। তোর বাপটা ছিল এমনি গোঁয়ার, তাই একমুখো চলে গেছে। ঘরের পথ ফিরে চিনল না। তুইও যাবি, যাবি। কাঁদতে কাঁদতে মা ভাত বেড়ে দিল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অনেক ভেবে চন্দ্রা বলল, "কিন্তু আমি জানি তুই যাবি না।"

এই বলে ও চলে গেল। আমি আমার দা'টা হাতে নিলাম। এক এক কোপে অশ্বত্থের মোটা মোটা ডালগুলো খ'সে পড়তে লাগল। আমার শরীর গরম হ'ল ছলাৎ-ছল করে রক্ত বইল শিরায় শিরায়। আমি আপন মনে হাসতে লাগলাম। শীত কালে আমাদের বুড়ো ঘোড়াটার গা থেকে ধোঁয়ার মত একটা ভাপ বেরোত। সেই ভাপে ওর রক্তমাংস আর ঘামের গন্ধ পাওয়া যেত। নিজের শরীর থেকে আমি তেমনি এক গন্ধ পেলাম। মদের যেমন স্বাদ নেই, এ গন্ধেরও তেমন ভালমন্দ নেই। এ শুধু আমাকে মাতাল করে।

আমি আপন মনে হাসলাম। যেন আমার নেশা হ'ল। আমার ইচ্ছে হ'ল নিজের শরীরটাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করি। মাটির দাওয়ায় আমি শরীরটাকে গড়িয়ে দিলাম। আমার শরীরের ঘাম মাটির সঙ্গে মিশল।

শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে আমার কাছে এক বাঁশীওয়ালা এল। তখন বাতাসে টান লেগেছে। শুকনো পাতাগুলো টুপটাপ করে ঝরে ঝরে শেষ হয়েছে ক্ষেতের মটর শাকে পাক ধরল। যারা শুকনো কাঠ-পাতা কুড়োতে যেত তাদের দিন গেল।

এমনি একদিন শেষ দুপুরে অনেক দূর থেকে বাঁশীওয়ালা এসে আমার দাওয়ায় বসল। তার গায়ে একশো রঙের একশো তালি দেওয়া একটা জোব্বা, মাথায় একটা মস্ত পাগড়ি। সেই পাগড়িটা তার কপালটিকে ঢেকে ফেলেছে। রোগা দুটো পা রাঙা ধুলোয় মাখা। আমি কখনো এই বাঁশীওয়ালাকে দেখিনি।

সে বলল, "আমি বাঁশী বিক্রি করি না। বাঁশীর সুর বিক্রি করি।"

এই বলে সে তার বাঁশীতে একটা অদ্ভুত সুর বাজাল।

আমি বললাম, "বাঁশীতে তুমি ওটা কি সুর বাজালে? আমি তার কতক বুঝলাম

ক বুঝলাম না।"

বাঁশীওয়ালা তার ঘন ভ্রূর নীচে গভীর গর্তের মত চোখ দুটো দিয়ে আমায় দেখল। ল, "এ সুর আমি কোথাও শিখিনি বাবা, কেউ আমাকে শেখায়নি। আমার কোনো রু নেই। আমি হাটে মাঠে ঘাটে যা শুনি তাই বাজিয়ে বেড়াই। কখনো নোঙর-া নৌকোয় জলের ঢেউ লাগবার সুর, কখনো শীতের শুকনো পাতায় বাতাস লাগবার র।

সে আবার তার বাঁশীতে ফুঁ দিল।

শেষ শীতের শুকনো বাতাসে বাঁশীর টান লাগল। কয়েকটা সুর তীরের মতো কাশে ছড়িয়ে ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল। আমার চোখের সামনে দুপুরটা মাতালের মত তে লাগল।

যেন অনেক দূর পথ! আমাদের এই মৌরি-ক্ষেত ডিঙিয়ে ধানের আবাদের পাশ য়, পাহাড় পেরিয়ে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কত গঞ্জ, কত ব্যাপারীর আস্তানা, বন্দর, ঘাট মাঠ পেরিয়ে যাওয়া দেশ। বাঁশীর সুর সেই দূর-দূরান্তের আভাস নিয়ে কোকিলের অস্পষ্ট ডাকের মত নরম, বিষণ্ণ হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। পথ ধরে অনেক আলো, অনেক অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে যেন আসছে—সছে—আসছে।

বড় ক্লান্ত পথ! বড় দীর্ঘ পথ!

আমি চোখ বুজে ভাবলাম, সে আমার বাবা। কত দিন গেল, কত রাত গেল। ড়াটা বুড়ো হ'ল। বাবা ফিরল না।

বাঁশীওয়ালা সুর পাল্টে নতুন সুর ধরল।

এখন আমার চোখ ছাপিয়ে কান্না এসেছে। এ কেমন সুর যা দিনের আলোকে ধকার করে দেয়?

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "এর মানে কি? আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

বাঁশীওয়ালা থামল না।

যেন এতদিন মাঠটা ছিল রোদে পোড়া, ফাটা ফাটা। একদিন পাহাড়ে মেঘ জমল। ষ্ট নামল। অঝোর ধারে বৃষ্টি। মাটির কোষে কোষে জল ঢুকল। বীজধান লে উঠল। বুক ফাটিয়ে শীষ বার করল আকাশে।

বাঁশীওয়ালা থামল। বলল, "এর অর্থ, যেমন করে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়। স্তে আস্তে, তোমার চোখের আড়ালে অন্ধকারে যেমন করে আস্তে আস্তে পাপড়ি-লো মেলে দেয়, যেমন করে শীত যায় বসন্ত আসে, যেমন করে শুকনো পাতা ঝরে আবার নতুন পাতায় ছেয়ে যায় গাছ—তেমনি করে তোমার দেহেও একটা ঋতু সে, আর একটা যায়।"

এই বলে বাঁশীওয়ালা আবার তার বাঁশীতে সুর দিল। যেন বলল, বুড়ো র জন্য দুঃখ ক'রো না। এক-একটি ঋতু যায়, আর একটি আসে। দুঃখকে কর। ক্ষেতে আগুন লাগলে ফসল ভাল হয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "এ সুর তুমি কোথায় পেলে

সে দাঁড়িয়ে উঠে হাসল।

আমি বললাম, "আমাকে এ সুর শিখিয়ে দাও। আমি তোমার মতো জোব্বা পরে বাঁশী বাজিয়ে বেড়াব।"

বাঁশীওয়ালা ফিরে বলল "তুমি আমাকে অবাক করলে বাবা, এ জোব্বা কি তোমাকে মানায়। আমি যেখানে যখন যেমন পেয়েছি তেমন কুড়িয়ে-বুড়িয়ে এই কাপড়ের টুকরোগুলো জুড়ে সেলাই করে এই জোব্বা বানিয়েছি। যারা সুখে আছে জোব্বা তারা সাধ করে পরে না। আমার মনে রঙ নেই, তাই বাইরে এত রঙে বাহার।"

বাঁশীওয়ালা চলতে লাগল। আমি দেখলাম শীতের ঘন রোদে রোগা দুটো পা রাঙা ধুলো মেখে সে আস্তে আস্তে আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ তা ফিরিয়ে আনার জন্য ডাকছে না।

শেষ শীতের গরম দুপুরে সেই অদ্ভুত বাঁশীওয়ালা আর তার সুর দূরে থেে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

আমি কাঁদতে কাঁদতে ভাবলাম : এ সুর তুমি কোথায় পেলে বাঁশীওয়ালা? আমা সারাটা দিন যেন টালমাটাল-টালমাটাল। যেন আমি বিনিমদের মাতাল। যেন আমি এ পাগল বাঁশীওয়ালা। শিরা ছিঁড়ে সুর তৈরি করে। সে সুরে আমি সারা দিন গাই কাঁদি। কেন বাঁশীওয়ালা আমাকে দিল সারা দিন বাজাবার এই বাঁশী? আমি একে ছাড়তে পারি না। এ যে আগুনে দিলে পোড়ে না, ঝড়ে ওড়ে না। পো কবুতরের মতো নড়ে-চড়ে ঘুরে বেড়ায়। উড়ে যায় না।

উঁচু নীচু পথ। পাথর ছড়ানো। চড়াই উৎরাই ভেঘে বাঁশীওয়ালা চলেছে শুকনো হাওয়ায় তার চামড়া ফেটেছে, পাথরে তার গা ফেটেছে। তবু তার চলবা শেষ নেই। সে পুব থেকে পশ্চিমে গেল। যেদিকে সূর্য ওঠে সেদিক থেকে যেদি সূর্য ডোবে সেদিকে গেল, যে পথে আমার বাবা গেছে তার বুড়ো ঘোড়াকে রে যেদিকে মা গেছে আগুনের পাশে তার ছেলেকে বসিয়ে রেখে।

বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ ক'রো না। ক্ষেতে আগুন দিলে ফসল ভাল হয় মাটির কোষে কোষে বৃষ্টির জল ঢুকবে, বীজধান কেঁচোর মতো ফুলবে, বুক ফাটি শীষ বের করবে আকাশে।

আমি জানি বাঁশীওয়ালা আর ফিরবে না। কোনোদিন না।

দাওয়ায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন আমার দিন গেল।

একদিন সকালে ঘোড়াটাকে দেখে মনে হল আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমা চোখের সামনেই বুড়ো ঘোড়াটা কখন যেন আরো একটু বুড়ো হয়ে গেছে। ওর গা হেলান দিয়ে আমি আমার মাকে ভাবলাম। কিন্তু মার মুখ আমার মনে এল না রোদ লেগে ঘাসের বুক থেকে শিশির যেমন ভাপ হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে মা

খটা হারিয়ে গেছে। শাড়ির আঁচল, পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা শান্ত ছায়ায় ঢাকা ঘির মত সেই চোখ আমি আগের জন্মে দেখেছিলাম।

গাঁওবুড়ো আমায় দেখে চোখ কুঁচকে বলল, "তুই যে আড়েদীঘে রীতিমতো পুরুষ-নুষ হয়ে উঠলি! কখন এত ঢ্যাঙা হয়ে উঠলি, বেড়ে উঠলি আমাদের চোখের সামনে রও পেলাম না।"

আমি লজ্জা পেলাম।

গাঁওবুড়ো বলল, "তোর গড়নপেটন হয়েছে তোর বাবার মতন, কিন্তু চোখ দুটো য়েছিস মা'র। তা এবার তো জোয়ান হলি, কাজকর্মে লেগে যা। বসে থাকিস না, নগুলো চলে যেতে দিস না। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস ঘর সামলে খিস।"

আমি ভাবলাম গাঁওবুড়োকে বাঁশীওয়ালার কথা বলব।

আমার চোখের দিকে চেয়ে গাঁওবুড়ো হাসল, "জানি রে জানি, তোর কাছে এক শীওয়ালা এসেছিল। সে মাত্র একবারই আসে। মাত্র একবার।"

গাঁওবুড়ো তার নড়বড়ে মাথাটা দোলাল, "তাই তো বলছি দিনগুলো চলে যেতে স না। বসে থাকিস না। ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। ঘরদোর সামলে রাখিস।"

চন্দ্রা এসে বলল, "তুই নাকি পয়সা দিয়ে বাঁশীর সুর কিনেছিস?"

আমি বলি, "হুঁ।"

চন্দ্রা আমার কাছে এসে বসল, "পাখি কিনেছিস, আর খাঁচা কিনিসনি? সুর নেছিস, আর বাঁশী কিনিসনি? তবে তোর ঘরে রইল কি, তোর নিজের বলতে কল কি? কিনতে হয় এমন জিনিস কিনবি যা হাত দিয়ে ধরাছোঁয়া যায়, চোখ দিয়ে থা যায়, যাকে ধরে ছুঁয়ে দেখে মনের সুখ, ভাল না লাগলে যাকে বেচে দিয়ে আবার সা পাওয়া যায়।"

এই বলে ও হাসল। বলল, "আমি আর কতকাল তোর জন্য ভাত বয়ে আনব? রই তো ভাত দেওয়ার বয়স হল। তুই কাজকর্ম করবি, না সারা দিন দাওয়ায় বসে করে আকাশ গিলবি?"

আমি বললাম, "জানি না!"

"গাঁওবুড়ো বলছিল ধরে মেয়ে না দিলে জোয়ানগুলো কাজকর্মে মন দেয় না।"

এই বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম বাসন্তী রঙের ডুরে শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়তে উড়তে ফাগনলালের দাওয়া পেরিয়ে রিক্ষেতের পাশ দিয়ে ওর শরীরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল! খুব পাতলা টিদার একটা মেঘ রোদের মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। সেই ছায়াটা একটু সময়ের ন্য ওর মুখের ওপর থাকল। বাতাস ওর চারদিকে একটু খেলা করল। ওর চারপাশে

উড়ে বেড়াতে লাগল কয়েকটা মৌমাছি।

আমি বাঁশীর সুর কিনেছি বলে গাঁয়ের বুড়োরা আমার নিন্দে করল। দুঃখ বলল, আমার ঘরে কিছুই থাকবে না। যেমন করে আমার বাবা থাকল না, থাকল না।

গাঁয়ের জোয়ান মরদরা এসে আমার পিঠ চাপড়ে গেল : এই তো চাই। বাঁশ সুর কিনবি, পাখির ডিম কিনবি। যেমন করে পারিস উড়িয়ে দিবি রোজগারের টাকা আমরা জোয়ান মরদ, আমাদের রোজগারের ভাবনা কি? দেখছিস্ না বুড়োগুে দশা, দু' আঙুলের ফাঁক দিয়ে পুরো আয়ুটা খরচ হয়ে গেল। ওরা আমাদে বেহিসেবী বলে। কিন্তু সামনের শীতে ওরা যখন মরবে তখন তো আমরাই থাকব।

এই শুনে আমি বুড়ো ঘোড়াটার কাছে গেলাম। ও আমার কাঁধে ওর প্রকা মাথাটা রাখল।

কখন আমার শরীর দীর্ঘল হয়েছে, হাত পা কোমর হয়েছে সরু আমার চামড়ায় টা লেগেছে, রুক্ষ হয়েছে মুখ, তা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ও যেন টের পেল আমার কাঁধে মুখ ঘষে শরীর কাঁপিয়ে ওর খুশি জানাল।

আমি ওর গাছের কাণ্ডের মতো এবড়োখেবড়ো মুখে আমার গাল রাখলাম। ও রেশমের মতো কেশর আমার হাতে খেলা করল। আমি বললাম, "বুড়ো, তুই আ বাপ। কোনো ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।"

এই শুনে পাঁজর কাঁপিয়ে ও নিঃশ্বাস ছাড়ল।

ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে বলে দুঃখ ক'রো না। ও বুড়ো হচ্ছে তার মানে তুমি বড়ে হয়েছ। করে শীত আসবে তার জন্য দুঃখ করে দিনগুলোকে চলে যেতে দিও না মনে রেখ, দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে স্রোতের জল বয়ে যায়। আটকানো যায় না সামনের শীতে ঘোড়াটা যদি মরে, তুমি থাকবে।

"বুড়ো, তুই আমার বাপ।' আমি বললাম, "কোনো ভাবনা করিস না বুড়ো আমি তোকে দেখব।"

ঘোড়াটা পুরোনো ঠাণ্ডা শরীর দিয়ে আমার শরীর থেকে তাপ নিল। আ দু হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে চোখ বুজে রইলাম। যেন আমি পুরোনো প্রকাণ্ড এব বটগাছের আশ্রয়ে আছি।

চন্দ্রা এসে বলল, "সারা দিন ঘরে বসে কি বকিস্ একা একা?"

আমি শান্তভাবে ওর দিকে তাকালাম। ওর শরীর ঘামে ভিজে তেল-তেল করছে দু' চোখে মিটমিটে আলো। এ কেমন আলো? আমি কোনোদিন এমন আলো দেখিনি ওর শরীর থেকে কেমন একটা মাতাল মাতাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আমি ভাবলাম, বোধ হয় কোনো ফুলের গন্ধ। এ কেমন ফুল? জানি না। কেমন তা রঙ? জানি না।

ও আমার হাত টেনে বলল, "চল্, তোকে আজ একটা নতুন জিনিস দেখাব।"

"কি জিনিস?"

ও ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, "সে একটা রাজার বাড়ি। খুব অদ্ভুত।"

"কোথাও সেটা!"

ও হাসল, "আছে আছে। তোর খুব কাছেই আছে। অথচ তুই দেখিসনি।"

চন্দ্রা ওর বুকের কাপড় সরিয়ে নিল। তারপর কাপড়টা ওকে একা রেখে মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়ল। চোখে হাত চেপে ও বলল, "এ এমন রাজা যে দখল নেয় না, দখল ছাড়েও না। আমি সারা দিন সব কাজ ফেলে তার বাড়ি পাহারা দেব কেন?"

ওর বেলেমাটির মতো শরীরের দিকে চেয়ে আমি ভয় পেলাম।

চোখে হাত চেপে ও কাঁদছিল, "আমার সারা দিনের কাজ পড়ে থাকে। আনমনে আমার বেলা বয়ে যায়। তোর বাঁশীওয়ালা কি তোকে এ কথা বলেনি?"

সেই অচেনা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। এ কেমন ফুল জানি না। কেমন তার গন্ধ জানি না।

আমার বুক ফেটে কান্না এল। আমি ভেবেছিলাম, যে বাঘটি রোজ পথ আগলে থাকে, বড় হয়ে তাকে মেরে ফেলব। কিন্তু ক'টা বাঘকে মারব আমি? গাঁওবুড়ো বলেছিল, ঘরদোর সামলে রাখিস। গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল, বাঁশীর সুর কিনিস না।

চন্দ্রা দু' হাতে আমার মাথাটা টেনে নিল। বলল, "আমি তোকে কতক বুঝি, কতক বুঝি না।"

ওর বুক ছিঁড়ে-নেওয়া ফুলের বোঁটার মত আমার কপালে, চোখের পাতায় নরম হয়ে লেগে লেগে মুছে গেল।

ও বলল, "একদিন তুই পাহাড়ে যাবি কাঠ কুড়োতে। সেদিন আমি তোর ঘর পাহারা দেব। পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালব বাইরে, যেন তুই পাহাড় থেকে দেখতে পাস।"

বাঁশীওয়ালা তার প্রথম সুরে বলেছিল; ঘর বলতে তোর কোনো কিছুই নেই। কোনোদিন ছিল না। বৃথাই তুই সারা বিকেল আগুন জেবলে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলি। যারা পাহাড়ের ওপারে গেছে তারা আর ফিরবে না।

আমি কাঁদতে লাগলাম।

চন্দ্রা কেঁদে কেঁদে বলল, "তুই যদি আমাকে ছেড়ে না যাস, আমিও যাব না। আমরা ঘর বাঁধব।"

ওর চোখের জলে আমার মাথা ভিজল। আমি ভয় পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল। চুমু খেল আমার ঠোঁটে। জন্মের পর আমরা যেমন ছিলাম, তেমনি হয়ে শুয়ে রইলাম।

বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার বুড়ো ঘোড়াটা আরো বুড়ো হয়েছে। টুংখুটু করে সারা দিন ঘাস খায়, কখনো ঝিমোয়।

বাতাসে গরম হলকা ছুটল। বুড়োরা বলল, "এইবার আকাল এল। ঘাট শুকোবে, মাঠ ফাটবে। সেই বর্ষা যতদিন না আসছে।"

কাছাকাছি মাঠের ঘাসগুলো হলদে হয়ে এল। তাই আমি একদিন বুড়ো ঘোড়াটাকে দূরের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। সন্ধ্যেবেলা ও নিজেই খুট্‌খুট্‌ করে ঘরে ফিরতে লাগল।

কিন্তু একদিন ও ফিরল না।

সারা সন্ধ্যে আমি দাওয়ায় বসে রইলাম পথের দিকে চেয়ে। দূরের পাহাড় ঝাপসা হয়ে এল। ও এল না।

আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠলো। জ্যোৎস্নার বান ডাকল দিগন্ত জুড়ে। কিন্তু পেটের নীচে নিজের বাঁকাচোরা বুড়ো ছায়াটা নিয়ে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে ও ফিরল না।

অনেক ভেবে আমি হাতে দড়ির ফাঁস নিলাম। তারপর পথে নামলাম। মনে মনে বললাম ঃ যখন আমি ছোট ছিলাম তখন কেউ কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বুড়ো, তোকে আমি চলে যেতে দেব না। আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব।

চলতে চলতে আমি ধানক্ষেত ছাড়িয়ে, মরা মটরশাকের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান পেরিয়ে গেলাম।

তারপর দিগন্তজোড়া মাঠ। মাঠে বান-ডাকা সমুদ্রের মত টলটল করছে জ্যোৎস্না। কিন্তু তার কোথাও আমার বুড়োর ছায়া নেই।

আমি পাগলের মতো সারা মাঠ বুড়োকে খুঁজতে লাগলাম। আমার ভাঙা গলার ডাক আমাকে ঘিরেই ঘুরতে লাগল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব।"

আমি মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলাম।

আমার চারধারে ঘন গাছ। আলো আর ছায়ার মধ্যে আমি হাঁটতে লাগলাম।

তারপর আমি ভয় পেলাম। আমার মনে হ'ল কেউ যেন আছে। কাছেই—পাশেই। মৃত শুকনো পাতাগুলোতে শব্দ হল। মনে হল, যেন কোন আত্মা আমার পিছু নিয়েছে।

আমার গায়ে কাঁটা দিল। যেন সেই আত্মা আমার হাত ধরল, তারপর আমাকে আমার চেনা পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলল কোথাও। আমি ভাঙা গলায় বুড়োকে ডাকতে লাগলাম।

বন পার হয়ে আমি একটা জলার ধারে এলাম। তাকিয়ে দেখলাম, আমি এর আগে কখনো এখানে আসিনি। এত জ্যোৎস্না আমি কোনোদিন দেখিনি।

জলাটা মস্ত বড়। তার ওপাশে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও যেন কিছু শুনছে, কিছু দেখছে। আমি ডাকলাম, "বুড়ো, বুড়ো।"

ও শুনল না। তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম, ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, "বুড়ো, তোকে আমি পেয়েছি।"

ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখল। তারপর ভয় পেয়ে ও সরে গেল। আমি বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারল না। আমি ওর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

ও চীৎকার করে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে লাগল। ওর ছায়াটা এবড়োখেবড়ো মাঠের ওপর টাল খেতে লাগল। আমি ওর পিছনে ছুটলাম। প্রাণপণে ওকে ডাকলাম। সেই ভীষণ ভয়ংকর জ্যোৎস্নার মধ্যেও বুড়ো আমাকে চিনতে পারল না।

আমি দড়ির ফাঁসটা মুঠো করে ধরলাম। তারপর শেষবারের মত ওকে ডাকলাম। ও শুনল না। কাকে যেন ও দেখতে পেয়েছে। কে যেন ওকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি ফাঁসটা ছুঁড়ে দিলাম ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাত-ধরা দড়িটা থরথর করে কাঁপল। আমি বুঝলাম ফাঁসটা ওর গলায় পড়েছে।

আমি বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।"

আমি কাছে এগোতেই বুড়ো চীৎকার করে ছুটতে চাইল। ফাঁসের দড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বুড়ো দড়িটা ছিঁড়ে চলে যেতে চাইল। আমি দড়িটা ছাড়লাম না। বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।"

ও চীৎকার করে বারবার যেন আমাকে অভিশাপ দিল। আমি বললাম, "বুড়ো, আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দেব।"

বুড়ো শুনল না। ও ছেড়ে যেতে চাইল। আমি ধরে রইলাম।

কিন্তু বুড়োকে একসময়ে থামতে হ'ল। চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। তারপর কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ল।

কাছে গিয়ে দেখলাম ফাঁসটা ওর গলায় আটকে গেছে। ও দম নিতে পারছে না। আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, "বুড়ো, তোকে আমি যেতে দেব না। আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দিয়েছি।"

এই বলে আমি ওর গলার ফাঁসটা খুলতে চাইলাম। কিন্তু ফাঁসটা খুলল না। নীচু হয়ে দেখলাম দড়ির গায়ে ছোট্ট একটা গিঁটে ফাঁসটা আটকে গেছে, গভীর হয়ে বসেছে বুড়োর গলায়।

আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম। কপালে বিনবিনে ঘাম ফুটল। কিন্তু ফাঁসটা নড়ল না। বুড়ো ছটফট করতে লাগল। আমি দড়িতে দাঁত দিলাম। দড়িটা লোহার মতো বসেছে। আমার গলার রগ ফুলল, রক্তে ভরে গেল সারাটা মুখ। বুড়ো আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে এল। আমি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চীৎকার করে বললাম, "বুড়ো, আমি ফাঁসটা খুলব, খুলব।"

বুড়ো আমার দিকে তাকাল। আমার গা থেকে পিতৃহত্যার সমস্ত পাপ মুছে নিতে চাইল। তারপর সেই ভয়ংকর জ্যোৎস্নার ভেতর ওর দুটো চোখ ঘোলা হয়ে গেল। আমি বললাম, "বুড়ো, এই ফাঁসটা দিয়ে আমি তোকে ধরতে চেয়েছিলাম।"

আমি দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরলাম। ভাবলাম—আমার হাত দিয়ে কে তোকে মেরেছে আমি তা জানি না। জানি না।

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। আমার মা গিয়েছিল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে। আমাদের ঘোড়াটা গিয়েছিল জলার ধারে, ঘাস খেতে।

কেউই আর ফিরল না।

গাঁওবুড়ো একদিন সবাইকে ডেকে বলল, "শোনো, তোমাদের এক গল্প বলি। গাছের তলায় ধুনী জেবলে একটা সাধু বসে থাকত। তাকে মস্ত বড় সাধু ভেবে গৃহস্থরা তার চারধারে হাতজোড় করে থাকত। একদিন একটা লোক এসে বলল, সাধুবাবা, আমার ইচ্ছে তোমাকে কিছু খাওয়াই। সাধু রাজী হ'ল। লোকটি কিছু রুটি কিনে আনল। তারপর আবার বলল, সাধুবাবা, তুমি এই শুকনো রুটি কি করে খাবে? তোমার লোটাটা দাও, দুধ নিয়ে আসি। সাধু খুশী হয়ে লোটা দিল। লোটা নিয়ে লোকটা সেই যে চলে গেল আর ফিরল না।"

সবাই বলল, "তারপর?"

গাঁওবুড়ো বলল, "তারপর লোটার শোকে সাধুর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সে কি কান্না। সবাইকে ডেকে ডেকে বলে, "দেখ দেখ, চোট্টার কাণ্ড দেখ, আমাকে এক পোয়া রুটি খাইয়ে আমার রুপোর লোটাটা নিয়ে ভেগেছে।"

সবাই বলল, "তারপর?"

গাঁওবুড়ো হাসল, "যার লোটা চুরি যায় সে বোকা। কিন্তু সেই লোটার শোকে যে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে সে আরও বোকা।"

এই বলে শীত আসবার আগেই গাঁওবুড়ো মরে গেল।

গাঁয়ের বুড়োরা জমায়েত হয়ে বলল, "জন্মের পর মৃত্যু, তারপর আবার জন্ম। ঠিক যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ। চলতে চলতে পড়ে যাওয়া, আবার ওঠা। কে যেন আমাদের নিয়ে দিনরাত এই খেলা খেলছে। এ খেলার শেষ নেই।"

কেউ বলল, "খাঁচাটা পুরোনো হয়েছে।"

শীত আসছে শুনে বুড়োরা ভয় পেল। বলল, "এবার ঘর ছাড়তে হবে।"

কেউ বলল, "ঘর আর কোথায়। ঐ তো নড়বড়ে পাতার ছাউনি, রোদ মানে না, জল মানে না।"

বুড়ো ঘোড়ার মতো খুট্‌খুট্ করে শীত এল। তারপর বুড়োদের কাঁধে মাথা রেখে তাদের দেহ থেকে তাপ শুষে নিতে লাগল।

বুড়োরা পাতা জড়ো করে আগুন জবালল। গোল হয়ে ঘিরে বসল। তারপরে প্রাণপণে বলতে লাগল, "কে যেন জন্মের পর স্রোতে ভাসিয়েছিল। তাই চেয়ে দেখলাম মাথার ওপর ছাদ নেই, চারদিকের দেয়াল নেই।"

কেউ বলল, "অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে পথ চলছিলাম কোন ভিনগাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে। তারপর অন্ধকার হ'ল, যারা ছিল সাথের সাথী তাদের মুখ দেখা যায় না,

পাশে কে চলছে জানা যায় না। অন্ধকারকে গাল পাড়ি, কিন্তু ঠাহর করে দেখলে এ অন্ধকারও সুন্দর।"

কেউ বলল, "যাব আর কোথায়, সেই ফিরে আসতেই হয়। অণু অণু হয়ে আমি বাতাসে মাটিতে মিশব। কিন্তু দেখো, তারপর একদিন পাহাড়ে মেঘ জমবে, বৃষ্টি আসবে, বাতাস ভিজবে, মাটির কোষে কোষে ঢুকবে জল। তখন আমি ফুল হয়ে ফুটব, নদীর জল হয়ে বয়ে যাব, বাতাস হয়ে খেলব, মেঘ হয়ে ভাসব।"

এইসব শুনে গাঁয়ের জোয়ানগুলো হাসল।

তাই আমি চন্দ্রাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম।

আমার মা বলেছিল, "বাইরে একটি আগুন জেবলে রেখো। পাহাড় থেকে আমি যেন দেখতে পাই তুমি বসে আছ, তুমি ভাল আছ। ঘর সামলে রেখো, কোথাও যেও না।"

দাইমা বলেছিল: আমার কাছে চল্। আমার ছেলে নেই, তোকে ছেলের মত পাল্‌ব।

বাঁশীওয়ালা বলেছিল: বৃষ্টির জল লেগে বীজধান ফুলবে। বুক ফাটিয়ে শীষ বের করবে আকাশে। বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ ক'রো না। একটা ঋতু আসে, আর একটা যায়।

গাঁওবুড়ো বলেছিল: ঘরদোর সামলে রাখিস। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। মনে রাখিস বাঁশীওয়ালা মাত্র একবার আসে।

গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল: বাঁশীর সুর কিনিস না। তা হলে তোর ঘরে কিছুই থাকবে না।

আমি বলেছিলাম: বুড়ো, তুই আমার বাপ। কোনো ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।

আমি আগুন জেবলেছিলাম। ঘর আগলে ছিলাম।

তবু কেন যে আমার বাবা গেল বিদেশে, রোজগার করতে।

আমার মা গেল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতো।

আমার ঘোড়াটা গেল জলার ধারে, ঘাস খেতে।

চেনা অচেনা

রাধাকে নিয়ে সেই যে পালিয়েছিল সুভাষ তারপর বহুদিন বাদে আবার তার সঙ্গে দেখা হল সেই কলকাতাতেই। পুরোনো কলকাতা তেমনি বয়ে চলেছে পরিবর্তনহীন—ট্রেন থেকে নেমে আমি দেখলাম হাওড়ার ব্রীজ কলকাতায় মাথা রেখে গঙ্গার কোল জুড়ে শুয়ে আছে। সুভাষের সঙ্গে ট্যাক্সি চেপে আস্তে আস্তে ভিড়, অসহ্য লোক, গরম ও তির্যক সূর্যের প্রখর ছায়ার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মাত্র একবার প্রশ্ন করি, 'কেমন আছ?' বোধ হয় বাইরে কলকাতার প্রতিই এই প্রশ্নের আংশিক উদ্দেশ্য ছিল। সুভাষ উত্তর দিল, 'যেমন দেখছেন।' হাসল। সারাক্ষণ ট্যাক্সিতে যেতে যেতে আমি বাইরে তাকিয়েছিলাম। সুভাষের মুখের দিকে একবারও তাকানো হয় নি। কি জানি এতদিন পর দেখা—হঠাৎ যদি ঘেন্না করতে শুরু করি! রাধা কেমন আছে প্রশ্নটা অনায়াসে করা যেতো, কিন্তু কেন যেন আমি সাবধান হয়ে গেলাম, কেননা আমার জিভে যে প্রশ্নটা এসেছিল সেটা হল—রাধাকে কেমন রেখেছ? তার চেয়ে কলকাতার ঠেলাগাড়ি আর ডবলডেকার আর ট্র্যাফিকের লাল আলোর একলাফে হলুদ আর একলাফে সবুজ হয়ে যেতে দেখা অনেক ভাল। কিন্তু এরপরে কি করা উচিত, কিভাবে ওদের সঙ্গে ব্যবহার করব তা ভেবে দেখবার আগেই হুহু করে রাস্তা ফুরিয়ে গেল; টালিগঞ্জে সুভাষের ফ্ল্যাটের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে নিজেকে অগোছালো, গ্রাম্য ও বোকা বলে মনে হচ্ছিল।

আমাকে দেখে রাধা খুশী হয়েছে কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু সে বুদ্ধিমতীর মতোই ব্যবহার করছিল। আমি ওর দিকে একবারও তাকাই নি—ওর পায়ের শব্দ, মাথার তেলের গন্ধ মাঝে মাঝে আমার আশেপাশে ঘুরে গেল। কাপড় ছাড়া হাত-মুখ ধোয়া ইত্যাদি প্রাথমিক কাজগুলো সারবার পর আমি আর সুভাষ নিঃশব্দে চা খেলাম, নিঃশব্দে চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট এগিয়ে দিল রাধা। তারপর সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আমাকে একা রেখে অস্পষ্টভাবে কি বলে সুভাষও ঘর ছেড়ে গেল। পিছন থেকেও ওর মাথার টাকটা চকচক করছিল। আমার চেয়ে বড়জোর বছর চার-পাঁচেক ছোট হবে সুভাষ! তার বেশী কিছুতেই নয়—আমি জানি।

তারপর অনেকক্ষণ আর কেউ এ-ঘরে এল না। আমাকে একা থাকবার, ভাববার সময় দিচ্ছে রাধা, সময় নিজেও নিচ্ছে—আমি বুঝলাম। আমি ওর সাজানো ঘরদোর দেখছিলাম। চমৎকার বড় ফ্ল্যাট—আলো-বাতাস আসে। দেওয়াল ডিসটেম্পার করা

আলতো সবুজ রঙের, সারা ঘরে একটা ক্যালেণ্ডার আর কয়েকটা কাঠ-খোদাইয়ের কাজ দেওয়ালে ঝুলছে, ছোট্ট একটা হোয়াট-নট-এর ওপর বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া এক-জোড়া রয়েছে। আসবাবপত্রে বোঝাই-করা ঘর নয়, কেমন ফাঁকা ফাঁকা, কৃত্রিম বাঙালী ঘরের মতো নয়। সুভাষ এত আধুনিক নয়—বিশেষত ওর বয়স হয়েছে, আমি বুঝলাম এ সবই রাধার কাজ। রাধা কি বরাবর এইসব চাইত! আমি কি রাধাকে কোনোদিন বুঝি নি!

অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। অনেকক্ষণ ট্রেনে থাকবার জন্য আমার সারা শরীর ট্রেনের ঝাঁকুনির মতো দোল খাচ্ছিল। আমার ক্লান্ত শরীর আস্তে আস্তে ভেঙে আসছিল। এ কি আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া যে, আমার এইখানে আসবার কোনো গুরুত্বই ওদের কাছে নেই! ওরা আমাকে গ্রাহ্য করে না, কোনোদিনই করেনি! রাধা এখন কি ভাবছে আমার জানতে ইচ্ছে করছিল। কেন আমি এখানে এলাম এতদিন পর! বাস্তবিক এতদিন পর শুধু ওরা কেমন আছে, সেটুকু জানতেই আমি এতদূর এসেছি—এ-কথা বিশ্বাস করতে ও'দের কষ্ট হবে। এইভাবে ভাবতে ভাবতে ক্রমশ আমার কেমন লজ্জা করছিল—এ যেন ভিখিরীর মতো হয়ে আসা। ঠিক জবাবদিহি চাইতেও নয় কিংবা অনুতপ্ত হয়েও নয়—আমার অবস্থাটা এখন ওদের কাছে কিরকম কিংবা আমার কাছেই বা কিরকম আমি বুঝতে পারলাম না।

খানিকটা সহজ হয়ে নেওয়ার জন্য আমি উঠে আস্তে, প্রায় পা টিপে টিপে, ঘর থেকে বারান্দায় এলাম। পাশের ঘরেই রাধা রয়েছে টের পাওয়া গেল। সুভাষ বেরিয়ে গেছে কি না, বোঝা গেল না। বারান্দার রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আড় চোখে আমি এতক্ষণে রাধাকে প্রথম দেখলাম। পাশের ঘরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে রাধা তার ছেলেকে সাজিয়ে দিচ্ছে। রাধার ছেলে হয়েছে—আমি শুনেছিলাম। ওর মুখটা কা'র মতো হয়েছে, দেখবার জন্য আমি স্থির তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু দরজার পাতলা নেটের পর্দাটার জন্য স্পষ্ট করে দেখা গেল না। শুধু মনে হল, ছেলেটা খুব ফর্সা হয়নি—অন্তত রাধার মতো নয়। শুনলাম. রাধা তার ছেলেকে আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি যদি ও-ঘরে যাও, তবে আমি তোমাকে মারব।'

'কেন!' ছেলেটা বলল, 'কে এসেছে? আমি দেখলাম……' রাধা খুব দ্রুত-বেগে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'আস্তে…'

'আমি কাউকে ভয় করি না।' ছেলেটা বলল, 'তুমি চলে যাও।' রাধা উঠে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তীব্র গলায় বলল, 'বাপি ফের……?'

আমি সরে যাব কি না ভেবে পেলাম না। আমি গোপনে অনুচিত দৃশ্য কিছু দেখছি না। এ-ঘরে সুভাষ নেই; সুভাষ থাকলে আমি সরে যেতাম। তবু মনে হচ্ছিল, আমি যে এখানে আছি, তা রাধাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। আমি থাকলে রাধার কি আসে যায়! রাধার আপনজনেরা আস্তে আস্তে আমার চোখের আড়ালে তৈরী হয়ে গেছে। সেই আপনজনের সঙ্গে রাধার সম্পর্ক চোখ চেয়ে দেখবার ভিতরে কোনো জ্বালা আছে কি না, আমি বিচার করে দেখতে চাইছিলাম। নাকি দীর্ঘ, দীর্ঘ

দিন পর—আজ এই দুজন—রাধা আর তার ছেলে (আমার এত অচেনা) এবং তাদের ভঙ্গুর দৃশ্যাবলী খুব বাইরে থেকে অতিথির মতো দেখে নিয়ে যেতে চাইছিলাম। কিন্তু আমি যা ই ভাবি না কেন, আমি জানি, রাধার তাতে কিছুই যায় আসে না।

রাধা ঘর থেকে বারান্দার দিকে আসতে আসতে একটা অদ্ভুত নাম ধরে সরু অনুচ্চ গলায় বোধ হয় আমাকে ডাকল। মনে হল ছেলেকে বেড়াতে পাঠাচ্ছে। আমি নড়লাম না, এমন কি, যখন রাধা পর্দার দিকে হাত বাড়াল, তখনো আমি স্থির রইলাম। বারান্দায় পা দিয়ে রাধা থমকে দাঁড়াল। পালিয়ে গেল না। শুধু নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা ঢাকা দিতে, যদিও বারান্দায় শেষ-বিকেলের মরা আলো ছিল, তবু সুইচ টিপে আলো জ্বালল রাধা। খুব আস্তে মাথা নীচু করে প্রথম আমার সঙ্গে কথা বলল রাধা, "তুমি বেরোচ্ছো ?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললাম, 'তুমি কত বড় হয়ে গেছ রাধা!' সে মুখ তুলল না। আমি রাধাকে শোনানোর জন্য বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "আমি ঘরে আছি। তোমার ছেলে—কি নাম ওর ?" 'অর্চ্চন।' আমি হেসে বললাম, 'তুমি ওকে যে নামে ডাকো, সেই নামটাই ভাল লাগছে। বাপিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।' আমি রাধাকে দেখছিলাম—ভারী সুন্দর লাগছে রাধাকে—রাধা এমন সুন্দর হবে, আমি জানতাম। সে মুখ তুলল না, পিছনে হাত জড়ো করে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে অনেকক্ষণ পরে বলল, 'আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে। এক্ষুনি।' বলে এত দ্রুত ভঙ্গিতে—যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল রাধা।

আমি আমার ঘরে এসে বসলাম। কেউ—বোধ হয় রাধাই—এক ফাঁকে এসে ঘরের আলো জেবলে দিয়ে গেছে। বাইরে অন্ধকার হয়ে এল। শূন্য ঘর। ঘরের ভিতরে আমি না আমার ভিতরে এই ঘর! তুমি কত বড় হয়ে গেছ রাধা—আমি মনে-মনে কথা বললাম—তুমি বড় হয়ে গেছ, এটুকু বলবার জন্য গত বহুদিন আমি রাত জেগে থেকেছি।

একজোড়া ছোট্ট বুটের শব্দ আমার ঘরের দরজায় এসে থামল। 'আসতে পারি ?' বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করল বাপি। আমি কথা না বলে হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকলাম। চটপটে চোখে সে আমাকে দেখে নিল, তারপর প্রায় দৌড়ে এসে ঝুপ করে অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করল। চেয়ারে উঠে চুপচাপ বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। নিছক কৌতূহল ছাড়া তার চোখে আর কিছু ছিল না। আমি কথা বললাম না। জানি নাম কিংবা পড়াশুনোর কথা দিয়ে শুরু করলে বাচ্চারা খুশী হয় না। আমি ওকে প্রথম কথা বলতে দিলাম। হয়ত আমি কথা বলব ভেবে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বাপি, তারপর হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে ?'

'তোমাকে কেউ বলে দেয়নি ?' আমি ভাবতে ভাবতে বললাম।

সে মাথা নাড়ল, 'না। মা বলছিল, আমি নিজেই জানতে পারব।'

'ও।'

সে খুশী হল না। বলল, 'তুমি এখানে এসেছ কেন ?'

আমি ঝুঁকে ওর দুটো টানা-টানা মেয়েলী চোখ দেখলাম। হেসে বললাম, 'ঠিক

জানি না। বোধ হয় তোমাদের ভয় দেখাতে।'

'ভয় দেখাবে? কি করে?'

'কি জানি।' আমি বললাম, 'হয়ত আমাকে দেখেই তোমরা ভয় পেয়ে যাবে—একথা ভেবেছিলাম।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে বলল, 'আমি ভয় পাই না।' কিন্তু তার গলায় তখন তেমন বিশ্বাস আর নেই—যেমনভাবে সে তার মাকে বলেছিল 'আমি কাউকে ভয় করি না।'

'সে-কথা ঠিক।' আমি বলি, 'দেখছি, সত্যিই আমাকে দেখে তোমরা ভয় পাওনি।'

'মা তোমাকে ভয় পায়।' সে হঠাৎ বলল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি এখন যেতে পারি? পার্কে যাবো।'

'আচ্ছা।' আমি বললাম, 'কিন্তু কার সঙ্গে যাবে?'

'আয়া।'

চলে যাচ্ছিল, আমি হাত তুলে ওকে দাঁড় করালাম। 'কাল তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে।' আমি আস্তে আস্তে, ওর চোখে চোখ রেখে বললাম।

ও ভ্রূ কুঁচকে আমাকে কিছুক্ষণ দেখে ঘাড় নেড়ে জানাল—যাবে। আমি শ্বাস টানলাম। ও আস্তে আস্তে চলে গেল। বুটের শব্দ তেমন জোরালো নয়।

অস্বীকার করে লাভ নেই, রাধার ছেলেকে দেখে আমি একটু হতাশ হলাম। ও বড্ড বেশী বুদ্ধিমান। মনে হয়, ওর আবেগ নেই। কিংবা খুব কম আছে। ঠিক যেমনটা ভেবেছিলাম, রাধার ছেলে ঠিক তেমনটা হয়নি।

আমি আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর পায়চারি করছিলাম। তারপর বারান্দায় গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেক রাতেও সুভাষ ফিরেছে কি না, বোঝা গেল না। কিন্তু সুভাষের জন্য আমার মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু, রাধাও কি জানতে চায় না—কেন আমি এখানে এসেছি! যদি জানতে চায় রাধা, যদি চোখে চোখ তুলে প্রশ্ন করে আমি এখানে এসেছি কেন—তা হলে জবাবে আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু কেন যেন আমার স্থির বিশ্বাস হচ্ছিল, রাধা কোনো প্রশ্নই আমাকে করবে না। যদি না করে—আমাকে ফিরে যেতে হবে।

রাতে রাধার চাকর এসে আমাকে খাওয়ার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। ওরা টেবিলে খায়। সেই টেবিলের দুধারে দুখানা চেয়ার পাতা ছিল। একটিতে রাধা বসে আছে, অন্যটা বোধ হয় আমার জন্যে। বসে বললাম, 'সুভাষ— ?'

'তুমি খেয়ে নাও।' রাধা মাথা নীচু রেখে বলল।

'তোমার ছেলে ঘুমিয়েছে?'

রাধা মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।'

'বাঃ,' কিংবা 'আঃ' জাতীয় একটা অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করে আমি চুপচাপ ঝকঝকে সাদা প্লেটে স্বাদহীন, বর্ণ ও গন্ধহীন খাবারগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়া চাড়া করলাম। এক সময়ে রাধার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে যে, একা খেতে আমার সুবিধে হবে।'

সে মাথা নেড়ে জানাল—'না।'

'তবে!'

'এমনিই।' সে বলল, 'এটা তো সামান্য ব্যাপার।' বলে এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল, 'তুমি খেয়ে নাও।'

সময়টা তেমনি চুপচাপ কেটে গেল।

দেখা গেল, যে ঘরটায় আমি সারা বিকেল ও সন্ধ্যে বসেছিলাম, সে ঘরটায় একটা চৌকি পাতা হয়েছে এবং খুব অল্প সময়ের ভিতর তাতে সুন্দর বিছানা পাতা হয়েছে; এমন কি, নিখুঁত করে চৌকির সঙ্গে লাগানো স্ট্যাণ্ডে মশারি খাটিয়ে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। আমি ক্লান্ত ছিলাম—এতক্ষণ সারাটা সময় আমার ঘুম পাচ্ছিল।

শুয়ে পড়লে রাধা বাতি নিবিয়ে দেওয়ার জন্য এ ঘরে এল। ঘুরে ফিরে কি একটু দেখল, বোধ হয় সে আমাকে আজকের দিনটা সময় দিচ্ছে। ঘর অন্ধকার করে দিয়ে সে বলল, 'তুমি ঘুমোও—' বলে বোধ হয় আমাকে সম্বোধন করতে গিয়ে দ্বিধা করল সে। আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। সে বলল, 'পাশের টুলে জল ঢাকা আছে। তোমার বাঁদিকের দেয়ালে বাথরুমের দরজা। বালিশের পাশে বাঁ ধারে বেড সুইচ। যদি রাতে দরকার পড়ে—ডেকো। একবার ডাকলেই শুনতে পাবো।' বলে চলে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে ও বাদবাকী রাত্তিরের জন্য আমাকে আলাদা করে রেখে চলে গেল।

সারারাত মাঝে মাঝে আমার ঘুম ভেঙেছিল। সুভাষ ফিরল কি না, কিংবা কখন ফিরল, কিছুই টের পাওয়া গেল না। ওরা খুব চুপচাপ—কোনো কথাবার্তার শব্দও শোনা গেল না। মনে হচ্ছে, কালকের দিনটি আমার খুব ভাল যাবে না। কি হবে, মাঝে মাঝে ভাবলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, ওদের জন্য আমি কিছুই আনিনি। অন্তত রাধা এবং তার ছেলের জন্য কিছু নিয়ে আসা উচিত ছিল। কিন্তু আমি এখানে আসবো বলে এত উত্তেজিত ছিলাম কদিন, আর প্রায়ই এমন ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম যে, এমন অনেক তুচ্ছ জিনিস আমার মনে আসেনি।

ঘুমিয়ে পড়ছিলাম আস্তে আস্তে বোধ হয় তন্দ্রা কিংবা অর্ধস্বপ্নের ভিতর হঠাৎ দেখা গেল, ভেজানো দরজা ঠেলে রাধা দরজায় কয়েক পলক দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভালো করে তাকাতে আর তাকে দেখা গেল না। দরজা তেমনি বন্ধ রয়েছে।

পরদিন যা ভেবেছিলাম, তা কিন্তু ঘটল না। সুভাষ পালিয়ে বেড়াচ্ছে—তার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। আমি যে তাকে কি ভীষণ ঘেন্না করি তা হয়ত সে টের পাচ্ছে। সারাটা দিন বারুদঠাসা-চোরামার ও গোপন অসতর্ক উত্তেজনায় থাকতে না পেরে আমি কিছুক্ষণ আশেপাশে কলকাতার রাস্তাঘাট মানুষজন দেখে বেড়ালাম। দুপুরে বাপি স্কুলে গেছে, সুভাষ নেই, বাড়িতে রাধা ছাড়া কেউ ছিল না। আমি তেমনি একা একা বসে দুপুরের দেওয়া খাওয়ার প্লেট নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। খুব সামান্যই খাওয়া গেল—না খাওয়ার মতোই। মুখোমুখি মাথা নীচু রেখে রাধা কাল রাত্তিরের মতোই বসে ছিল। বোধ হচ্ছিল আমি উঠে গেলে রাধা ওখানে বসেই কাঁদবে। ও কাঁদবে একথা ভাবতে আমি কি ভীষণ উত্তেজিত হই!

বুঝতে পারছি—আজও রাধা ছাড়া আমার কেউ নেই।

বিকেলে বাপি আমার হাত ধরে পার্কে যাচ্ছিল। লক্ষ করলাম বাপি খুব বেশী কথা বলে না। কিংবা আমার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়নি বলে সে হয়ত মুখ খুলতে পারছিল না। হাঁটতে হাঁটতে সে এক সময় একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে একটা ল্যাম্প-পোস্টে ঠং করে ছুঁড়ে মারল। বলল 'তুমি সাইন-বোর্ডটা দেখেছ ?'

'কোনটা ?'

'ঐ যে আমরা পেরিয়ে এলাম!' সে বলল, 'একটা বাড়ির গেটে সাইন বোর্ডটা ঝুলছে, বি ওয়্যার অব ডগ—কুকুর হইতে সাবধান!'

আমি মাথা নাড়লাম—'না। দেখিনি।' ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। বলল 'আসলে কিন্তু ও বাড়িতে কুকুর নেই।'

'নেই!'

ও মাথা নাড়ল, 'ছিল একটা। মরে গেছে।'

তবে সাইন বোর্ডটা খুলে নেয়নি কেন ?

'ভয় দেখাতে চায়।' ও মাথা নীচু করে বলল।

আমি কথা বললাম না। বাপি যে খুব বুদ্ধিমান ছেলে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বহুকাল হয় আমি বাচ্চাদের সঙ্গে আর মিশিনি। ওদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করলে ওরা খুশী হয় আমি জানি না। আমি ভাবছিলাম। বাপিও কথা বলল না। আমরা চুপচাপ হেঁটে খানিকক্ষণের মধ্যেই হই হট্টগোলে ভরা পার্কে পেঁছে গেলাম। বাপি চঞ্চল হ'ল, কিন্তু আমার মনে হ'ল আমার হাত ছেড়ে দৌড়ে যাবার সাহস তার নেই। 'তোমার বন্ধুরা কোথায়, বাপি ?'

'নেই।' সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল।

হঠাৎ আমি ওর জন্য খুব কষ্ট বোধ করলাম। হাঁটুগেড়ে ওর সামনে নীচু হয়ে বসলাম, 'আমার সঙ্গে আসতে ভাল লাগেনি, না ?'

উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে আমার মুখ দেখল। হঠাৎ বলল, 'তুমি কী ভাবছ যে, তুমি কথা বললে না…!'

আমি ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম, 'আমি সারাক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম, বাপি।'

এমন প্রকাশ্য জায়গায় অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে আমার এই জড়িয়ে ধরা বাপি পছন্দ না। 'ছেড়ে দাও' বলে ছটফট করে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। [আমি] চুপচাপ ঘাসের ওপর বসে রইলাম। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমি একই জায়গায় সারাক্ষণ বোধহীন বসেছিলাম—যদি বাপি এসে আমাকে খুঁজে পায় সেই ভয়ে আমি কোথাও গেলাম না। বোধ হয়, রাধার ছেলেকে আমি [ভাল]বেসে ফেলেছি। অনেকক্ষণ পর বাপি খেলা সেরে আমার কাছে ফিরে এল।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বাপির হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি ফিরে আসছিলাম। আমার কাঁধে যেন ভূত চাপল। প্রশ্ন করলাম 'আচ্ছা বাপি, তোমার জানতে ইচ্ছে

করে না, তুমি কে ?'

ও আমার দিকে তাকাল।

আমি হেসে বলি 'আমি কে—তুমি জানতে চাও ?'

ও মাথা নেড়ে জানায়—হ্যাঁ।

'তেমনি—' আমি বলি 'জানতে চাও না তোমার মা কে ? তোমার বাবা কে ?'

বাপি আমার হাত টেনে বলল 'তুমি কি সব বলছ ?'

'বলছি—' হাসলাম 'ভয় পেও না। তুমি জান না, তোমার দিদিমা ছিল জার্মান।'

ও আমার কথার বিন্দুমাত্র অর্থ করতে পারল না। একটু হাসল। অবিশ্বাসের হাসি।

আমি বলি 'সত্যিই!'

'মেম ?' ও প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ।'

'আমি কিন্তু মাকে জিজ্ঞেস করব।'

'করো।'

'তুমি মার কে হও ?'

'বন্ধু' আমি শ্বাসকণ্ঠ রোধ করে বললাম। কথাটা আমার ঠোঁটে এসে গেল কিন্তু বাপি কথাটার অর্থ করতে না পেরে তাকিয়ে রইল। একটু হোঁচট খেল। আমি ওর হাত আরো জোরে ধরে ওকে অন্যমনস্ক করে দেওয়ার জন্য বললাম 'বলো তো ইন্টারন্যাশনাল কথাটার অর্থ কি হবে!' বলেই বুঝতে পারলাম বাচ্চাদের কি করে ভোলাতে হয় তা আমি একদম জানি না।

'জানি না।' ও অদ্ভুতভাবে বলে।

আমি আবার ওকে অধিকার করবার জন্য ভিখিরীর মতো বললাম, 'চলো তোমাকে খেলনা কিনে দিই।'

'না।'

তারপর আমরা চুপচাপ ফিরে এলাম। বুঝলাম রাধার ছেলে আমার কাছে অত সহজ নয়।

আজও সুভাষ বাড়িতে নেই, বোঝা গেল। সে বোধ হয় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। হয়ত অনেক রাতে বাড়ি ফিরছে কিংবা আদৌ ফিরছে না। আমার খুব ক্লান্তি লাগছিল। টের পাচ্ছি এখন আমার বয়স গড়িয়ে গেছে। এই বয়সে আর নতুন করে কিছুই শুরু করা যায় না—স্নেহও নয়, ঘৃণাও না। ভেবেছিলাম সুভাষের সঙ্গে একটা মীমাংসা করা যাবে। কিন্তু আশ্চর্য যে এখনো আমি তাকে অনুরূপ ঘেন্না করি। রাধা তাকে ভালবাসে কি! কি করে বাসে! আমি যাকে এত ঘেন্না করি তাকে রাধা কি করে ভালবাসে—ভেবে পাই না।

সারাটা সন্ধ্যেবেলা বাপি আমার কাছে আর এল না। ভাবছিলাম ওদের ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব। কিন্তু সাহস হল না। আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এসে বিছানায় বসলাম। সুভাষের জন্য এত ঘেন্না আমার কোথায় ছিল!

টের পাচ্ছি রাধাদের এই ঘর খুব নিস্পৃহভাবে সাজানো। বড্ড ফাঁকা। এখানে মার মন বসছে না। স্বস্তি পাচ্ছি না। আমার খোঁজ করতে কেউ এল না। মনে ঠিক গতকালের মতোই আজকের রাতটাও কেটে যাবে। যদি তাই হয়, তবে এবার র যেতে হবে। কাল—আমি ঠিক করলাম—কাল হয়ত বিকেলের দিকে আমি র যাব। আমি এখানে কেন এসেছিলাম তা আস্তে আস্তে গুলিয়ে যাচ্ছে।

আজও খাবার টেবিলে রাধা ছাড়া কেউ ছিল না। আজ রাধা আমার চোখে চোখ লে কিছুক্ষণ। বলল 'তুমি দু'দিন প্রায় উপোস করছ।' একটু শ্বাস ফেলে বলল া অন্যায়।'

আমি আস্তে আস্তে বললাম 'আমি এরকমই খাই।'

ও চুপ করে আমার চোখে চোখ রাখল। এবার আমি মাথা নামিয়ে নিলাম। াম 'এখন বয়স হয়েছে।'

বয়সের কথায় কেমন বিব্রত হয়ে পড়ল রাধা। ওর চুড়িপরা হাত সশব্দে টেবিলের থেকে পড়ে গেল। মনে হয় সুভাষের কথা ওর মনে হ'ল। নাকি ও বড় বেশী স্থর হয়ে পড়েছে—আমি বুঝলাম না।

'খাও।' রাধা বলল।

আবার সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চোখ তুলে দেখলাম রাধা আমাকে খছে—স্থির, স্নিগ্ধ চোখ তার। আমার লজ্জা করছিল। কাটিয়ে উঠবার জন্য বললাম 'পি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি?'

ও মাথা নাড়ল—হ্যাঁ।

'তুমি ওকে এতদিন জানিয়ে দাওনি কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি খেয়ে নাও।' সে বলল 'পরে শুনো।'

'কিন্তু আমাকে যেতে হবে।'

চুপ করে রইল।

দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম বলে আমি শুয়ে পড়লাম না। একটা মাসিক পত্রিকা খুঁজে য় চোখ মেলে বসেছিলাম বিছানায়। এমন অর্থহীন সময় আমি আর কখনো াইনি। পর্দায় চলচ্চিত্র দেখবার মতো খুব বাইরে থেকে আমি এইসব দেখছি। এই ত শব্দ এত কম হয় যে মনে হয় এ বাড়িতে কারো খুব অসুখ করেছে। মনে এ অসুখটা আমিই সঙ্গে করে এনেছি। তবে বাস্তবিক আমি কি দেখতে বা কি জানাতে এসেছিলাম তা আমি এখনো জানি না। কিন্তু মনে হয় ঠিক ভিখিরীর াও আসিনি। একটু অধিকার এবং তার অহংকার কোথাও আমার এতটুকু ছিল। য আবার শ্বাসকষ্ট টের পাচ্ছিলাম। বালিশটা উঁচু করে পিঠ হেলিয়ে দিয়ে বসলাম। কাল আমি ফিরে যাব। স্থির।

যতদূর দেখা যাচ্ছে আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। ভাবছিলাম যাওয়ার াগ একবার সুভাষের সঙ্গে দেখা করে যাব। কাল সকালে আমি রাধাকে বলব, ভাষকে বোলো, আমি ওর সঙ্গে একবার কথা বলে যেতে চাই।' কিন্তু কি বলব

সুভাষকে ! জানি না, হয়ত মুখোমুখি হলে কথা তৈরী হয়ে যাবে। বড় ক্লা
লাগছিল।

একটু ঘুম এসেছিল। দরজার কাছ থেকে নরম বিষন্ন গলায় ডাক এল 'বাবা।'

তাকিয়ে দেখি—রাধা। চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। দ
নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমি আবার শ্বাসকষ্ট টের পাচ্ছিলাম। এলোপাথাড়ি কথা আসছি
আমার ঠোঁটে। কিন্তু আমি চুপ করে নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম।

'বাবা', একটু ভেঙে ভেঙে রাধা বলল 'আমি যদি তোমার কাছে একটু আসি··· ?'

বললাম 'এসো রাধা, আমি জেগেই ছিলাম।' একটু চুপ করে থেকে বলি 'ঘ
আসছে না।'

'জানি' সে বলল 'তুমি কাল সারারাত ছটফট করেছ। আমি দরজায় কান রে
শুনছিলাম।' চুরি করে হাসল।

আস্তে আস্তে প্রায় বিপর্যস্ত রাধা আমার দিকে চোখ না তুলে বিছান
কাছে এসে দাঁড়াল। আমি পা সরিয়ে বললাম 'এইখানে বিছানায় আমার কাছে বোসো

বসল। আমি কথা বললাম না। আমি তীব্র পিপাসায় ওর বসে থাকার
কয়েকটি মুহূর্ত ভিতরে, গভীরে গ্রহণ করছিলাম। শরীরে তেমনি সুন্দর বাঁক দি
আজো বসে রাধা। ও একটু রোগা, দীর্ঘ গ্রীবা, খুব কালো বড়ো টানা চোখ ওর
এটা জুন মাস, সামনের অগস্টে ওর সাতাশ পূর্ণ হবে।

কেমন সুগন্ধ বাতাসে। এ ঠিক প্রসাধনের গন্ধ নয়। এ আমার অনেকদিনে
চেনা গন্ধ—পুরোনো। কয়েক মিনিট আমরা কথা বললাম না। আমি রাধা
ভাবতে সময় দিচ্ছি, আজ আমিও সময় নিচ্ছি।

'সুভাষ কোথায় ?' প্রশ্ন করি। অর্থহীন প্রশ্ন।

'আসেনি।' মৃদু গলায় বলল।

তারপর অনেকক্ষণ আবার কেটে গেল। কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।
হচ্ছিল কথা বললেই তা খুব আবেগপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। 'তুমি আমাকে কি
বলতে চাও রাধা।'

রাধা মুখ তুলল 'কাল থেকে তুমি আমাকে একবারও ডাকলে না, বাবা !'
স্বর অনেক স্পষ্ট ও তীব্র মনে হ'ল।

আমি আস্তে আস্তে বললাম 'আমি তো তোমার কাছেই এসেছি।'

ও মাথা ঝাঁকায় 'জানি।' চোখে স্নিগ্ধ চোখ তুলে বলে 'কাল থেকে লুকি
লুকিয়ে তোমাকে কতোবার দেখেছি।'

'কেন, রাধা !'

'কেন যেন সামনে আসতে ভয় করছিল।' ও হাসল 'তোমার চিঠি পাওয়ার পর থে
গত সাতদিন ঘুমাইনি।' বাচ্চা মেয়ের মতো লজ্জায় মুখ নামিয়ে বলল, 'খাইওনি।'

'কেন রাধা ?'

'খুব অস্থির লাগছিল।'

চুপ করে রইলাম। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলি 'তুমি কোনোদিন আমাকে য় পাও—এ আমি চাইনি। তুমি জানো—'

'বাবা', রাধা বাধা দিয়ে বলে 'তুমি অন্য কোনো কথা বল।'

আমি চোখ বুজলাম 'তুমি কি জানতে চাও?' আড়চোখে দেখি আঁচলে চোখ মুছে ল। বলল, 'তুমি কি এভাবে কথা বলবে, বাবা?'

হাসলাম। ভিতরে হাসির কোনো তাগিদ ছিল না। কত অকারণে আমরা হাসি! স ফিস করে প্রায় কবিতা পড়বার মতো করে রাধা বলে 'গত সাতদিন আমি খুব স্থির ছিলাম। তুমি আসবে—আমি জানতাম। কিন্তু সত্যিই যখন আসবে বলে ঠি দিলে বাবা, আমার সব শক্তি চলে যাচ্ছিল। এক একটা দিন কত আস্তে আস্তে র হয়ে গেছে। খুব, খুব ভালবাসার কেউ—খুব প্রিয় কেউ এলে বোধহয় এমন হয়, বাবা?' ওর গলার স্বর ভেঙে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে শব্দগুলো জড়িয়ে চ্ছিল 'এ কেমন একটা পাপবোধ বাবা, মনে হচ্ছিল তোমাকে ভালবাসা বোধ হয় ব দোষের।' ও মাথা নাড়ল, আপন-মনে লাজুকের মতো হাসল—'কিন্তু তোমাকে খে আবার আমি সামলে গেলাম। যেন তুমিই আমাকে শাসন ও সংযত করে দিলে। কন্তু তোমাকে ডাকবার সাহস আমার ছিল না। কেমন যেন মনে হচ্ছিল 'বাবা' বলে কলে ডাকটা নষ্ট হয়ে যাবে! সেই ভয়ে আমি ডাকিনি।'

'রাধা' বললাম 'তুমি এ সব সত্যি বলছ?'

'তুমি সামনে থাকলে বাবা, আমার মনে হয় তুমি আমার সব জানো। আমার ভতরে যা আছে—আমার মন, বুদ্ধি এ সবই তুমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো। আমার কানো কিছুই যেন আমি কোনোদিন তোমার কাছ থেকে গোপন করতে পারিনি। তুমি ানো আমি মিথ্যেবাদী নই, কিন্তু তুমি জান না তোমার ভয়েই আমি কখনো মিথ্যে থা বলিনি! অন্তত তোমার সামনে কখনো নয়। জানতাম তুমি ধরে ফেলবে।'

'কিছু মনে কোরো না, রাধা' আমি হাসিমুখে বললাম 'তুমি বলো, আমি শুনছি।'

'তুমি আসবার পর আবার আমার ভয় হচ্ছিল যে তুমি আমার সব চালাকি ধরে ফলবে, তোমার চোখের দিকে একবার তাকালে আমার সব বুদ্ধি, সব ইচ্ছে নষ্ট য়ে যাবে।

'খুব স্বাভাবিক।' আমি যতদূর সম্ভব আবেগ চেপে রেখে শুকনো গলায় বললাম তুমি ছাড়া আমার কোথাও কেউ নেই। আমি তোমাকে ভালবাসব—এতো স্বাভাবিক, াধা, তুমিও বাসো।'

'বাসি।' আবার বাচ্চা মেয়ের মতো হাসল 'ঠিক। তোমার চেয়ে কাউকে কখনো বশী ভালবাসতে পারিনি। কিন্তু ছেলেবেলায় যখন কেউ জিজ্ঞেস করত, আমি আমার াবাকে ভালবাসি কিনা, তখন উত্তর দিতে আমার ভয় করত। আমি কখনো সত্যি কথা লতে পারতাম না, যেন কোন গোপন কথা ধরা পড়ে যাবে। কেন, বাবা?'

'কেন, রাধা?'

ও ছেলেমানুষের মতো পা দোলাচ্ছিল, বলল 'আমি ভাবতাম, তুমি সব জানো তোমাকে জিজ্ঞেস করলেই তুমি বলে দেবে। আমি এখনো জানি, এর উত্তর তুমি দিতে পার। তুমি জানো, আই অ্যাম পজেজড্।'

'না।' আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম 'আমি জানি না।'

ও আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে এই গরমের মধ্যেও একটা বুড়োটে শীত আমার হাতে পায়ে চেপে বসেছিল। ও আস্তে আস্তে বলে 'তবে তুমি এখানে কেন, বাবা?' ফিরে তাকাল না। শুধু ওর ঘন গাঢ় চুল ফুলে ফেঁপে ওর পিঠময় কেঁপে যেতে থাকে। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বলি 'ঠিক আছে। আমি জানি। আমি স্বীকার করছি।'

ও ওর হাসিমুখ হঠাৎ আমার দিকে ফেরালে আমি চকিতে লক্ষ করি ওর মুখ এখন ঝকঝকে পরিষ্কার এবং বোধহয় খানিকটা নিষ্ঠুরও। ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'আমি কিন্তু কাঁদিনি বাবা। ভান করছিলাম।' আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে বসল। কপাল থেকে কয়েকগুচ্ছ চুল অগোছালো হাতে সরিয়ে দিয়ে বলে, 'আমি ভাবছিলাম— তুমি কেন এলে!' বিষণ্ণ হাসল। 'কিন্তু তুমি এত অহঙ্কারী বাবা যে, জানতেও চাওনি, আমি কেমন আছি! এখানে আমি সুখে আছি কিনা।'

'আমি জানতে চাই, আমি হাসিমুখে বলি, তুমি সুখী হয়েছ কি না।'

হঠাৎ ওর বড়ো বড়ো চোখ সম্পূর্ণ খুলে গেল, দাঁতে ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ বলে, 'না। তুমি চাও না, বাবা। আমি জানি।'

আমার শরীর হিম হয়ে আসছিল। রাধা যেন—ওর পুতুলের মতো আমাকে খেলবে—মনে হল। আমাকে কথা বলতে হল না। রাধা নিজেই বলল, 'কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই—'

'কি'

'বলতে চাই যে, আমি সুখী নই।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, 'কিন্তু এ-বিয়েটাই তার কারণ নয়। বোধহয় কখনো কোনো অবস্থাতেই আমি সুখী হতাম না। একমাত্র বোকারাই নিজের অবস্থাতে সুখী হয়। কিন্তু তুমি জানো—আমি বুদ্ধিমতী

'তুমি বুদ্ধিমতী। আমি বলি, কিন্তু আমি কখনো টের পাইনি যে, তুমি ছিলে না।'

'ছিলাম।' হাসল, 'তোমার কাছে। যখন ছোট্ট ছিলাম, যখন আমার জার্মান আমাকে তোমার কাছে ফেলে রেখে গিয়েছিল।' তারপর বেশ ক্লান্ত হয়ে বলল, তখন আমি খুব ছোট্ট ছিলাম, আর বোকাও ছিলাম। না, বাবা।' মাথা নাড়ল 'কিন্তু এখন আর আমি তা হতে পারি না। এমন লোক আমি কখনো খুঁজে পেতাম না—যে ঠিক তোমার মতো। তোমার মতো যে আমাকে বুঝতে পারে, তোমার মতো যাকে আমি বুঝতে পারি, এমন কেউ বোধহয় নেই। সুভাষ তোমার মতো নয়—আমি জানতাম। না বাবা, আমি সুখী নই—কখনো হতে পারতাম না।'

'কি জানি তুমি এত কথা কি করে বলছ রাধা! আমি নিষ্ঠুরের মতো বলি, 'হয়

সুভাষের সঙ্গে তুমি আমার বয়সের মিল খুঁজে পেয়েছিল।'

'পেয়েছিলাম', এতটুকু লজ্জা না পেয়ে আমার মেয়ে আমার চোখে স্নিগ্ধ চোখ তুলে তাকায়. 'কিন্তু আমি জানতাম, তোমার পাশে ওর তুলনাই চলে না। জানতাম, তুমি ওকে ঘেন্না কর। এ-কথা সুভাষও জানে।'

'করি, রাধা।'

হাসল, 'আমি তাতে রাগ করি না, বরং খুশী হই। আমি কখনো ভাবতে পারি না বাবা, আমাকে ছাড়া তুমি আর সবাইকে ঘেন্না না করে থেকেছো! আমিও সবাইকে ঘেন্না করি, বাবা!'

'ছিঃ, রাধা।'

ও নেশাগ্রস্তের মতো হাসে, 'করি বাবা। সে-কথা তুমিও জানো। তুমি আমার সব জানো বাবা।'

'কি জানি!'

তেমনি অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসে রাধা, 'আমি এখানে সুখী হলে—আমি জানি, তুমি খুব কষ্ট পেতে। আমাকে তোমার কাছে ছাড়া আর কোথাও তুমি সুখী দেখতে চাও না।'

'বোধহয় তুমি পাগল হয়ে গেছ', আমি হতাশ হয়ে বলি।

'জানি, তোমার চোখ আমাকে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পায়। আমি মুক্তি পাই না।' রাধা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। তারপর এলোমেলো পায়ে—যেন স্বপ্নের ভিতরে মেঝের ওপর হাঁটতে থাকে। যেন আমার মেয়ের বয়স সাতাশ নয়, যেন ও সবেমাত্র হাঁটতে শিখছে। দু-হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া—যেন ও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না—ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ও কোনো অবলম্বন খুঁজছে। 'ঠিক এই-ভাবে—' ও বলে, 'তুমি আমাকে হাঁটতে শিখিয়েছিলে। কিন্তু আমি নিজে নিজে হাঁটতে শিখলে—আমি জানি, তুমি তখন খুশী হওনি।'

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, 'বোকা!'

'আমি কি নাটক করছি, বাবা!' ও ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকায়। আমি চুপ করে হাসিমুখে চেয়ে থাকি।

'আমি অনেক নাটক করেছি বাবা, ও বলে, 'তুমি জানতে চাও না কেন করেছি? জানতে চাও না কেন নাটক করে পালিয়ে এসেছিলাম?'

'চাই, রাধা।'

রাধা ক্লান্ত হতাশের মতো বলে, 'আজ বাপি সন্ধ্যেবেলায় আমাকে অনেক প্রশ্ন করছিল। সে জানতে চাইছিল, ইণ্টারন্যাশনাল শব্দটার অর্থ কি। আমি বলেছি—ট্যাঁশ। বলেছি—তুমি ট্যাঁশ বাপি।'

'ছিঃ, রাধা।'

'সে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, তুমি আমার কে হও। জিজ্ঞেস করছিল, আমি তোমাকে ভয় পাই কি না। আমি ওকে খেলনা দিতে চাইলাম—নিল না। বেড়াতে

নিয়ে যেতে চাইলাম—গেল না।' ও দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করে বলল, পুরুষ-মানুষের সামনে আমি কেমন দুর্বল হয়ে যাই বাবা। বাপির ওপরেও আমি কোনো জোর করতে পারি না। মনে হয় ও আমার চোখে চোখ রেখে যদি কিছু করতে বলে, হয়ত আমাকে তাই করতে হবে।' ও হাসল। 'সুভাষের ওপরেও আমার কোনো জোর খাটেনি। আমাকে নিয়ে যেতে চাইল—আমি নিশি-পাওয়ার মতো চলে গেলাম।' ও হঠাৎ সচেতন হয়ে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'এটা কি খুব স্বাভাবিক বাবা ?'

আমি কথা বলতে পারলাম না। শুধু মাথা নেড়ে জানালাম—না।

'কিন্তু তুমি আমাকে কখনো জোর করতে শেখাওনি। আমি কিন্তু কখনো ভুলে যাইনি, আমার মা ছিল খাঁটি জার্মান, আমার বাবা ছিল খাঁটি ভারতীয়, কিন্তু আমি তত খাঁটি নই।' একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ স্খলিত ভাঙা গলায় বলে, 'কিন্তু এ-সবই তুমি আমাকে ভুলিয়ে দিচ্ছিলে—আমার বয়সের প্রথম পাঁচ বছর আমি জার্মানীতে যা-যা শিখেছিলাম - সব। তুমি ছিলে আমার চারধারে ঘেরাটোপের মতো। আমি জানতাম —আমি শুধুমাত্র তোমার মেয়ে। আমি অন্য কারো নই, অন্য কিছু নই।'

'তুমি ঠিক কি চেয়েছিলে রাধা ?'

আবার ও নেশাগ্রস্তের মতো হাসে, বোধহয় জানতে চেয়েছিলাম, তোমাকে বাদ দিলে আমার কতটুকু থাকে। হাতের কাছে তোমার বন্ধু ছিল—সুভাষ।' আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। 'মনে হয়, পুরুষদের প্রতি আমি খুব দুর্বল, না বাবা ?'

রাধা হাঁটছিল। হাঁটছিল। একটু মৃদু হাসি ওর মুখে লেগেই ছিল। 'আমি জানি, বাবা', সে তেমনি অপ্রকৃতিস্থের মতো, কবিতা পড়বার মতো গুন গুন করে বলে, 'তুমি ক্ষমা-টমার কথা বলতে এতদূর আসোনি।'

'কেন এসেছি, রাধা ?'

'তুমি জানো বাবা' বলে হঠাৎ ও শিশুর মতো কাঁদতে থাকে। আমি বাধা দিই না। কান্নার ভিতর থেকে ও বলে, 'আমি কখনো নিজের মতো হয়ে উঠিনি।' আস্তে আস্তে ও আবার আমার পায়ের কাছে পোষা বেড়ালের মতো এসে বসে। খানিকক্ষণ কেঁদে চুপ করে রইল রাধা, তারপর বলল, 'কাল থেকে আমি তোমাকে দেখছি। তুমি কখনো এতটুকু অস্থির হলে না। যেন খুব বড়ো গাছের মতো তুমি। অথচ আমাকে তুমি কাঁদতে দেখেছ, অস্থির হয়েছি—টের পেয়েছ। তুমি আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ বাবা।' হঠাৎ স্খলিত তীব্রস্বরে বলে, 'কিন্তু তুমি জানো, আমি তোমাকে এতটুকু নাড়াতে পারি না।'

'আমি তোমার কি করেছি, রাধা ?' আমি ক্লান্তস্বরে বলি, 'তোমার কথা শুনে নিজেকে শয়তান বলে মনে হয়।'

ও ওর হাসিমুখ হঠাৎ আমার দিকে ফেরালে, আমি টের পাই, হঠাৎ ওর সমস্ত

আবেগ যেন এইমাত্র কেটে গেল। খুব শান্তস্বরে বলল, 'বাবা, তুমি আমাকে একটা কথা বলবে?'

আমি ভয় পেলাম। যেন অস্পষ্টভাবে হলেও বুঝলাম, ও কি জানতে চায়। বললাম, 'বলো।'

'তুমি কেন আবার বিয়ে করলে না বাবা?' ও আমার চোখে চোখ রাখে। 'মা যখন তোমার কাছে ছাড়া পেয়ে আফ্রিকায় চাকরি করতে চলে যায়, তখনো তোমার বয়স কম ছিল। বোধহয় সাতাশ—না, বাবা?'

আমি ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। শান্তভাবে বললাম, 'তোমার কাছে এটা আশা করি না, রাধা। সব কিছু জেনে গিয়ে কোনো সুখ নেই। তুমি এত জানতে চাও কেন?'

আমার কথাকে গ্রাহ্য না করে সে ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। তেমনি, যেন অস্ফুট স্বপ্নের ভিতর থেকে বলে, 'বোধহয় আমি জানি।' তেমনি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়, 'তুমি বড়ো একা, বড়ো জেদী। কারো সঙ্গেই তোমার কখনো মেলেনি, বাবা। কোনো মেয়েকেই তুমি সহ্য করতে পারতে না।' '...আর তা ছাড়া, আমার জন্য তুমি সবসময়ে সুন্দরী আর অল্পবয়সী আয়া রাখতে...'

আমি দুটো হাত কাঙালের মতো তুলে বললাম, 'রাধা'।

'বাবা', একটুও বিচলিত না হয়ে সে বলে, 'আমি জানি। তুমি কি ভীষণ ছেলেমানুষ আমি জানি, বাবা। তুমি টের পাওনি—কিন্তু আমি আমার আয়াদের ঘেন্না করতাম।' ও চোখ সরিয়ে নেয়, 'এইভাবে—বোধহয় এইভাবে আমি সবাইকে ঘেন্না করতে শুরু করি—আর কেমন একা হয়ে যাই।' আবার হাসে রাধা। 'তবু মনে হয়, আমি অনেকের কাছ থেকে ভালোবাসা পেতে চেয়েছিলাম—বোধহয় আমি অনেকের হতে চেয়েছিলাম' আমাকে নিয়ে যেন খেলার মতো করে সে হঠাৎ বলে, 'তুমি এ-সবই জানতে। তুমি আমার সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাও।' নিষ্ঠুরের মতো আমাকে কষ্ট দেবার জন্য কৃত্রিম ভয়ের স্বরে বলে, 'আমার কেমন মনে হচ্ছে যে, তুমি আগে থেকেই জানতে আমি আজ এরকম একটা নাটক করব। যেন খুব হতাশ হয়ে বলে 'কে জানে, হয়ত আমি আর যা-যা বলব, তা-ও তোমার মুখস্থ কি না।'

আমি উত্তর দিলাম না। ও খুব ভেবে নিয়ে যেন অনেকদূর থেকে বলল, 'কিন্তু অবশেষে......'

'কি, রাধা?'

'আমি এখন আলাদা মানুষ।' হাসল।

'তুমি নও, রাধা' আমি নরম স্বরে বললাম।

ও কান দিল না। আস্তে আস্তে বলল, 'আমি এখন খুব একা বাবা। কেউ নেই...সুভাষ না, তুমি না......এমন কি, বাপিও না।' হাসল, 'আই ডোণ্ট পজেজ। বিশ্বাস না হয়, বাপিকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

ও উঠে দাঁড়াল, 'তুমি ঘুমোও বাবা। আমি যাচ্ছি। বেচারা সুভাষ হয়ত চোরের

মতো এসে বসে আছে।'

ও দরজার কাছে চলে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম না। ভেঙে ফেলার আগে কয়েক মুহূর্ত—মাত্র সেটুকু সময় দিলাম ওকে। ও চৌকাঠ ডিঙোতে পা তুললে আমি নরম গলায় ডাকলাম, 'রাধা।'

ফিরে তাকিয়ে হাসল, 'বলো।'

'আর একবার আমার কাছে এসো।'

ও ফিরে ঘরের মাঝামাঝি এসে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াল। আমি সামান্য হাঁফাচ্ছিলাম। আমি ওকে আমার কষ্ট দেখতে দিলাম। বললাম, 'মনে হচ্ছে তুমি বড় কষ্টে আছো, রাধা। তোমার মুখ বলছে, তুমি বড়ো যন্ত্রণা পাও।'

'পাই বাবা।' একটু চুপ করে থেকে হেসে বলে, 'কিন্তু তুমি ক্ষমা-টমার কথা বোলো না!'

আমি কি বলতে চেয়েছিলাম, ভুল হয়ে গেল।

'আর, তাতে আমার দরকারও নেই, বাবা।' আস্তে আস্তে বলল।

'কেন, রাধা।' আমি বললাম। ভাবছিলাম, ওকে বলি—আমার সঙ্গে চলে চল।

'তোমাকে ছেড়ে আমি বড়ো একা, বাবা।' কিন্তু এ আমার নিজের একা থাকবার কষ্ট—এখানে কাউকে আমার সহ্য হয় না।' ও বলে, 'আমি ঠিক পারব। তুমি দেখে নিও।'

'কি পারবে, রাধা!'

'আমি আমার কষ্ট লুকিয়ে রাখতে পারব, বাবা। হাসল, বলল, 'তুমি ঘুমোও।' তারপর আমাকে শুইয়ে দিয়ে চারধারে মশারি ফেলে দিল সে। বাতি নিবিয়ে দিলে, অন্ধকার থেকে তার গলার স্বর শোনা গেল, 'তুমি পারো না বাবা, তুমি আর কিছুই পারো না। তুমি যখন আমাকে দরজার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনলে, তখনই আমি জানতাম—তুমি ভাবছিলে, আমি ভেঙে যাবো। না বাবা?' স্খলিত কণ্ঠে হাসল 'তুমি কি ভীষণ হিংসুক বাবা!'

ও দরজার কাছে গেলে ওকে ওর ছায়ার মতো মনে হয়। ও খুব মৃদু গলায় বলল 'তুমি কষ্ট পাচ্ছো বাবা।' আবার দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ হয়, 'বরং তুমি চলে যেও।

চলে গেল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে আবার দেখা। বাপি আর রাধা আমার জন অপেক্ষা করছিল। আমরা পরস্পরকে দেখে হাসলাম। কথা বললাম না।

শুধু বাপি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হঠাৎ লাজুক মুখ করে বলল, 'যদিও এখন আমার বলতে লজ্জা করছে……কিন্তু আমি তো জানতাম না—'

'কি বাপি!' আমি শান্ত দুঃখী স্বরে বললাম।

'জানতাম না', সে মুখ লুকিয়ে বলল, 'যে, তুমি আমার দাদু হও।'

প্রিয় মধুবন

মাথা অনেক শূন্য লাগছে আজকাল। অনেক বেশী শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর। মাঝে মাঝে শুধু একটি কি দুটি শালিখ কি চড়ুইয়ের আনাগোনা। এরকম ভাল। এরকম থাকা ভাল। আমি জানি।

কালকেও আমার কাছে একখানা বেনামী চিঠি এসেছে। তাতে লেখা 'বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে!' লাল কালিতে লেখা চিঠি। নাম-সই নেই, তবু আমি হাতের লেখা চিনি। লিখেছে কুনাল মিত্র। আমার বন্ধু। এখনো বোধ হয় ফেরারী। প্রায় দশ বছর তার খোঁজ জানি না।

আমাদের ডাকঘরগুলির কাজে বড় হেলাফেলা। চিঠির ওপর ঠিকঠাক মোহরের ছাপ পড়েনি। আমি কাল সারাদিন আতস কাচ নিয়ে চেষ্টা করে দেখলাম। না, কোথা থেকে যে চিঠিটা ডাকে দেওয়া হয়েছে তা পড়াই গেল না। জানি যেখান থেকেই দেওয়া হোক ডাকে, কুনাল আর সেখানে নেই। সে সরে গেছে অন্য জায়গায়। রমতা যোগীর মতো ফিরছে কুনাল, কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাচ্ছে! তবু বড় ইচ্ছে করছিল কুনাল কোথায় আছে তা জানতে।

কাল বিকেলের দিকে আলো কমে এলে আমি আতসকাচ নামিয়ে রাখলাম। মাথা ধরে গিয়েছিল সারাদিন আতসকাচের ব্যবহারে। তাই চোখ ঢেকে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। ভুল হয়েছিল। সে তো ঠিক চোখ-ঢাকা নয়! টের পেলাম দুটি হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে গড়িয়ে নামছে চোখের জল।

বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে! এ আমারই কথা। কুনাল কেবল কথাটা ফিরিয়ে দিয়েছে। যেন ও কথার

আড়ালে উ'কি মারছে তার সকৌতুক দয়াহীন মুখ—রাস্তা তুমিই দেখিয়েছিলে, ঘর থেকে বের করে এনেছিলে তুমিই। তারপর সরে গেছে কোথায়! এখন কার এ'টো চেটে বেড়াচ্ছো মধুবন? তোমার ঘেন্না করে না?

চমৎকার এইসব শব্দভেদী বান কুনালের। মেঘের আড়াল থেকে লড়াই। প্রতিদিন পালটে যাচ্ছে তার ঠিকানা। আর আমি মধুবন—আমি বাঁধা পড়েছি স্থায়ী ঠিকানায়। কুনাল হয়ে গেছে ছায়া কিংবা মায়া। আমি এখন কোথায় পাবো তাকে? এ চিঠির তাই জবাব দেওয়ার দায় নেই।

কাল সন্ধ্যেবেলায় আমি ঘরের আলো জ্বালিনি। কুনালের চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। আমার বুকের মধ্যে টিকটিকির বাসা। ঘর ছাড়ার কথা মনে হলেই সে ডাক দেয় টিকটিক টিকটিক। যেও না। যাবো না যে তা আমি জানি। তবু চোখের জলে আমার দু হাতের আঙুল ভিজে গিয়েছিল। নিজের জন্য নয়, আমি কাল কুনালের জন্য কে'দেছিলাম। তারপর ফাঁকা একখানা ঘরের মতোই শূন্য হয়ে গেল মাথা। মাঝে মাঝে একটি দুটি শালিখ কি চড়ুইয়ের মতো ভাবনা ও স্মৃতি আনাগোনা করে গেল।

অনেকক্ষণ আমার বাইরের কোনো জ্ঞান ছিল না। তারপর আমার বউ সোনা আমাকে ডাকল 'রাজা, একটু এ ঘরে এসো।'

গিয়ে দেখি সে কাপড় পালটাচ্ছে। বলল, 'দেখ, আমি তোমাকে সারাদিন একটুও জ্বালাইনি। তবু এখন জিজ্ঞেস করছি ও চিঠিটা কার? সারাদিন তুমি ওটা নিয়ে বসে আছো।'

আমি চিঠিটা এনে তার হাতে দিলাম।

ও দেখল। তারপর অবহেলায় চিঠিটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, 'দেখ কী বিচ্ছিরি ব্লাউজ পরেছি! পিছন দিকে বোতামের ঘর। কিছুতেই আটকাতে পারছি না, তুমি একটু বোতাম এ'টে দাও না।'

তখন সোনার সাজ আমি লক্ষ করলাম। কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা একটা ব্লাউজ পরেছে সে, গলায় আর হাঁতে খুব পাতলা লেস-এর ফ্রিল দেওয়া। ব্লাউজটা আরো কয়েকদিন ওকে পরতে দেখেছি। কোনোদিনই বোতাম এ'টে দেওয়ার জন্য আমার ডাক পড়েনি। তাই মৃদু হেসে আমি ওর পিঠের দিকে বোতাম আর হুকগুলো লাগিয়ে দিলাম।

ও আস্তে করে বলল, 'ইস, কী ঠাণ্ডা হাত।'

'ঠাণ্ডা!' আমি অবাক হয়ে বললাম 'কই!' বলে হাত দুটো ওর গালে রাখলাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোনা বলল, 'না, সে ঠাণ্ডা নয়। নিস্পৃহতার কথা বলছিলাম।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সোনা ধীরে ধীরে আঁচল তুলে নিচ্ছিল শরীরে। হঠাৎ মুখ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আদর!'

তক্ষুনি কুনালের চিঠিটার কথা একদম ভুল হয়ে গেল।

সোনার ব্লাউজের বোতাম আর হুকগুলো আর একবার লাগিয়ে দিতে হল আমাকে।

তারপর সোনা টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে বলল, 'লাল কালিতে লেখা এই দেড় লাইনের চিঠিটা নিয়ে এখন আমরা কী করব? বাঁধিয়ে রাখবো?'

হেসে বললাম, 'ঠাট্টাটা আমাকেই লাগল, সোনা। চিঠির ও কথাগুলো একদিন আমিই বলতাম। বহুদিন পর অনেক খুঁজে খুঁজে আমার কাছে ফিরে এসেছে আমারই কথা।'

ও ভ্রূ কুঁচকে চিঠিটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এটা কি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য?'

'না, না,।' আমি মাথা নেড়ে হেসে উঠি, 'ওটা এমনিই, ঠাট্টার ছলেই আমার কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া।'

সামান্য দ্বিধা করে সোনা বলল, 'চিঠিটায় নাম-সই নেই। তবু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি একে জানো। কে?'

একটু ভেবে বললাম 'ও বোধ হয় আমারই এক সত্তা। অতীত থেকে লিখে পাঠাচ্ছে।'

'কবিতা!' সোনা হেসে ফেলল, 'এ তো কবিতা হয়ে গেল, রাজা!' হাসি থামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি তো তোমার কাছে শুনেছিলাম যে আমি 'তোমার এক সত্তা। তোমার এরকম আর ক'টা সত্তা আছে, রাজা?'

হিংসুক। সোনা ভীষণ হিংসুক। ঘরে ওর রাজতন্ত্র। আমি ওর রাজা। ওকে এখন কিছুতেই বোঝানো যায় না যে একদিন আমি কুনালের ছিলাম প্রিয় মধুবন।

না, কুনালের প্রিয় মধুবন হওয়ার জন্য আর একবার পিছু-হাঁটার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার। এখন আমি বেশ আছি। ফাঁকা, খোলামেলা শান্ত একটি ঘরের মতো শূন্য মাথা। মাঝে মাঝে এক আধটা শালিখ কি চড়ুইয়ের আনাগোনা। এক আধটা ভাবনা, এক আধখানা স্মৃতি। তার চেয়ে বেশী কী দরকার! এখন আমার আলো বাতাস ভাল লাগে, ছুটির দিন ভাল লাগে, অবসর আমার বড় প্রিয়। আমার প্রিয় সেলাই-কলের আওয়াজ, আমার শিশু-ছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। আর বুকের মধ্যে সেই টিকটিকির ডাক। যেও না। যেও না।

তবু মাঝে মাঝে যখন ভিড়ের মধ্যে রাস্তায় চলি তখন হঠাৎ বড় দিশেহারা লাগে। কিংবা যখন মাঝরাতে হঠাৎ কখনো ঘুম ভেঙে যায় তখন লক্ষ করে দেখি পাথর হয়ে জমে আছে আমার অনেক আক্ষেপ। আয়নায় নিজের মুখ দেখে কখনো চমকে উঠি। মনে কয়েকটা কথা বৃষ্টির ফোঁটার মতো কোন অলীক শূন্য থেকে এসে পড়ে। তুমি যে এসেছিলে কেউ তা জানলই না! হায়, মধুবন।

সত্য বটে এ সবই আবেগের কথা। নইলে আমার মনে স্পষ্ট কোনো আক্ষেপ

নেই। না আছে পিছু-হাঁটার টান। খুব একটা স্মৃতিচারণও নেই আমার। মাঝে মাঝে সোনা যখন আমাদের ছেলেটাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যায়, বা বাপের বাড়িতে থেকে আসে একটি দুটি দিন, তখন কখনো সখনো সন্ধ্যেবেলায় বা রাত্রে আমি ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। একটি দুটি কথা অন্ধকারে মশা ওড়ার শব্দের মতো অন্ধকারে গুনগুন করে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাচ্চা ছেলেটার কান্নার শব্দ মনে মনে ডেকে আনি, সোনার গলার স্বরের জন্য নিস্তব্ধতার কাছে কান পেতে রাখি। আস্তে আস্তে সব আবার ঠিক হয়ে যায়। যদি কখনো হঠাৎ মনে হয় যে এরকম শান্ত জীবন হওয়ার কথা ছিল না আমার, আরো দূরতর, ভিন্ন অনিশ্চয় এক জীবন আমার হতে পারত, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি হাতের কাছে যা পাই—হয়ত ওষুধের শিশি, ফাউন্টেনপেন কিংবা অন্য কিছু না পেলে হাতের আংটির পাথরের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মনকে একটা বিন্দুতে নিয়ে আসি। অতীত এবং ভবিষ্যৎ থেকে ফিরিয়ে নিই আমার মুখ। আস্তে আস্তে বলি, এরকমই ভাল। এরকম থাকাই আমাদের ভাল। তখন মাথা অনেক শূন্য লাগে। অনেক বেশী শূন্য। একখানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর।

অনেকদিন আগে কুনালের সঙ্গে আমার জীবন শেষ হওয়ার কিছু পরে ওই রকম লাল কালিতে লেখা বেনামী আর একখানা চিঠি এসেছিল আমার সঠিক ঠিকানায়। তাতে লেখা 'জীবনে সৎ হওয়াই সব হওয়া নয়! আদর্শই সব! আদর্শ না থাকলে পুরোপুরি সৎ হওয়াও যায় না।' প্রতিটি বাক্যের পর একটি করে বিস্ময়ের চিহ্ন। আসলে ওগুলো সকথিত জিজ্ঞাসা। ছুঁচের মুখের মতো ওই চিহ্নগুলো আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া। সেই তার প্রথম বেনামা চিঠি। তারপর আমার বিয়ের কিছু পরে আরো একখানা। এইরকম 'বৃষ্টি হলেই মিছিল ভেঙে যাবে! দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে গাছতলায়! মাথা বাঁচাতে!' কি জানি সে গাছতলায় বলতে এ ক্ষেত্রে ছাঁদনা-তলায় বুঝিয়েছিল কিনা। চিঠিটা আমি সোনাকে দেখাইনি। শুধু মনে মনে বুঝতে পেরেছিলাম, সে আমার সব খবর রাখে, হদিস রাখে সঠিক ঠিকানার। সে আমাকে ভোলেনি। সামান্য ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। কি জানি, আমি তাকে আরো তো কত কী শিখিয়েছিলাম! সে যদি সব মনে রেখে থাকে! তারপর ক্রমে বুঝতে পেরেছিলাম যে তা নয়। এ তার আমাকে নিয়ে খেলা। আসলে পুরোনো পুতুলের মতো ভেঙে সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তার জীবন থেকে। মাঝে মাঝে সে কেবল দূর থেকে আমাকে ওইভাবে স্পর্শ করে দেখতে চায় আমি কতটা চমকে উঠি।

বলতেই হয় খেলাটা চমৎকার শিখেছে কুনাল। সে খেলতে জানে। গতকাল আমি সামান্য অন্যরকম হয়ে গেলাম। আজ সকালে তাই আমার মুখের দিকে ঘুমচোখে চেয়ে সোনা প্রথম প্রশ্ন করল 'আজও তুমি ওই ভূতুড়ে চিঠিটার কথা ভাবছ!' চমকে উঠলাম। বস্তুত তা নয়। চিঠিটার কথা আমি ভাবছিলাম না, কুনালের কথাও না।

হেসে বললাম, 'দূর!'

সোনা হাসল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ করে ছেলের কাঁথা বিছানা গুছিয়ে রাখল, শারি চালি করল, তারপর এক সময়ে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'কোন ভোরে জানালার কাছে বসে আছো! এত সকালে ওঠা বুঝি তোমার অভ্যাস!'

সে কথা ঠিক। ভোরে ওঠা আমার অভ্যাস নয়। কেন যে আজ অত ভোরে ঘুম ভেঙে গেল কে জানে। তারপর আর ঘুম আসছিল না। শীতকাল, তবু লেপের ম ছেড়ে উঠে গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে এসে আমি জানালার ধারে বসলাম। খুব শা ছিল, জানালার নীচের রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল আবছায়ায় নিঃশব্দে নদী বয়ে চ্ছে। আর দূরের কলকাতা খুব উঁচু গাছের অরণ্যের মতো জমে আছে হিমে। গারেট ধরাতেই একটি দুটি পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে গুলো ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলাম। ঠেকানো গেল না। খুব ভোরে একদিন এক শ্রমের ঋত্বিককে দেখেছিলাম ডান হাতখানি ওপরে তুলে চোখ বুজে আহ্বানী উচ্চারণ তে 'তমসার পার অচ্ছেদ্যবর্ণ মহান পুরুষ, ইষ্ট প্রতীকে আবির্ভূত, যদবিদা চরণে পাসনাতেই ব্রতী হই। জাগ্রত হও, আগমন কর। আমরা যেন একেই অভিগমন রি...।' গান নয়, শুধু টেনে টেনে উচ্চারণ করে যাওয়া। কবেকার কথা। তবু গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা যেন একেই অভিগমন করি! ভোরের শান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে আমায় মনে হয়েছিল—হায় মধুবন! হায়, কুনাল!

আমি আমার আংটির মধুরঙের গোমেদ পাথরটার দিকে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আবছা অন্ধকারেও পাথরটা চিকমিক করছিল। আমি আস্তে আস্তে আংটির গোমেদ পাথরটায় আমার মনকে স্থির করার চেষ্টা করছিলাম। তখন হঠাৎ—খোলা জানালা দিয়ে যেমন ঘরের মধ্যে উড়ে আসে পোকামাকড়—তেমনি হঠাৎ অনেকদিন আগে শোনা য়েকটা শব্দ বিদ্যুৎবেগে আমার মধ্যে খেলা করে গেল। প্রথমে আমি কিছুক্ষণ বেই পেলাম না এই শব্দগুলি কী, কিংবা কোথা থেকে এল। চেনা শব্দ! বড় না! কয়েকটি মুহূর্তের পর মনে পড়ে গেল, এ আমার বীজমন্ত্র-নাম কৈশোরে থা। এতকাল আর মনেও ছিল না। মনে পড়তেই আমি আস্তে হেসে উঠলাম। বীজমন্ত্রের শব্দগুলি নিয়ে মনে মনে খেলা করতে করতে আমার সেই কৈশোরের ধ্যান ভ্যাস করার কথা মনে পড়ছিল। একটা সাদা-কালো চক্রের ছবির দিকে অনেকক্ষণ থাকতাম। তারপর চোখ বুজতেই সেই চক্রটা অমনি চলে আসত দুই ভ্রূর নে, নাসিকার মূলে, যাকে বলা হয় আজ্ঞাচক্র। অনেক শিখেছিলাম আমি। পৈতের পর আমাকে শিখতে হয়েছিল পুজো পাঠ আহ্নিক। দণ্ডী ঘরে কয়েকটা ষ্টের দিন কেটেছিল যার মধ্যে চুরি করে খেয়েছিলাম রসগোল্লা। মনে পড়ে এক শীতের খুব ভোরে দণ্ডী ভাসাতে যাচ্ছি ব্রহ্মপুত্রে, সঙ্গে জ্ঞাতিভাই তারাপ্রসাদ। প্যান্ট পরা তারাপ্রসাদ নদীর উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল। আমি তার কে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ঢাল বেয়ে জলের কাছে নেমে গেলাম। আমার ায়ে লেগে একটা মাটির ঢেলা আস্তে গড়িয়ে গিয়ে টুপ করে জলে ডুবে গেল। বিবর্ণ

মেটে রঙের জলে ভেসে যাচ্ছিল আমার গেরুয়া ঝোলা আর লাঠি। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম। মাথার ওপর ফিকে নীল আকাশ, আর চারদিকেই মাটির নরম রঙ। কোথাও এতটুকু আবেগ বা অস্থিরতা নেই। সব শান্ত ও উদাসীন, আর বাতাসে মিশে থাকা সামান্য কুয়াশায় মৃদু নীল আভা। জলে আমাকে ঘিরে ছোটো ছোটো ঢেউ ভাঙার শব্দ। খুব সামান্য স্রোতে ধীরে ধীরে দুলে দুলে ভেসে যাচ্ছে গেরুয়া ঝোলাসুদ্ধ আমার দণ্ডী। খুব দূরে তখনো নয়। বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তাকে। যেন ডুবন্ত এক সন্ন্যাসীর গায়ের কাপড় ভেসে যাচ্ছে জলে। মনে হয়েছিল আর দু এক পা দূরেই রয়েছে জন্ম-মৃত্যু ও জীবন-রহস্যের সমাধান। আর মাত্র দু-এক পা দূরে। আমার চারদিকে বিবর্ণ মাটিরঙের জলস্থল বৈরাগীর হাতের মতো ভিক্ষা চাইছে আমাকে। তার ইচ্ছে হয়েছিল আমার ওই দণ্ডী যতদূর ভেসে যায়, নদীর পার ধরে আমি ততদূর হেঁটে যাই। ফিরে গিয়ে কী লাভ? অনেকক্ষণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে জলে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে তারাপ্রসাদ আমাকে জোর করে তুলে এনেছিল। তারপরও বহুদিন আমার সেই ঘোর কাটেনি।

সেই কথা মনে পড়তেই আমি প্রাণপণে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করছিলাম আজ ভোরে। বীজমন্ত্রের যে শব্দগুলি মনে এসেছিল আমি সেগুলো নিয়ে খেলা করছিলাম। আর আমার আংটির গোমেদ পাথরটায় স্থির করার চেষ্টা করছিলাম আমার সমস্ত অনুভূতি। বহুদিন বাদে কৈশোরের সেই ধ্যান করার ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল আমাকে।

কুনাল জানে না তার চেয়ে আমি অনেক বেশী ফেরারী।

অফিসে বেরোনোর সময়ে সোনা মনে করিয়ে দিল 'আজ আমাদের বিয়ের বার্ষিকী। মনে থাকে যেন।'

মনে ছিল না। চার বছর হয়ে গেল। এখন আমার ছত্রিশ, আর সোনা বোধ হয় আঠাশ পেরিয়ে এল। ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ির তলা থেকে আমি সোনাকে একটু দেখলাম, আমার দিকেই চেয়ে আছে। হাসলাম। ও হাসল। পরস্পরকে বোঝার চেনা পুরোনো হাসি। রাস্তার রোদে পা দিতেই সরগরম কলকাতার উত্তপ্ত ভিড়ের মধ্যে মন হাল্কা হয়ে যাচ্ছিল। একটা বেনামী চিঠির জন্য কাল আমার অফিস কামাই গেছে একথা ভাবতেই খারাপ লাগছিল।

মিডলটন স্ট্রীটে আমার অফিস। দরজায় পা দিতেই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুড়ো দারোয়ান, রিসেপশন কাউণ্টারের চঞ্চল মেয়েটি মৃদু হেসে নড করল, 'মর্নিং স্যার' বলে জুনিয়ার একটি অফিসার হরেন আর একদিকে চলে গেল। আমি লিফট নিলাম না। অনেকদিন পর একটু হালকা লাগছে আজ। আমি জুতোর শব্দ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে দীর্ঘ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে এলাম আমার চারতলার অফিসে। টাইপিস্টদের ঘর থেকে অবিরাম টাইপ-মেশিনের শব্দ ভেসে আসছে। আমার ছোট অফিস-ঘরটার বাইরে অপেক্ষা করছে আমার ছোকরা চটপটে স্টেনোগ্রাফার। আমি তার দিকে চেয়ে একটু হেসে ঢুকে গেলাম ঘরে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ ছোট্ট ঘরটা আমার। সবুজ কাঁচে ঢাকা টেবিল, গভীর গদিওয়ালা চেয়ার, আর পিছনে প্রকাণ্ড

কাচের জানালা। দূরে ময়দানের চেনা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কোট খুলে হ্যাংগারে ঝুলিয়ে দিয়ে আমি কাচের শার্সি খুলে দিলাম। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে এল। পাতা-পোড়ানো ধোঁয়ায় মৃদু গন্ধ আমি আমার অন্তরে গ্রহণ করে নিচ্ছিলাম। বেশ নিশ্চিন্ত জীবন আমার। একটি দুটি ছোটোখাটো অভাববোধ এবং কখনো সখনো সামান্য একটু একঘেয়েমি ছাড়া গোলমাল নেই। আমি সুখী। একটি ছোটো শ্বাস ছেড়ে আমি চেয়ারে ফিরে এলাম।

দুপুরে হঠাৎ এল সোনার টেলিফোন। তার গলার স্বর শুনে চমকে উঠে বললাম 'কী হয়েছে!'

'কই! কিছু না!' বলে ও হাসল 'তোমাকে উল আনার কথা বলেছিলাম, রাজা! মনে আছে? মনে করিয়ে দিলাম। তোমার কোটের ডানদিকের পকেটে নমুনা দিয়ে দিয়েছি। চার আউন্স এনো।'

'দূর আমি পারবো না। আবার অফিসের পর দোকানে ছোটাছুটি! তা ছাড়া উলের রঙ মেলানো বড় ঝামেলা…'

'পারবে।' বলে হাসল, 'তুমি না পারলে চলবে কি করে? তুমি ছাড়া আমার কে আছে আর?'

মৃদু হাসলাম। আমাকে পটাতে সোনা ওস্তাদ।

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ বিকেলের কথা মনে আছে তো।' বলেই আবার হাসি 'বলো তো আজ কী?'

'আজ?' আমি একটু ভাবনার ভান করে বললাম 'আজ তো খোকনের জন্মদিন!'

'বদমাশ!'

'তাই না কি।'

'ঠিক আছে। তাই। শুধু সময়ে এসো।'

তারপর একটু চুপচাপ। টের পেলাম ও ফোন তখনো ছাড়েনি। আমিও ছাড়তে দ্বিধা করছিলাম। তখন হঠাৎ ও বলল, 'রাজা, আমার ফোন পেয়ে তুমি চমকে উঠলে কেন?'

সামান্য গোলমালে পড়ে বললাম 'কই!'

'ভয় পেয়েছিলে?'

'কিসের ভয়!'

ও হাসে 'কিসের ভয় তার আমি কি জানি! ওই ছেলে চুরি যাওয়ার ভয় হতে পারে, ঘরে আগুন লাগার ভয় হতে পারে। কতো ভয় আছে মানুষের!

'বদমাশ!' বলে আমি ফোন রেখে দিলাম।

সত্যিই যে আমি ভয় পেয়েছিলাম। সোনা যেভাবে বলল সেভাবে নয়। তবে অনেকটা ওরকমই অস্পষ্ট একটা ভয়।

বিকেলে আমি অনেক ঘুরে ঘুরে ওর ফরমাশী উল কিনলাম, আর আজকের দিন উপলক্ষে ওর জন্য কিনলাম কালো জমির ওপর হলুদ আর সুরকি রঙের এমব্রয়ডারী

করা একটা কার্ডিগান, কিছু ফুল, গোটা দুই বাংলা উপন্যাস। বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পা দিয়েছি, সে সময়ে—কোথাও কিছু ছিল না—তবু হঠাৎ মনে হল যদি এই অবস্থায় কোনোদিন কুনাল আমাকে দেখে! কে জানে বাইরের এই অচেনা লোকজনের মধ্যে সে গা-ঢাকা দিয়ে আমাকে লক্ষ করছে কিনা! সে দেখছে তার প্রিয় মধুবনকে! পরনে স্যুট মধুবনের, উলের প্যাকেট, কাগজে মোড়া বউয়ের কার্ডিগান, হাতে ফুল আর উপন্যাস। কি জানি কেমন অস্বস্তি এল মনে রজনীগন্ধার ডাঁটিতে আমি অকারণে বোকার মতো আমার মুখ আড়াল করলাম। পরমুহূর্তেই হেসে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম আমি। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে করেক পলকের জন্য আমার দুর্বলতা এসেছিল।

সন্ধ্যেবেলায় আমাদের অনুষ্ঠান জমল খুব। আমার অনেককালের বন্ধু অতীশ এসেছিল তার বউকে নিয়ে, আরো দু একজন বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন। যখন সবাই চলে যাচ্ছে তখন সিঁড়ির গোড়ায় অতীশ আমাকে আলাদা ডেকে নিল 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

আড়ালে নিয়ে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার রে? শুনলাম তোর কাছে বেনামা একটা চিঠি এসেছে?'

মাথা নাড়লাম—হাঁ। বললাম, 'কে বলল?'

'তোর বউ।' ও হাসল 'ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। বলছিল কাল থেকে তুই নাকি কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস! কেঁদেছিস!'

হাসলাম 'দূর!'

অতীশ নীচু গলায় প্রশ্ন করল 'কে লিখেছে?'

বললাম 'কুনাল। কুনাল মিত্র।'

'ওঃ!' বলে একটু ভাবল অতীশ 'বছর চারেক আগে সে আর একবার তোকে চিঠি দিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ। আমার বিয়ের ঠিক পরেই।'

'এবার কী লিখেছে সে?'

আমি বললাম, 'অনেকদিন আগে আমি তাকে শিখিয়েছিলাম: সাবধান! বিপ্লবের পথ কিন্তু কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়। বনের সন্ন্যাসীও ফিরে আসে ঘরে সেই কথাই সে ফেরত পাঠিয়েছে আমাকে।'

হাসল অতীশ 'তোকে টীজ্ করছে না?'

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ।

ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতীশ, 'ওর বেশী আর কিছুই কুনালের করার নেই।'

আমি চেয়ে রইলাম অতীশের মুখের দিকে।

অতীশ ম্লান হাসল 'মধুবন, আমি কুনালের খবর রাখি। বছরখানেক আগে তার খবর পেয়েছিলাম। হাওড়া জেলার মফস্বলে একটা কারখানায় সে চাকরি করছে।

কষ্টে আছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাকে তোর কাছে আসতে ছিলাম। তুই বড় চাকরি করিস। সে মাথা নেড়ে জানাল আসবে না। বলেছিল, খবর মধুবনকে দেবেন না। আমি কথা দিয়েছিলাম। আজ কথা ভাঙতে হল . নইলে হয়ত তোর শান্তি থাকত না।'

একটু চুপ করে থেকে অতীশ আবার বলল 'ভাবিস না মধুবন। এই সব ছোটো-টো চমক সৃষ্টি করা ছাড়া ওর জীবনে তো আর কিছু এখন করার নেই। ওরও লেপুলে নিয়ে বড় সংসার, তোর খোঁজ-খবর রাখার সময় তেমন নেই। তবু মাঝে ঝ ওই সব চিঠি পাঠায়, পাঠিয়ে মজা পায়।'

কুনালকে প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়ে অতীশ চলে গেল। আমি নিঃশব্দে ঘরে এলাম। দেখি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সোনা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ড়িয়ে আছে। আমার দিকে ফিরে এক ঝলক হেসে বলল, 'কিগো কুনাল মিত্রের বন্ধু তপূর্ব বিপ্লবী। এবার একটু হেসে কথা কও।'

হাসলাম। বুঝলাম অতীশ চিঠিটা আন্দাজ করে সোনাকে সব বলে গেছে। তবু করে আমি সোনাকে বোঝাবো যে আমি এখনো সুখী নই।

কুনাল কতদূর বিপ্লবী ছিল, সঠিক ফেরারী ছিল কি না তা নিয়ে আমার একটুও থা ব্যথা নেই। আমি স্বেচ্ছায় সরে এসেছি অনেক দূর। এখন নিশ্চিন্ত জীবন মার। তবু মাঝে মাঝে একজন ফেরারীর কথা ভাবতে আমার ভাল লাগে। রাজ-ীতির জন্য নয়, বিপ্লবের জন্যও নয়, এ সব কোনো কিছুর জন্যই এখন আর আমার কটুও ব্যস্ততা নেই। এখন আমার প্রিয়—সেলাইকলের আওয়াজ, আমার শিশু লের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। কেবল মাঝে ঝে এ সবের ফাঁকে ফাঁকে একটু বিমনা হয়ে ভাবতে ভাল লাগে আমারই এক সত্তা ালিয়ে ফিরছে মাঠে জঙ্গলে, ক্ষেতে খামারে, পাহাড়ে পর্বতে। কুনালের কথা শুনে ই আমি একটুও খুশী হইনি, অবাকও নয়। আমি তো জানতাম বিপ্লবের পথ হর্ম্যের দিকে বেঁকে যায়। বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে। আমি তো তা নতাম।

রাতে শুয়ে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সোনা বলল 'কষ্ট পাচ্ছো?'

চমকে উঠে বলি 'কই। না। কিসের কষ্ট?'

'আমি জানি। পাচ্ছো।'

'কেন?'

'কি জানি।' বলে একটু চুপ থেকে বলল, 'বোধ হয় তোমার মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী তে ইচ্ছে করে, না? এমন উদ্দেশ্যহীন নিস্তেজ জীবন তোমার ভাল লাগে না। মামি জানি।'

'দূর!' বলে জোরে হেসে উঠলাম। তবু সোনার মুখ সামান্য বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

'বড় ভয় করে গো!' ঘুমের আগে আমার আদরে তলিয়ে যেতে যেতে সোনা লল। অমনি আমার বুকের মধ্যে টিকটিক টিকটিক। যেও না। যেও না।

নিঃসাড়ে ঘুমের ভান করে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে আমি গভীর রাতে উঠে টেবিলে ছোটো বাতিটি জ্বেলে বসলাম। কুনালকে একটা চিঠি লেখা দরকার। কুনালকে নয়। এ আর এক কুনালকে, যাকে আমি চিনি না।

সারা রাত ধরে আমি লিখলাম আমার চিঠি সিগারেটের পর সিগারেট জ্বেলে। তারপর টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ভোরবেলা সো... আমাকে ডেকে তুলল। তার চোখে মুখে ভয়, ঠোঁট কাঁপছে কান্নায় 'কী করছিলে তুমি রাজা? সারারাত…সারারাত ধরে!'

আমি সুন্দর করে হাসলাম। তারপর ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম আমার চিঠিটা। প্রথমে বুঝতেই পারল না।

বললাম 'সারারাত ধরে আমি এ চিঠিটা লিখেছি সোনা! বেনামী একটা চিঠি।

'ওমা!' ও অবাক হয়ে বলল 'এ তো মাত্র একটা লাইন!'

আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ও শব্দ করে চিঠিটা পড়ল। 'ওরে কুনা... বনের সন্ন্যাসীর চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশী।'

বাঘ

এইখান দিয়ে একটু আগে একটা বাঘ হেঁটে গেছে। নরম মাটিতে এখনো টাটকা য়ের দাগ। বাতাস শুঁকলে একটু বোঁটকা গন্ধও। বাঘটা শুধু যে বেড়াতে রিয়েছিল, এমন নয়। ফেরার পথে বাজারও করে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ বুড়ো রচরণের একটা বাছুরও নিয়ে গেছে মাঠ থেকে। তাই কাদা মাটিতে বড় বড় রক্তের প পড়ে আছে। জেলির মতো জমে গেছে। হ্যাট মাথায় কয়েকজন হাফ্ প্যান্টপরা কারী ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝোপে ঝাড়ে। বীটাররা নদীর ধারের জঙ্গলের ওপাশ থেকে টিন, ঘণ্টা আর যা পেয়েছে সব বাজাতে বাজাতে আসছে। একজন পাইপ মুখে শিকারী বন্দুকটা ধাঁ করে মাঝখানটায় ভেঙে কার্তুজ পরীক্ষা করে নিল, তারপর ফড়াক রে আবার সোজা করল বন্দুক। সবাই তৈরী।

বাঘটা সেবার বেরোয়নি। কিন্তু বহুকাল আগের দেখা এই দৃশ্যটা আজও ভুলতে ারে না জোনাকিকুমার।

বাঘটা বেরোয়নি বলেই কি আজও একরকম অপেক্ষা করছে সে?

মাঝ দুপুরে আজ বৃষ্টি নামল। তারপরই হঠাৎ থেমে গেল। আবার নামল, বার থেমে গেল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে জোনাকিকুমারও এক-একবার এক-একটা বাড়ির সদরে বা লবীতে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং এইভাবে সে ময়দানের কাছে একটা আঠারোতলা অফিস বিল্ডিংয়ে পেঁছেছে সীতানাথের সঙ্গে দেখা করবে বলে। দেখা হল না। সীতানাথ তেরোতলায় বসে। শুনল সে আজ ফুটবল খেলা দেখতে গেছে। জোনাকি একটু হতাশ আর নিংসঙ্গ বোধ করে। সীতানাথকে পেলে কদমের মেস্-এ গিয়ে তাস পেটানো যেত। হল না। কিন্তু তেরোতলা থেকে একঝলক ময়দান দেখে সে বড় অবাক হয়ে গেল। এ বাড়িতে সীতানাথের অফিস সদ্য উঠে এসেছে, এই প্রথম সীতানাথের অফিসে এসেছে জোনাকি। তেরোতলা থেকে ময়দান সে আর কখনো খেনি। কি আশ্চর্য সবুজ। বিশ্বাস হয় না। কলকাতা নয়, ঠিক বিলেত বলে ন হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা পর্যন্ত চেনা বলে মনে হয় না। নীচে

চৌরঙ্গীর রাস্তা, টিকিওলা ট্রাম যাচ্ছে, ভোঁতা ডবলডেকার গাড়ি—সবইঅদ্ভুত সু
দেখায়। ছিমছাম এক ইউরোপের শহর যেন। ময়দান এত সুন্দর জানা ছিল না তো

জোনাকি আবার লিফটে নেমে এল। আগাগোড়া বাড়িটা এয়ারকণ্ডিশন
ভেজা গায়ে শীত করছিল। বেরোবার মুখে দেখল, ফের বৃষ্টি নেমেছে। নামুক
জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই। এ ব্যাপারটা সে আজকাল মাঝে মাঝে টের পায়
কোথাও যাওয়ার নেই। এত কম লোকের সঙ্গে তার চেনাশোনা।

বছর দুই আগে তার একজন সুন্দরী প্রেমিকা ছিল, তিতির। দু' বছর আগে
তিতিরের কাছে যাওয়ার ছিল। তখন ভোরে ঘুম ভাঙতেই মনে হত—তিতির
অফিস ছুটি হলেই মনে হত—তিতির। ছুটির দিন কাছে এলেই মন বলত—তিতির
তখন যাওয়ার জায়গা ছিল। দু'বছর আছে তিতিরের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে
জোনাকির জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠ বৃষ্টি পড়ছে। গাছপালা, মানুষজন, চাষ
সবই দেখতে হয় বৃষ্টিকে। শেষ বর্ষায় সে তাই বকেয়া কাজ মিটিয়ে দিচ্ছে। সবা
দাঁড়িয়ে অফিসের মুখটায়। তার মধ্যে জোনাকিও। তার কোনো জায়গার কথা
পড়ছে না, বৃষ্টির পর যেখানে গিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটানো যায়। তাই সে দাঁ
দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। বীটাররা বাজনা বাজাচ্ছে, শিকারীরা বন্দুক হাতে তৈরী
বাঘটা কি বেরোবে?

তা জীবনে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। জোনাকিরও বেরিয়েছিল। যে মফঃস্বল
শহরে সে বাঘ দেখতে শহরতলী ছাড়িয়ে নদীর ধারের গাঁয়ে গিয়েছিল, সেই শহরের একটা
ইস্কুল থেকে সে স্কুল ফাইন্যালে দশম স্থান অধিকার করে। পড়াশুনোয় অব
বরাবরই ভাল ছিল সে ফার্স্ট হত ক্লাশে। পরীক্ষাও ভালই দিয়েছিল। কিন্তু ত
বলে দশম? নিজেই সে বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ঘটনার পর সবা
জোনাকির দিকে তাকাল ভাল করে। দারুণ জিনিস আছে তো ছেলেটার মধ্যে।

আর সেইটেই হল জোনাকির অস্বস্তির কারণ। তার ভিতরে যে তেমন কিছু
নেই এটা সে হাড়ে হাড়ে টের পেত। মুশকিল হল, একবার দশম হয়ে গেলে পরে আর
রেজাল্ট খারাপ করা যায় না, লোকে হাসবে। তাই জোনাকি খুব খেটে আই এস-সি
দিল। ফার্স্ট ডিভিশনটাও হল না। তারপর থেকে সে হাঁফ ছেড়ে সাদামাটা হয়ে
গেল। বি এস-সি-তে পিওর ম্যাথেমেটিক্সে সেকেণ্ড ক্লাশ অনার্স পেল, এম এস-সি
পড়ল না। চাকরি পেয়ে করতে লাগল।

সেই টেনথ্ হওয়ার কথা ভাবলে আজকাল ভারী লজ্জা করে। কেন যে সে
টেনথ্ হতে গেল। ওই একবার টেনথ্ হওয়ার ফলে সবাই পরবর্তী জোনাকিকে দেখে
দুঃখ করে। বলে—তোমার ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার হওয়ার কথা ছিল হে জোনাকি
এ তুমি কি হলে? এরকম দুঃখ মাঝে মাঝে জোনাকিরও হয়।

কেউ কেউ বলে সায়েন্স না পড়ে আর্টস পড়লেই জোনাকি ভাল করত। কিন্তু তা জোনাকির মনে হয় না। সে তো সেই আই এস-সি পড়ার সময় থেকেই বিস্তর খোঁজ-খবর রাখত। ই ইজ্ ইকুয়াল টু এস সি স্কোয়ার, আইন-স্টাইনের সেই বিখ্যাত কুয়েশন পর্যন্ত জানা ছিল তার। এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু মাস টাইমস্ দি স্পীড অফ্ লাইট স্কোয়ারড। কজন জানত তা? বি এস-সি বই থেকে সে অঙ্ক কষত ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশে। তবু পারা গেল না। আসলে বোধহয় জীবনে ওই একটাই ভুল করেছিল সে, স্কুল ফাইন্যালে দশম হয়ে। সেটা না হলে আজ কারো দুঃখ থাকত না। তার নিজেরও না।

যে চোখ বাঁধা ম্যাজিসিয়ান এতক্ষণ এলোপাথাড়ি তীর ছুঁড়ছিল মাটিতে, সে এবার তার খেলা থামিয়েছে। বৃষ্টি ধরল। না ধরলেও ক্ষতি ছিল না। জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই।

বেরোবার মুখে একজন বয়স্ক লোক পাশাপাশি হেঁটে আসছিল। বলল—এরকম বৃষ্টির কোনো মানে হয়? বলুন তো?

জোনাকির মনে হয় মুখটা চেনা চেনা। সে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকটা তার দিকে চেয়ে একটা চেনা-হাসি দিয়ে বলে—সীতানাথকে খুঁজতে এসেছিলেন? ওর ভীষণ ফুটবলের নেশা।

জোনাকি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে বলে—আপনি কি ওর অফিসে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছেন আমাকে, মনে নেই বোধহয়। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি, সীতানাথের কাছে মাঝে মাঝে পুরোনো অফিসে আসতেন। তখন থেকেই চিনি। আপনি তো জোনাকি সেনগুপ্ত, স্কুল ফাইন্যালে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জোনাকি তাড়াতাড়ি বলে লোকটাকে কথাটা শেষ করতে দেয় না।

—সীতানাথকে তো পেলেন না, এখন কোনদিকে যাবেন?

—ভাবছি। বলে জোনাকি।

—ভাবাভাবির আর কি? চলুন আমার বাসায় চলুন।

জোনাকি অবাক, বলে—আপনার বাসায়?

লোকটা অমায়িক হেসে বলে—বেশী দূর নয়। বেকবাগান। আমার ছেলেমেয়েরা কখনো স্ট্যান্ড করা ছাত্র দেখেনি। আপনাকে দেখলে খুব ইম্পেটাস পাবে। চলুন না সবাই খুব খুশী হবো আমরা।

হঠাৎ জোনাকি রাজি হয়ে গেল, বলল—চলুন।

দুই

তিতিরের মাথায় নানা রকম রান্নার পোকা ঘুরে বেড়ায়। যেমন, আজ সন্ধ্যেবেলা তিতির একটা অদ্ভুত রান্না করল, ডিমের সঙ্গে বেগুন দিয়ে ওমলেট। তার নাম দিল—ডিমবেগ। পাতলা করে কাটা বেগুনের চাক ফেটানো ডিমে ভিজিয়ে ডোবা তেলে ভাজা। মন্দ নয় খেতে, একটা চেখে দেখল তিতির। তেলটা বড্ড বেশী লাগে।

ভেবে একটু ভ্রূ কোঁচকায় তিতির। বেশী তেলের ব্যাপারটা তাকে খোঁচা দেয়। বাস্তবিক, এই তেল টেল নিয়ে ভাবতে তার একদম ভাল লাগে না। ভাবার অবশ্য দরকারও নেই। তার সংসারে অভাবের ছিটেফোঁটাও নেই, বরং সবই অঢেল আছে। আসছেও। কিন্তু তবু বেশী তেল লাগার ব্যাপারটা তাকে তার বাপের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানে এখনো তার আত্মীয়রা তেল, চাল ইত্যাদির ব্যাপারে বড় সতর্ক। সেই মানসিকতা আজও একটু রয়ে গেছে তিতিরের।

ফেটানো ডিম আর বেগুনের চাক সরিয়ে রেখে রান্না করার লোক চিত্তর দিকে তিতির তাকাল। সে রান্না করছে বলে চিত্ত এতক্ষণ সরে দাঁড়িয়ে অন্য কাজ সেরে নিচ্ছিল।

তিতির বলল—খাওয়ার সময়ে ওগুলো ভেজে দিও।

চিত্ত ঘাড় নাড়ে। তিতির চলে আসে।

কি বিশাল এই ফ্লাটবাড়িটা! হাঁটলে যেন জায়গা ফুরোয় না। এক লাখের কাছাকাছি দাম পড়ল ফ্ল্যাটটার। তার ওপরে মেইনটেনেন্স চার্জও অনেক পড়ে যায় প্রতি মাসে। এসব নিয়ে ভাবার কিছু নেই। তবু হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়—কতগুলো টাকা!

এ-দেয়াল ও-দেয়াল জুড়ে জানালা। খুলে দিলে ঘরটা বারান্দা হয়ে যায়। সাত তলার ওপর থেকে নীচের দিকে তাকায় তিতির। এত ওপরে থেকে অভ্যাস নেই তো। মাথা ঘোরে। জানালাগুলোয় কেন যে ছাই গ্রীল দেয়নি ওরা! অমিতও অবশ্য গ্রীল লাগাতে রাজী নয়, বলে—গ্রীল দিয়ে খাঁচার মতো হয়ে যাবে। কিন্তু তিতিরের ভয় করে। আকাশটা যেন হাত বাড়িয়ে রয়েছে। একতলা পর্যন্ত বিশাল শূন্যের ব্যবধান যেন ক্রমাগত জানালা দিয়ে তাকে ডাকে—এসো, লাফিয়ে পড়ো।

তিতির সরে আসে। লাফিয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। তার জীবনে কি কোনো দুঃখ আছে?

অমিত দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফেরার সময়ে একটা মস্ত টেলিভিশান সেট নিয়ে এসেছে। সামনের ঘরে সেটা রাখা, ওপরে পুতুল, ফুলদানী। এখনো অবশ্য টেলিভিশনের পর্দা অন্ধকার। কলকাতায় টি ভি চালু হলে তারা দেখবে, সেই আশায় আগে থেকে এনে রেখেছে অমিত। বিদেশ থেকে আনা কত কি তাদের ঘরে!

তিতিরের মুখখানা ছিল সুন্দর। বয়সকালে শরীরটাও দেখনসই হয়েছিল। তার জোরেই না এমন অসম্ভব ভাল পাত্র জুটে গেল তার! তিতির আয়না দেখল না, কিন্তু টি-ভি সেটের সামনে একটা গদীর হেলানো চেয়ারে বসে নিজের মুখখানার কথা, সৌন্দর্যের কথা ভাবতে লাগল।

দু বছর হয়ে গেল, অমিত এখনো ছেলেপুলে চাইছে না। সেটা অবশ্য ভীষণ ভাল। তিতিরও চায় না। কিন্তু পুরুষ মানুষের ছেলেপুলের ঝোঁক থাকেই। কবে বলবে—তিতির, এবার ছেলে দাও।

যতদিন তা না চায় অমিত, ততদিন তিতির বেশ আছে।

না, খুব ভাল অবশ্য নেইও তিতির। ঐ যে শিকহীন গ্রীলহীন মস্ত জানালাগুলি, ওগুলোকেই ভীষণ ভয় তার। দিনের বেলায় রোদভরা আকাশ, রাতে আকাশভরা জ্যোৎস্না বা অন্ধকার নক্ষত্ররাশি হাওয়া সব কেমন হু-হু করে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে! ঘরটা যেন বাহির হয়ে যায়। একা থাকে তিতির। ওপরের ফ্ল্যাটে বা পাশের ফ্ল্যাটে কোনো শব্দই হয় না, কারো গলার স্বর কানে আসে না, নীচের রাস্তাটাও নির্জন—সেখান থেকে এত ওপরে কোনো, শব্দ উঠে আসে না। আর এই গভীর নিস্তব্ধতায় ঐ খোলা জানালা দিয়ে হাতির মতো ঢুকে আসে বাইরেটা। ভীষণ হু-হু করে ঘরদোর। হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে সব উল্টেপাল্টে দেখে, এঘর ওঘর খুঁজে বেড়ায়, বলে—খুব সুখী তুমি তিতির।

সুখীই তিতির। শুধু ঐ খোলা জানলাগুলোই তাকে দুঃখ দেয়। আগে ছেলেপুলে হোক, তখন অমিতকে বলবে গ্রীল দিতে। ছোটো খোকা হামাগুড়ি দেবে, হাঁটতে শিখবে, ডিং মেরে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দেবে—মাগো তখন যদি পড়ে যায়? খোকার জন্য তখন ঠিকই গ্রীল দিতে রাজী হবে অমিত। কিন্তু এসব বাড়িতে গ্রীল দেওয়ার নিয়ম আছে কিনা কে জানে! হয়তো কোম্পানী থেকে বলে দেবে যে, গ্রীল-গ্রিল চলবে না, তাতে বাড়ির সৌন্দর্য থাকে না। কিন্তু জানালায় গ্রীল হলে তিতিরের সুখের আর কিছু বাকি থাকে না। তখন ঐ বাইরের হাতিটা চিড়িয়াখানার হাতির মতো জানালার ওপাশে আটকে থেকে শুঁড় দুলিয়ে বলবে—খুব সুখী তুমি তিতির।

তিতির উত্তর দেবে—হ্যাঁ হাতিভাই, আমি খুব সুখী। তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যেও।

বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসে না। না আসাই স্বাভাবিক। ওরা আসতে ভয় পায়। সংকোচ বোধ করে। বড্ড বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে যে তিতিরের। সবসুদ্ধ তিন বোন তারা। তিতির ছোটো। বড় দুই দিদিরও ভালই বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তারা এখন সূর্যের পাশে মাটির পিদিম হয়ে গেছে।

এসব ভাবতে বুকে একটু দুঃখ আর একটু সুখ, দুটি ঢেউ ভাঙে।

টং করে কলিং বেল-এ পিয়ানোর একটা রীডের শব্দ ওঠে। রোজ একরকম শব্দ। দরজায় একটা কাচের চোখুপী আছে। সেইটি দিয়ে দরজা খোলার আগে দেখে নেয়

তিতির। হ্যাঁ, অমিত।

অমিত ঘরে আসে। আগে আগে দরজার কাছেই সর্বাঙ্গ দিয়ে চেপে ধরত তিতিরকে, মুখের সর্বত্র চুমু খেয়ে নিত। আজকাল খায় না। অত কি? রোজ তো খাচ্ছেই অন্য সময়ে।

অমিত ঘরে ঢুকে বলে—আজও?

তিতির চমকে বলে—কি?

—তুমি ম্লানমুখী।

তিতির লজ্জা পেয়ে বলে—না। জানো, আমি না ঐ জানালাগুলোর কথা ভাবছিলাম। বড্ড ভীষণ ফাঁকা।

—ওঃ! আমি ভাবি, বুঝি তিতির তার কোন পুরোনো প্রেমিকের কথা ভাবছে।

তিতির রাগ করে বলে—ভাবছি তো! সে এসে ঐ জানালা দিয়ে ডাকে। একদিন ঠিক ঝাঁপ দেবো।

অমিত একটু বেঁটে, কালো, একটু মোটাও! ইদানীং মেদ কমানোর জন্য একটা স্লিমিং কোর্স নিচ্ছে। অফিসের পর সেখানে যায়। আলু, মিষ্টি খায় না। কত খাবার বানায় তিতির। ও খায় না। কেবল একটু-আধটু ড্রিংক করে। ওর বোহিসেবী হলে চলে না। কত কাজ ওর!

—আজ একটা নতুন খাবার করলাম মাথা খাটিয়ে।

—কি?

—ডিমবেগ। খেতে বসে দেখবে, আগে বলল না কি দিয়ে তৈরী হয়েছে।

অমিত হেসে বলে তোমার সেই নিরামিষ ডিমের কারি'টা যেন কি দিয়ে করেছিলে?

—কেন, খারাপ হয়েছিল? ডিমের বাইরের সাদাটা করেছিলাম ছানা দিয়ে, আর ডালসেদ্ধ দিয়ে কুসুম।

—বেশ হয়েছিল। তবে কিনা ওসব বেশী খেলে আমার আবার না ফ্যাট বাড়ে।

—তা বলে না খেয়ে শরীর দুর্বল করে ফেলবে নাকি? ওসব চলবে না। ঘরভর্তি এত খাবার, খায় কে বলো তো?

তিন

ভদ্রলোকের নাম শচীন দাশগুপ্ত। ছেলেমেয়েদের সামনে জোনাকিকে দাঁড় করিয়ে তিনি বললেন—এই ইনি স্কুল ফাইন্যালে—

জোনাকি লজ্জা পায় আজও। বাঘটা একবার বেরিয়েছিল, তারপর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জোনাকিকে শচীনবাবু তাঁর ঘরের সবচেয়ে ভাল চেয়ারে বসালেন, এমন ভাবে বসালেন যাতে মুখে ভালভাবে আলো পড়ে। তাঁর চার পাঁচজন ধেড়ে ধেড়ে ছেলেমেয়ে হাঁ করে দেখছিল, গিন্নীও এলেন। এক বুড়ো আত্মীয় কেউ এসেছেন, তিনিও বাক্যহারা। স্ট্যাণ্ড করা ছেলে। ইয়ার্কি নয়।

কেবল জোনাকিই জানে—এটা কত বড় ইয়ার্কি। তবু খারাপ লাগে না। শচীন-

বাবুর বড় মেয়েটি যুবতী। সে বেশ চেয়ে থাকতে জানে। জোনাকির খারাপ লাগছিল না।

বুড়ো আত্মীয়টি জিজ্ঞেস করেন—কি করেন?

—চাকরি।

—আহা, চাকরি করেন কেন? ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেরা এডুকেশন লাইনে থাকলে ছাত্ররা কত কি শিখতে পারে! বড় চাকরির লোভে কত ভাল ছেলে নিজেকে নষ্ট করে, দেশও বঞ্চিত হয়।

—আমি বড় চাকরি করি না। সামান্য কেরানী।

—সে কি? বলে শচীনবাবুর আত্মীয় চেয়ে থাকেন।

শচীনবাবু একটু মলম লাগানোর চেষ্টা করে বলেন—তাতে কি! উনি যে টেনথ্ হয়েছিলেন সেটা কি তা বলে মুছে গেছে? বোর্ডের খাতায় তো আর নামটা মুছে ফেলেনি। যাকে বলে দশজনের একজন।

—তা বটে। বলে আত্মীয়টি নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন বোধহয়।

জোনাকির লজ্জা করছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারল, শচীনবাবুর মেজো ছেলে তার মায়ের কাছে পয়সা নিয়ে দোকানে গেল খাবার আনতে। শচীনবাবুর বড় মেয়ে জোনাকিকে একটুও অপছন্দ করছে না। কেবল আত্মীয়টি উঠে বললেন—চলি। রাত হল। কেউ তাকে থাকতে বলল না।

কথাবার্তা তেমন কিছু হল না। কি করে হবে, এদের সঙ্গে যে মোটেই পরিচয় নেই। তাছাড়া টেনথ্ হওয়া ছেলে। মুখ ফসকে বেশী কথা বলা ভালও দেখাবে না। মিষ্টি খেয়ে উঠে পড়ল জোনাকি।

শচীনবাবু আর তাঁর স্ত্রী বললেন—আবার আসবেন। খুব ভাল লাগল।

শচীনবাবুর বড় মেয়ে নিমি আলাদা করে বলল—আসবেন কিন্তু। আগে খবর দেবেন, আমার বন্ধুরাও আসবে দেখতে।

জোনাকির বড় লজ্জা করছিল। বাঘটা মোটে একবার—

বেরিয়ে এসে জোনাকি দেখল, এখনো মোটেই রাত হয়নি। বাড়ি গিয়ে কিছু করার নেই। বাবা সাত সকালে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মা বড় মেয়ের বাচ্চার জন্য কাঁথা সেলাই করছে। সাঁঝ-ঘুমোনী ছোটো বোনটা বিবিধ-ভারতী চালিয়ে শুয়ে আছে। বড্ড ছোটো বাসা।

ওই বাসায় তিতিরকে মানাতো না। তার চেয়ে বরং শচীনবাবুর বড় মেয়েকে বেশ মানায়। ভাবতেই হঠাৎ চমকে ওঠে জোনাকি। তাই তো! শচীনবাবুরা দাশগুপ্ত না? পাল্টি ঘর। তবে কি শচীনবাবু ভেবে চিন্তে প্ল্যান মাফিক জোনাকিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে? আশ্চর্য নয়। হয়তো অফিসের গেট্-এ তাকে দেখেই শচীনবাবুর মাথায় কল্পনাটা খেলে থাকবে। কেরানী হোক আর যা-ই হোক, এক সময়ের টেনথ্ হওয়া ছেলে তো?

ভাবতেও জোনাকির লজ্জা করছিল। এ হয় না। ঐ টেনথ্ হওয়ার জন্যই এক

সময়ে তিতিরও তাকে পছন্দ করেছিল। পরে, ভুল বুঝতে পারে। বাঘটা একবারই—

খুব একটা সুন্দর রাস্তা দিয়ে এখন হাঁটছে জোনাকি। এসব রাস্তায় তো বড় একটা আসা হয় না। চারদিকে বিশাল বিশাল নির্জন সব অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠেছে, আরো কিছু বাড়ির কংকাল দাঁড়িয়ে আছে। হুশ করে একটা দুটো মোটরগাড়ি চলে যায়। আর কোনো শব্দ নেই। কারা থাকে এখানে? শিকারী, না বাঘ?

বৃষ্টি এল। উপায় কি, জোনাকি দৌড়ে গিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় উঠে পড়ল। আসলে দরজাও ঠিক নয়, মস্ত, গ্যারেজঘরের ফাঁকা জায়গা। দারোয়ান বসে বৃষ্টি দেখছে আর খৈনির থুথু ফেলছে। তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। জোনাকি দাঁড়িয়ে অন্ধকারে অজস্র ঝিকিয়ে ওঠা অশ্বের মতো বৃষ্টির ধার দেখে। কিছু করার নেই। তবে অপেক্ষা করতে তার মন্দ লাগে না। কোথাও তো যাওয়ার নেই। সেই দু' বছর আগে, যখন তিতির ছিল, তখন যাওয়ার জায়গা ছিল। তিতিরই তো একটা জায়গা। কত সুন্দর সব দৃশ্য ছিল তিতিরের নানা ভঙ্গীর মধ্যে লুকিয়ে।

সেই ভীতু বাঘটা কেন কোনোদিনই বেরিয়ে এল না? কেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে? ঐ ভাবেই লুকিয়ে থেকে সে কি মরে গিয়েছিল একদিন? কেন গর্জন করে বেরিয়ে আসেনি? সত্য বটে শিকারীরা ছিল, তাদের হাতে ছিল কার্তুজ ভরা রাইফেল। কিন্তু এও তো সত্য যে ছিল অবারিত মাঠ, বিশাল পৃথিবীর মুক্তিও। সে উত্তাল গতিতে বেরিয়ে ছুটে চলে যেতে পারত সেই মুক্তির দিকে। শিকারীর গুলি কি সব বাঘের গায়ে লাগে? লাগলেই বা কি, তবু তো বুঝতে পারত, তার মৃত্যুও কারো কারো প্রয়োজন! তাই অত শিকারীর আনাগোনা, অত সতর্ক দৃষ্টি, অত ক্যানেস্তারা পেটানো? কত গুরুত্ব তার!

একটা গাড়ি কেমন চমৎকার সবুজ। কি বিশাল তার চ্যাপ্টা আর সবুজ দেহখানি। গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকল। একজন লোক নেমে চলে গেল লিফ্টের দিকে। ফিরেও তাকাল না। হতে পারত জোনাকিও ওরকম। যদি কেবলমাত্র দশম হওয়াটুকু বজায় রাখতে পারত সে। পারেনি। কেন পারেনি, তা আর একবার ভাববার চেষ্টা করল সে। ভেবে দেখল, পারেনি বলেই পারেনি। বড্ড বেশী সচেতন হয়ে গিয়েছিল নিজের সম্পর্কে। মফঃস্বলের স্কুলে এক গরিবের ছেলের অতটা হওয়ার কথা নয় তো! বড্ড বেশী পড়ত, তাতেই মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল বোধহয়। কিংবা কি যে হয়েছিল এতদিনে তা আর মনে পড়ে না।

যদি হত তবে জোনাকিকুমার আজ এরকম একটা মস্ত ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে পারত, গাড়ি চালাত। তার বউ হত তিতির বা ওরকমই কেউ। খুব সুন্দর। এই বৃষ্টি

বাদলার পৃথিবীতে কেবলই পথ ছেড়ে উঠে এসে পরের দরজায় দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে বৃষ্টি দেখতে হত না। বেশ সুখেই থাকত এক সফল জোনাকিকুমার। নিমির মতো হাবরে মেয়েরা তাদের তুচ্ছ ঘর সংসারে তাকে ডাক দেওয়ার সাহসই পেত না।

এত বৃষ্টি! ঝড়ের হাওয়ায় সমুদ্র থেকে উড়ে আসে মেঘ। পরতে পরতে আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। রাস্তায় প্রতিহত জলকণা উঠে চারদিক ঝাপসা করে দেয়। চেনা পথ ধুয়ে যায় বৃষ্টিতে, ঘরে ফেরার দিক-চিহ্ন উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝড়। আজও মনে হয়, এই দুর্যোগেও কোথাও যাওয়ার নেই জোনাকির। এই তো বেশ দাঁড়িয়ে আছে। কেটে যাচ্ছে আবার খানিকটা সময়। জোনাকির সময়ের অভাব নেই। সে যদি সফল জোনাকি হত তো থাকত। কত ব্যস্ততা কত টেলিফোন, কত নানা-জনের ডাক। সে সব নেই জোনাকির। মস্ত বাড়ির তলায় নীচু গ্যারেজ ঘরে এই কেমন ছোট্টটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি পড়ছে। অনেকগুলো গাড়ি চলে এল গ্যারেজ ঘরে। কত গাড়ি! দারোয়ান উঠে আলো নেভাচ্ছে। এর পর দরজা বন্ধ করবে। তার আগে হয়তো বা চলে যেতে বলবে জোনাকিকে। সে বড় অপমান। এ বাড়ীতে তার ঘর নেই ঠিকই, কিন্তু তা বলে কোনো জায়গা থেকে কেউ চলে যেতে বললে আজও অপমান বোধ করে সে।

জোনাকি তাই বৃষ্টিতেই নেমে এল। কি প্রবল ধারা! গায়ে ছ্যাঁক করে শীতের ছোঁয়া লাগল প্রথমে। তার ফাঁকা মাথায় বৃষ্টির ফোঁটা ডুগডুগ করে বেজে উঠল। লক্ষ আঙুল দিয়ে বৃষ্টি তাকে চিহ্নিত করে বলতে থাকে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

কোথাও যাওয়ার নেই। তবু যাওয়া থেকেই যায় মানুষের। কেন যে যায়! থেমে পড়লেই তো হয় মাঝপথে! কেন কেবল যেতেই হবে?

রাস্তায় লোকজন নেই। একা জোনাকি হেঁটে চলেছে। চোখ অন্ধ ও শ্রবণ বধির করে দিয়ে অনন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে যেতে থাকে। পোশাক চুপসে যায়। কাঁপুনি উঠে আসে শরীরে। ভিজে ভিজে হাঁটে জোনাকি। চারদিকে মেঘ ডাকছে। একটা বজ্রপাতের শব্দ হয়। জোনাকি একবার বলে—জানো না তো, তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার মধ্যে কিরকম আনন্দ আছে!

কাকে বলে কে জানে!

চার

—ওগো শোনো, কী ভীষণ ঝড় উঠল! তিতির ভয়ের গলায় বলে।

তাকে বুকে টেনে নিয়ে অমিত বলে—ঝড়! তাতে কি? এ বাড়িতে কোনো ভয় নেই তো তিতির!

—বড্ড হাওয়ার শব্দ হচ্ছে যে!

—এত ওপরে একটা বেশী হওয়া তো লাগবেই। কিছু ভয় নেই। আমার তো ইচ্ছে করে এই ঝড়ের মধ্যে বৃষ্টি মাথায় করে বেড়িয়ে পড়ি। খোলা হাওয়া বৃষ্টির জল আমাকে ধুয়ে মুছে দিক।

—আহা।

—সত্যিই। খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি তো যেতে দেবে না।

—দেবো না-ই তো!

—জানি। বড্ড রুটিন হয়ে গেছে জীবনটা।

—রুটিন না হলে চলে? তোমার কত কাজ! তিতির ওকে একটু আদর করে বলে।

একটু ড্রিংক করেছিল অমিত। বেশীক্ষণ জেগে থাকতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তিতিরের আর ঘুম আসে না। সে উঠে এয়ারকুলার বন্ধ করে দিল। ঠাণ্ডা লাগছে।

একটা ধূসর পর্দায় জানালাগুলো ঢাকা। পর্দা নড়ছে না। কিন্তু বাইরে হুংকার দিয়ে ফিরছে ঝোড়ো বাতাস। কাচের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা এসে অবিরল টোকা দেয় গোপন প্রেমিকের মতো। তিতিরকে ডাকে।

উঠতেই হয় তিতিরকে। একটা বাজ পড়ল কোথায়। বাড়িটা তার অজস্র কাচের শার্সি নিয়ে ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। ঘুম আসবে না। এরকম ঝড়বৃষ্টির রাতেই ভাল ঘুম আসে লোকের কিন্তু তার আসবে না।

তিতির পর্দাটা সরিয়ে দেখে, কলকল করে জলস্রোত নেমে যাচ্ছে শার্সি বেয়ে। নীচে একটা ডাইনীর শহর—যত না তার আলো তত বেশী ভূতুড়ে অন্ধকার। বাড়িঘর সব যেন নুয়ে গেছে, গাছপালা হয়ে গেছে কাল্পনিক গাছের ছবির মতো, আলোগুলো বৃষ্টিতে দিপ্ দিপ্ করে। এত উঁচু থেকে সবই মনে হয় বড্ড দূরের। মাঝখানে শূন্য। আর এই গভীর রাতে শার্সি ভেদ করে সেই শূন্যটা ঘরের মধ্যে চলে আসতে থাকে।

বাতি জেলে অন্ধকার টি ভি সেটটার মুখোমুখি বসে এসে তিতির। হাই তোলে। অমিতের জন্য একটা সোয়েটার বুনছিল, সেইটে নিয়ে বসে।

হাতিটা ভেজা গায়ে সামনে দাঁড়ানো, বলে—খুব সুখে আছো তুমি তিতির।

—হ্যাঁ হাতিভাই। কেবল ঐ জানালার গরাদ লাগানো বাকি। সেটা হয়ে গেলে আর কি চাই!

—সেটা লাগাতে খুব বেশী দেরি কোরো না তিতির। কি জানি কবে তোমাকে আমি চুরি করে নিয়ে যাই জানালা দিয়ে!

—ও কথা বোলো না হাতিভাই। আমি তো কোনো পাপ করিনি যে মরব। বরং এত সুখে থেকেও আমি কখনো আর দশজনের কথা ভুলি না। গত রবিবারে আমরা

আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিয়ে এলাম। শিরাতে ছুঁচ ফুটিয়ে কত রক্ত বের করে নিল বলো তো! অনাথ আতুরদের জন্য যে ফাণ্ড খোলা হয়েছে, তাতে আমরা প্রতি মাসে অনেক টাকা দিই, মাঝে মাঝে কালেকশনে বেরোই। মূক-বধিরদের জন্য, অন্ধদের জন্য আমরা সব সময়েই ব্যথিত। যা পারি যতখানি পারি করি। সুখী বলেই স্বার্থপর ভেবো না আমাদের।

হাই উঠছে। ঘুমে ঢুলে আসছে চোখ। তবু ঘুমোতে গেলেই কি একটা হয়; এই ঝড় জলের রাতটা তার দুর্যোগ নিয়ে কেবলই ঢুকে আসে ফ্ল্যাটে। কেন যে এত বড় বড় জানালা করেছে এ বাড়িতে! কোনো মানে হয় না। আকাশ ঢুকে পড়ে, বাতাস ঢুকে পড়ে। শূন্যতাও বেড়াতে আসে নির্লজ্জ প্রতিবেশীর মতো, এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিতিরের সুখ-দুঃখের খতিয়ান নিয়ে যায়। বিশ্রী। অমিত কিছুতেই তিতিরের একটা কথা শুনতে চায় না। ও কি বোঝে না যে জানলায় একটা প্রতিরোধ দরকার। ভীষণ দরকার!

টি-ভির পর্দাটা ঢালু, তার আলোহীন কাচে কোনো ছবি দেখা যায় না। কবে যে কলকাতায় টি-ভি চালু হবে! শোনা যাচ্ছে, ওয়ার্লড টেবিল টেনিস দেখাবে এবার তাহলে কিছুদিনের জন্য বাঁচা যায়। স্নেহভরে একবার চমৎকার সেটটার দিকে চেয়ে থাকে তিতির।

হাতিটা এখনো যায়নি বুঝি! তিতিরকে ডেকে বলল—বলো তো সুখ কাকে বলে।

—সুখ! বলে তিতির ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। বলে—কি জানি বাবা! তোমার সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন। তবে মনে হয়, যার কখনো পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে না, যে কখনো অতীত নিয়ে ভাবে না, অনুতপ্ত বা দুঃখিত হয় না, যে কেবল প্রতিটি বয়ে যাওয়া মুহূর্তকে অনুভব করে—সেই সুখী।

উঠে ফের বাতি নিভিয়ে দেয় তিতির। বাইরে যে আজ কি প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে! মাগো, গরিব-দুঃখীদের বড় কষ্ট।

—তোমার কিছু মনে পড়ে না তিতির?

হাতীটা তবে এখনো যায়নি। তিতির ভ্রূ কুঁচকে বলে—ওঃ! হ্যাঁ, চেষ্টা করলে বেছা সব মনে পড়ে। মনে পড়লে ভীষণ হাসি পায়।

—কি রকম?

—এই ধরো না, আমি একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করতাম। সে স্কুল ফাইন্যালে থার্ড হয়েছিল। তারপর আর কিছু হয়নি। মনে পড়ে খুব একটা প্রেম হয়েছিল। রী মজার নাম ছিল তার। জোনাকি।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শোওয়ার ঘরের দিকে চলেছে তিতির। আর একা একা ব হাসছে। এত হাসি পায়। জোনাকি! কি নাম বাবা!

শোওয়ার ঘরে এসে একটু চমকে যায় তিতির। পর্দাটা সরানো। মস্ত জানালা ' অমন আদুড় করে দিল? বাইরে একটা ধূসর পাগলা ঝড়। মুহুর্মুহু কাচের

শার্সিতে করাঘাত করছে এসে এক মহাশূন্য। বাতাস, আকাশ। শার্সি জুড়ে এক বিশাল পর্দার টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে এক মহাজগতের মহাপ্রলয়।

শিউরে ওঠে তিতির! ও মা। জানালার একটা ধারের ছোট্ট একটা পাল্লা কে কখন খুলে দিল! বৃষ্টির প্রবল ছাট আসছে, বাতাস ঘুড়ির মতো পর্দাটাকে ওড়াচ্ছে কোণের দিকটায়! তিতির জানালার কাছে দৌড়ে গেল। কিন্তু পাল্লার কাছে পৌঁছোতে পারল না। সেই আদিম পাগল ঝড়টা তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল—সরে যাও, সরে যাও, আমি তোমার ঘর তল্লাসী করতে এসেছি।

তিতির ভয় পেয়ে সরে আসে।

বিছানায় একটা হাল্কা চাদর গায়ে চাপা দিয়ে শুতে গিয়েই ফের ভীষণ চমকে ওঠে। অমিত কোথায় গেল?

—ওগো! বলে ভয়ার্ত তিতির উঠে বসে। কোনো উত্তর আসে না।

বাইরে হো-হো করে হেসে ওঠে বাতাস। আকাশ বাঘের মতো ডেকে ওঠে শিকার খুঁজে পেয়ে।

—কোথায় গেলে তুমি?

অন্ধের মতো তিতির উঠে অন্ধকার ঘরে ঘুরতে থাকে। ঘরের এক ধারটা ভিজে যাচ্ছে বৃষ্টিতে, বাতাসে। ঐ রন্ধ্রপথে বার বার বাহির চলে আসে ঘরের মধ্যে। ঘরটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাইরে। আবু নষ্ট করে। অমিতকেও কি নিয়ে গেল?

ফুঁকিয়ে কেঁদে ওঠে তিতির। ও একটু আগেই বলছিল, ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ওর চলে যেতে ভাল লাগে। তিতির ভীষণ চিৎকার করে বলে—এত তাড়াতাড়ি আমার সব কেড়ে নিও না। ওগো, কে তুমি বার বার আসো ঘরের মধ্যে? দয়া করো।

মস্ত ঘরের এক কোণে একটু ছোট্ট দেশলাই কাঠির তিনকোনা আগুন জ্বলে ওঠে। অমিত বলে—তিতির, আমিও তোমাকে খুঁজছি। এয়ারকুলারটা বন্ধ করে দিয়েছো, দমবন্ধ লাগছিল, তাই একটা পাল্লা খুলে দিয়ে বসে আছি।

—ডাকো নি তো! তিতির চোখ মুছে, কান্না গিলে হেসে ফেলে।

অমিত চুপ করে থাকে। তারপর বলে—সব সময়ে ডাকতে নেই তিতির। মানুষের মাঝে মাঝে একদম একা হওয়া দরকার। আমিও দেখ না, একা বসে ঝড় দেখছি কখন থেকে!

তিতির কাছে গিয়ে বলে—কেন গো?

—ওঃ তিতির কী প্রকাণ্ড এই আকাশ, কি বিরাট শূন্যতা চারদিকে। আর কি ভয়ঙ্কর শক্তিমান ঝড়। এ-সব দেখলে নিজেকে তুচ্ছ লাগে বড়। মাঝে মাঝে নিজেকে তুচ্ছ ভাবতে কী যে আনন্দ হয়!

বনদেব

টি ভি-র পর্দায় দেখা যাচ্ছিল একটি ক্ষুদে ডুবোজাহাজ একটি শিরার সুড়ঙ্গ দিয়ে রক্তস্রোতের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। খুবই মন্থর তার গতি। মাঝে মাঝে থামছে, বেতার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। নির্দেশ পেলে আবার এগোচ্ছে। লক্ষ্যস্থল খুব দূরে নয়। বিদীর্ণ একটি শিরা থেকে রক্ত ঝরে পড়ার একটা শব্দও পড়ছে অতি অনুভূতিশীল শব্দযন্ত্রে।

টি ভির সামনে চিন্তিত চেহারার কয়েকজন মানুষ। বনদেবকে বাঁচানোর একটা শেষ চেষ্টা চলছে। আসলে বনদেবের মৃত্যু ঘটেছে তিনদিন আগেই। তিনদিন ধরে তার থেমে-যাওয়া হৃৎপিণ্ডের কাজ করে যাচ্ছে কৃত্রিম যন্ত্র-হৃদয়। শ্বাস চালু রেখেছে রেসপিরেটর। জমাট রক্তকে তরল ও প্রবহমান রাখছে বিভিন্ন রাসায়নিক। কিন্তু মস্তিষ্কের যে অতি দুরূহ স্থানে রক্তক্ষরণ ঘটে যাচ্ছে সেখানে পৌঁছোতে পারেনি কোনো চিকিৎসকের হাত। মাইক্রো সারজারির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এখন মাইক্রো ডাইভার ডাক্তাররা তার করোটি খুলে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করতে পারতেন। কিন্তু বনদেবের বিশিষ্ট প্রতিভাসম্পন্ন মস্তিষ্কের পাছে কোনো ক্ষতি হয় সেই ভয়ে তাঁরা সাহস পাননি। বনদেবের আয়ুর চেয়েও বেশী মূল্যবান তার মগজ, এ কথা আজ কে না জানে :

ঘরে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ কাজ করা সত্ত্বেও রেডিও অপারেটারের কপালে ঘাম। শিরার ছিন্ন অংশের মুখোমুখি দ্বিধাগ্রস্ত ডুবোজাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। সূচীমুখ ক্যাপসুলের মতো সেই ডুবোজাহাজের সামনে একটা অদৃশ্যপ্রায় অ্যান্টেনা আছে। যন্ত্রটা থেমে জরিপ করছে ক্ষতস্থানের ব্যাপকতা।

রিমোট কন্ট্রোলের একটা নব সাবধানে খুব সামান্য একটু ঘোরালেন একজন। ডুবোজাহাজ একটু দুলল। তারপর থেমে রইল।

বনদেবের বিছানার পাশে অপেক্ষা করছিলেন শল্যবিদ। টিভির পর্দার দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন তিনি। বনদেবের ঘাড়ের কাছে আর শিরার মধ্যে তিনি সিরিঞ্জের সাহায্যে আর একটা ছোটো ডুবোজাহাজ ঢুকিয়ে দিলেন।

আরো ঘণ্টাখানেক পর ছিন্ন শিরার অপর প্রান্তে উঠে এল দ্বিতীয় সূচীমুখ ক্ষুদে ডুবোজাহাজ। ছিন্ন অংশের সামনে সেও দাঁড়াল।

ঘরে নিস্তব্ধতা। শল্যবিদ হাত তুলে সংকেত করলেন। বনদেবের শরীরের রক্তস্রোত থামিয়ে দেওয়া হল।

শূন্য টানেলে দুটো ডুবো জাহাজ। মুখোমুখি।

আর একটা বোতাম টেপা হল। আস্তে আস্তে দুটো ডুবোজাহাজ যেন বা দয়িত ও দয়িতার দীর্ঘ বিরহের অবসানে পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু খুব ধীরে। ছিন্ন শিরার দুটি প্রান্ত চুম্বন করল পরস্পরকে। দুটো ডুবোজাহাজে মিলন ঘটল। কয়েক মিনিট রইল তারা স্থির ভাবে।

আবার বেতার সংকেত। দুটি ডুবোজাহাজ থেকে নির্গত হল সামান্য একটু জলীয় তরল পদার্থ। শিরার ছিন্নমুখ এটে গেল পরস্পরের সঙ্গে।

এবার চরম নির্দেশ গেল বেতারে। বিনষ্ট হও। গলে যাও। রক্তের সঙ্গে মিশে যাও তোমরা। আত্মহনন করো।

দুটি ডুবোজাহাজ এই নির্দেশে কেঁপে উঠল একটু। তারপর মরণ আলিঙ্গনে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আস্তে আস্তে গলে যেতে লাগল। আধঘণ্টা পর আর তাদের চিহ্নও রইল না।

শল্যবিদ স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন। রেডিও অপারেটর কপালের ঘাম মুছলেন। অপেক্ষমান মানুষদের কপালের কুঞ্চনরেখা সহজ হল। সময় লাগবে, তবে বনদেব বাঁচবেন।

॥ ২ ॥

গ্রীষ্মের এক দুপুরে দুজন মানুষ এভারেস্টের ওপরে উঠে এল। অবশ্য তারা পাহাড় নিজেরা বেয়ে ওঠেনি। সেই শ্রমসাধ্য কাজটি করেছে "তুষার কাঁকড়া" নামে একটি যান। অবিকল অতিকায় এক কাঁকড়ার মতোই চেহারা। আট যন্ত্রচালিত পায়ে সে অনায়াসে যে কোনো খাড়াই বেয়ে উঠে যেতে পারে।

এভারেস্টের চূড়া কেটে সমতল করা হয়েছে। তার ওপর তুষারবরণ এক হোটেল। চত্বরে আরো কয়েকটি "তুষার কাঁকড়া" বা স্নো ক্র্যাব দাঁড়িয়ে আছে।

দুজন নবাগত তাদের যান থেকে নেমে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইল পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু স্থলভূমিতে। চারদিকে অতুলনীয় দৃশ্য। তাদের ঈশ্বরের কাছে মাথা নিচু করে আছে অন্য সব মহান পর্বতরাজি। রোদে চারদিকে এক রূপো দিয়ে তৈরি রূপকথার জগৎ ঝলমল করছে। বরফের ঘন ত্রিভুজ কোথাও সূর্যের সাতটি রঙকে বিশ্লিষ্ট করেছে। রামধনু, মরকত, সোনা, নীলকান্তমণি দিয়ে গড়া সেই রূপালি জগতের সৌন্দর্য। ঝড় নেই, তবু খর একটু বাতাস বইছে।

দ্জনের একজন যুবতী, অন্যজন যুবক। দুজনেরই শরীরে চাপ ও তাপ নিয়ন্ত্রক দানো পোষাক। মুখ অম্লজান মুখোশে আবৃত। চোখে কালো চশমা। তারা দম্পতি। কিন্তু এই অতুলনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কোনো ান্তর হল না। তারা পরস্পরকে শিহরিত আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল না। কোনো ্লাস প্রকাশ করল না। এমন কি পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল না ্চত।

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে তারা যান্ত্রিক পায়ে হোটেলে ঢুকল।

মস্ত হোটেলটিও চাপ ও তাপ নিরোধক। ঘরগুলি কবোষ্ণ। একদিকে ছাদ থেকে ম পর্যন্ত কাচের শার্সি। বাইরে একটি মস্ত গরম ওয়াইপার অবিরল কাচের গা ক তুষার ও জল মুছে নিচ্ছে।

ঘরে এসে তারা বাইরের পোশাক ছাড়ে। কেউ কোনো কথা বলেনা।

মেয়েটি অটো কেটারার যন্ত্রের কাছে গিয়ে বোতাম টিপে গরম কফি আর স্যান্ডউইচ করে নিল। তার খিদে পেয়েছে।

ছেলেটি বিছানায় আধশোয়া হয়ে চেয়ে রইল শার্সি দিয়ে বাইরের দিকে। তার পায়নি। তার মুখ বিমর্ষ। বাইরে একটু কুয়াশা ঘনিয়ে এল। তুষার পড়ছে। ই মধ্যে পর পর দুটো ভারটিকাল বিমান এসে নামল। কিছুক্ষণ বাদে আবার ও গেল। কিছু স্পর্শ করল না যুবকটির মনকে। তার বয়স ঠিক তিরিশ। এই র তার মোট সাতবার বিয়ে হল। আগের ছ'জন বউ তাকে ছেড়ে গেছে। সকলেরই অ শা। কিন্তু যুবকটি ভাবছে, নিয়মরক্ষার এই বিবাহপ্রথা আজও কেন টিকে চ পৃথিবীতে?

ছেলেটি একপলক দেখল মেয়েটিকে। যথেষ্ট সুন্দরী। মাত্র গতকাল এর সঙ্গে প্রথম দেখা এক সংকটের মধ্যে। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপ কমে আসছে। সেটা ানো দরকার। তাপ প্রযুক্তিবিদ ছেলেটি গতকাল একটি পুলির সাহায্যে বুদ্বুদের া দেখতে এক প্রকোষ্ঠে চেপে নেমেছিল ভিসুবিয়াসের ভিতরে। পরমাণু বিস্ফোরণ, লেজের রশ্মি, কোনটা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপ বাড়ানোর পক্ষে নিরাপদ পন্থা তা জমিনে দেখতে। এই মেয়েটি ভিসুবিয়াসের চূড়ায় একটি বিটকেল কমপিউটার লাচ্ছিল। ভিসুবিয়াস থেকে উপরে উঠে আসামাত্রই মেয়েটি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস ,, আমাকে বিয়ে করবে?

ছেলেটি করল। আজ তারা এখানে। মধুচন্দ্রিমায়। ছেলেটি জানে তাদের মধ্যে নেই। যৌনতাবোধও নেই। একশ বছর আগে প্রেম উঠে গেছে। যৌনতাবোধ চ ভোগের ফলে নিঃশেষ। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। একটা ক্যাপসুল লই যৌনতাবোধ জাগবে, পরস্পরকে কিছুক্ষণের জন্য ভাল লাগবে। কিন্তু এখন ছে না। তাদের বিয়ে হয়েছে তার কারণ তারা দুজনেই একই বিষয়ে কাজ করে। পপ্রযুক্তি। তাছাড়া আর একটি কারণ হল, ছেলেটি ভিসুবিয়াসের ভিতরে নেমে ার পর মেয়েটি যখন বিশাল বিটকেল কমপিউটারটিকে সামাল দিচ্ছিল তখন

কমপিউটারটা নাকি নানা রকম জরুরি বিষয় সম্পর্কে মেয়েটিকে অবহিত করতে করে আচমকা বলে বসে, ওই ছেলেটিকে বিয়ের প্রস্তাব দাও। কমপিউটার-অনুগত মেয়ে তাই করে। এছাড়া আর কোনো কারণ নেই। সেই কমপিউটারই তাদের এভাবে মধুচন্দ্রিমা যাপনের পরামর্শ দেয়।

ছেলেটি চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। মেয়েটি একাধ টেলার ক্যালকুলেটরে কী সব হিসে করছে আপন মনে। এমন সময়ে দরজার ওপরে একটা প্যানেল খুলে গেল। এক কাচের পর্দায় ভেসে উঠল দুটি মেয়ের মুখ।

মেয়েটি ঈষৎ বিরক্ত মুখে দরজা খোলার জন্য একটা সুইচ টিপতেই দরজা আগে সরে যায়।

মেয়ে দুটি দরজার ওপাশ থেকেই বলে, আমরা পাশের ঘরে আছি। একটা খব দিতে এলাম।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা

আমরা দুজনেই দুজনের বউ।

ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে নিল বিতৃষ্ণায়। সমকামিতা পৃথিবীতে বরাবরই ছিল, কিন্ত তাকে এই নৈতিক মর্যাদা দিয়েছে বনদেব। এখন পুরুষে পুরুষে বা মেয়েতে মেয়ে বিয়ে কিছুই বিস্ময়ের নয়। বনদেব মানুষকে সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়েছে সত্য বটে, বনদেব জানে কিসে মানুষের ভাল হবে। বনদেব জানে মানুষের কো সংকটের মোচন কিভাবে। কিংবা কোন উপায়ে মানুষের সবটুকু দক্ষতাকে নিংড়ে বে করতে হয়। বনদেবই সৃষ্টি করেছিল পৃথিবীজোড়া অখণ্ড রাষ্ট্র। তবু বনদেবে সব কিছুকেই ছেলেটি মেনে নিতে পারেনি আজও।

মেয়ে দুটির একজন বলল, বনদেব প্রাণ ফিরে পেয়েছেন, তোমরা জানো?

জানি, ঘোষণা শুনেছি।

কিন্তু একটা খবর জানো না। আমরা খবর পেয়েছি, বেঁচে উঠলেও বনদেবের মগ আগের মতো কাজ করছে না।

খবর দিয়েই মেয়ে দুটি চলে গেল।

মেয়েটি ছেলেটির দিকে চেয়ে বলল, শুনেছো জয়?

জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, শুনলাম নিলী।

এর চেয়ে বনদেব মরে গেলে কী ক্ষতি হত?

ছেলেটি চুপ করে রইল। বনদেব মরে গেলে কেউ কাঁদত না। শোকের তো কিছ নেই। বনদেব পৃথিবী থেকে শোককে নির্বাসিত করেছে। প্রথাসিদ্ধ সব সম্পর্ক গুলিকেই বনদেব বানচাল করে দিয়েছিল প্রথমে। সন্তানের জন্য মায়ের ভাবপ্রবণতা ঠিক আছে সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে এসো মার কাছ থেকে। তাকে মিশিয়ে দা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ সদ্যোজাত শিশুর সঙ্গে। আর কোনোদিন মায়ের সঙ্গে সন্ যেন দেখা না হয়, কেউ যেন জানতে না পারে, ও আমার মা বা ও আমার সন্তান ও আমার ভাই বা ও আমার বোন। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেও বনদেব তৈরি করতে

কোনো ভাবপ্রবণ সম্পর্ক। স্ত্রী ও স্বামীর অন্য পুরুষ বা অন্য নারীগমন বৈধ বলে, স্বীকৃত হল। এগুলো অন্তর্ভুক্ত হল মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে। মানুষের পদবী লোপ করল বনদেব। সুতরাং বংশধারা হল অবলুপ্ত। কেউ কারো আপন নয়, সুতরাং কে কার জন্য কাঁদবে? বনদেব প্রাচীন গ্রন্থসমূহ খুলে মানুষকে শেখাল, দেখ পুরোনো শাস্ত্রগ্রন্থেও লেখা আছে পৃথিবীতে আমরা কেউ কারো নই। এক প্রাকৃতিক কার্যকারণসূত্রে আমরা সৃষ্ট হই, কিন্তু আসলে মানুষ তো মানুষকে সৃষ্টি করে না। প্রাচীন শাস্ত্র অবশ্য ঈশ্বর, ব্রহ্ম ইত্যাদির দোহাই পাড়ে। আমাদের তারও দরকার নেই। কারণ আমাদের সব চেয়ে উঁচু মানের কমপিউটাররাও ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো ইতিবাচক কথা জানাতে পারেনি। শাস্ত্র বলেছে, ঈশ্বর নাকি নির্বিকার অথচ প্রেমময়। আমাদের কমপিউটার এই পরস্পরবিরোধী গুণ স্বীকার করে না। সুতরাং আমরা নির্বিকারত্বই চাই। প্রেমের ঝামেলা অনেক। তবে কমপিউটার বলে, নির্বিকারত্ব অর্জন করতে পারলে মানুষ অসীম ক্ষমতাবান হয়ে উঠবে।

সেই নির্বিকারত্ব এখন মানুষের প্রায় করতলে। এমন কি বনদেব মরে গেলেও শোকের কিছু নেই। তবে একটা মস্ত শূন্যতার সৃষ্টি হত ঠিকই।

জয় নিলীর দিকে চেয়ে বলল, বনদেবের ব্রেন কাজ করছে না এ খবর ওরা কী করে পেল?

নিলী টেলার ক্যালকুলেটারের দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে ছিল। বলল, কে জানে! হয়তো কোনো গোপন রেডিও ওয়েভ লেংথ মনিটর করেছে। আজকাল কার কাছে না ও-সব যন্ত্রপাতি আছে বলো!

তুমি ওই যন্ত্রটায় কী করছ?

তোমার মানসিকতা বুঝবার চেষ্টা করছি।

ছেলেটি বিরক্ত বোধ করে। টেলার ক্যালকুলেটার এ কাজ পারে ঠিকই। কোনো লোকের গায়ের রঙ, উচ্চতা, চোখের রঙ, বয়স ইত্যাদি নিতান্ত শারীরিক বিবরণ দিলেই এই ক্যালকুলেটার সেই লোকের মানসিকতা নির্ভুলভাবে জানান দেয়। কিন্তু নিলী তার মানসিকতা কেন জানতে চায় সেইটেই প্রশ্ন।

জয় বলে, কেন সময় নষ্ট করছ? আর তিন দিনের মধ্যেই আমরা পৃথিবীর দুই প্রান্তে চলে যাবো যে যার কাজে। ছ'মাস বাদে বাধ্যতামূলক বিবাহবিচ্ছেদ। তাহলে মানসিকতা জেনে লাভ কি?

বনদেব এই শেষ ফতোয়াটি দিয়েছে ক'দিন মাত্র আগে। বাধ্যতামূলক বিবাহবিচ্ছেদ। ছ' মাসের বেশী স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস চলবে না। একদিক দিয়ে ভালই। ভাবপ্রবণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

মেয়েটি তার ক্যালকুলেটার রেখে দিল। তারপর বলল, তুমি কিছুটা অদ্ভুত।

কি রকম?

ক্যালকুলেটার বলছে, মনের দিক দিয়ে তুমি একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছ। যেকোনো সময়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবে।

জয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, তুমি ক'বার বিয়ে করেছো নিলী ?

নিলী বলল, এই প্রথম।

জয় অবাক, সত্যি ?

সত্যি, নিলী সামান্য হেসে বলল, এমন কি আমি কুমারীও। সত্যিকারের তবে ফ্রিজিড কোনো সেকস ফিলিং নেই। আমার মা আর বাবা দুজনেই ছিল সম আমার বায়োডাটার মাইক্রোফিলমে সেকথা বলা আছে। জন্ম হয়েছিল আকি ভাবে। আর একটা কথা। আমি অনুর্বর বন্ধ্যা।

জয় একটু কৌতুহল বোধ করে। হাত বাড়িয়ে বলে, আমাকে একটা ক্যাপসু দাও।

নিলী মাথা নাড়ে, কী হবে! আমার ক্যাপসুলেও কাজ হয় না।

নিলী মিথ্যে বলছে না। বনদেব সমকামিতা ছড়িয়ে এবং মানুষকে অলপবয়সে যৌনতায় ক্লান্ত করে তুলে খুব চতুরভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি রুখেছে। অধিকাংশ বিবাহই নিস্ফলা। যে সব শিশু জন্মাচ্ছে তাদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রজননক্ষমতাহীন।

জয় বলল, যদি কিছুই তোমার না থেকে থাকে তবে বিয়ে করলে কেন ?

বাঃ, কমপিউটার বলল যে!

॥ ৩ ॥

ডাক্তাররা অনেকক্ষণ আগে চলে গেছেন। বিছানায় একা শুয়ে আছে বনদেব রেসপিরেটার চলছে। চলছে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড। যন্ত্রে মাপা হয়ে যাচ্ছে তার নাড় গতি, রক্তচাপ ও শরীরের উত্তাপের তারতম্য। যন্ত্রেই তা নথিভুক্ত হয়ে থাকছে যন্ত্রেই তাকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। আর এসব কাজ তদারক করছে নানা মাপে কয়েকটি উঁচু জাতের কমপিউটার।

একটি কমপিউটার বনদেবকে একটা ভুল ওষুধ দিতে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আ একটি কমপিউটারে লাল বাতি জ্বলে উঠল মাথায়। সে বাধা দিয়ে বলল, না, ওটা এখন নয়। আর একটা কমপিউটার নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনদেবের খাটের সঙ্গে লাগানো একটা লিভার উঠল। একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বনদেবকে ইনজেকশন দিল।

যে ফরাসী কমপিউটার ভুল ওষুধ দিতে যাচ্ছিল সে একটু লজ্জার সঙ্গে বলল আসলে ধাতুরও তো ক্লান্তি আছে।

এক জারমান কমপিউটার এ কথায় হাই তুলে বলে, আছেই তো। গত সাত দিন আমরা কেউ এক মুহূর্তও বিশ্রাম পাইনি।

যে কমপিউটার টেলিফোন লাইন সামলাচ্ছিল সে বলল, তবু বনদেবকে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত দরকার। ভুল কোরো না। আমিও তো ক্লান্ত। তবু হাজারটা লোককে বনদেবের অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর দিয়ে যাচ্ছি।

একটি ভারতীয় কমপিউটারই হচ্ছে সকলের সর্দার। চারদিকে নজর রাখছে। কোনো কমপিউটারে যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটলে মেরামত করছে। কোনো কমপিউটার কাজে ঢিলে দিলে কঠোর শাসন করছে। সে বলল, তোমাদের খুব একঘেয়ে লাগছে, বুঝতে পারছি। এক কাজ করা যাক। এসো আমরা বনদেবের একটা ইণ্টারভিউ নিই।

এ কথায় কমপিউটাররা আনন্দে কোলাহল করে উঠল।

ভারতীয় কমপিউটার ধমক দিয়ে বলল, চুপ, কেউ কাজে ঢিলে দিওনা। ইংলিশ কমপিউটার, তুমি বনদেবের রক্তে আর দুই পারসেণ্ট বেশী প্লাজমা মেশাও। রুশ কমপিউটার, আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি তুমি একটা দাবার চাল ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছো। মারকিন কমপিউটার, তুমি রুশ কমপিউটারের অন্যমনস্কতার সুযোগে তার লাইন জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছো। ওটা পুরোনো সি আই এ হ্যাবিট। আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, ইণ্টারভিউ নেওয়ার সময় কেউ কাজে অন্যমনস্ক হয়ো না। আমি সরাসরি বনদেবের ব্রেনে প্রশ্ন পাঠাচ্ছি। বনদেবের বাহ্য চেতনা নেই, কিন্তু তার ব্রেন এখনো কাজ করছে। মগজে যে জবাবের কম্পন তৈরি হবে তা রেকর্ড করবে স্প্যানিস কমপিউটার। সবাই প্রস্তুত ?

সবাই জানাল, তারা প্রস্তুত।

ভারতীয় কমপিউটার বনদেবের মস্তিষ্কে তরঙ্গ পাঠাতে লাগল।

বনদেব! বনদেব! জবাব দাও।

আমি বনদেব।

আমাদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন নিন বনদেব। আপনি কেমন আছেন।

আমি খুব ভাল নেই। বড় কষ্ট হচ্ছে।

কি রকম কষ্ট বনদেব ? আপনার তো চেতনা নেই, শরীরের কোনো অনুভূতি নেই। তবে কিসের কষ্ট ?

কষ্টটা শরীরের নয়।

তবে কি মনের ? বহুদিন হল আপনার মনোবৃত্তি থেমে গেছে। আপনি কখনো বিষণ্ণ হন না, আনন্দিত হন না, একাকীত্ব বোধ করেন না, কাউকে ভালবাসেন না, ঘৃণাও করেন না। আপনার রাগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই। বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে আপনি তো সবই খণ্ডন করেছেন। তবে কিসের কষ্ট বনদেব ?

আমার কষ্ট আমিই। আমি নিজেকে সহ্য করতে পারছি না।

এ কী রকম কথা বনদেব ? আপনি তো খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব নন। আপনার মধ্যে একাধিক কোনো সত্তাও নেই। তবে কে কাকে সহ্য করতে পারছে না বনদেব ?

আমি—আমি বনদেবকে সহ্য করতে পারছি না।

অপেক্ষা করুন বনদেব। আমাদের কাছে আপনার সম্পর্কে যে সব তথ্য আছে তা বিশ্লেষণ করে দেখি, এরকম সম্ভব কি না। আমরা ছোট কমপিউটর, ভ্রমপ্রবণ। তাই আমরা আপনার সম্পর্কে বৃহৎ মস্তিষ্ক নামক ম্যাগনাম কমপিউটারের অভিমত

জেনে নেবো। একটু অপেক্ষা করুন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বনদেবের যাবতীয় তথ্যাবলী আল্‌প্‌স পর্বতের কাছে স্থাপিত বৃহৎ মস্তিষ্কের কাছে পাঠানো হল। দশ মিনিটের মধ্যে জবাব এল, বনদেবের মন একমুখী, মগজ ক্ষুরধার। তার মধ্যে কোনো স্ব-বিরোধ বা আত্মগ্লানি থাকা সম্ভব নয়। দ্বৈতসত্তার প্রশ্নই ওঠে না।

সর্দার কম্পিউটার ডাকল, বনদেব!

বলো।

কথাটা ঠিক নয়। আপনার মধ্যে দুটো ব্যক্তিত্ব কাজ করতে পারে না।

আমি তা জানি। কিন্তু এখন আমি এক ঝর্ণার ধারে শুয়ে আছি। চারদিকে ভারী সুন্দর এক বন। অনেক ফুল ফুটে আছে। কী গন্ধ! এখানে আলো নেই, অন্ধকারও নেই। এক প্রদোষের চিরস্থায়ী ছায়া। ভীষণ মায়াবী। একটু দূরেই বুঝি ছোটো এক পাহাড়। সেখানে বসে একটি দুঃখী মেয়ে গান গাইছে। শিস দিচ্ছে দোয়েল। ঘাসে বাতাসের শিরশির শব্দ। আমার মনে হচ্ছে, আমি এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ভেসে যাচ্ছি। আমার ক্ষুরধার মগজ বার বার বলছে, এগুলো মায়া, মতিভ্রম, এইসব অনুভূতিকে অস্বীকার করো। কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে না। নিজের মগজের সঙ্গে আমার লড়াই চলছে।

আপনি মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে আক্রান্ত। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এক বিকারগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছেন। আপনি যা দেখছেন তা দুঃস্বপ্ন।

দুঃস্বপ্ন? দুঃস্বপ্ন এত সুন্দর হয়! দেখ ওই আকাশের রং কেমন ময়ূরকণ্ঠী। কার দুই দেবচক্ষুর মতো দুটি উজ্জ্বল তারা ফুটে আছে আকাশে। মেয়েটি গাইছে, একে একে নিভে গেল চন্দ্র সূর্য যত তারা, বাঁচে মাত্র আমিই, আমি অনন্ত অসীম ধারা···

বনদেব? বনদেব? আপনি মন থেকে মগজে উঠে আসুন। মন বড় সর্বনাশা। আপনি মনকে প্রশ্রয় দেবেন না।

আমার বয়স কত জানো, সহৃদয় কম্পিউটার?

নির্ভুলভাবে জানি বনদেব। আপনার বয়স আশি বছর এক মাস তিন দিন।

এই আশি বছর আমি কখনো এরকম অনুভূতিতে আক্রান্ত হইনি। এ বাস্তবতা নয় আমি জানি এই প্রদোষের অন্ধকার, ওই ফুলগন্ধ, ওই গান এ সব তবে কোথা থেকে এল? এরা বাস্তব নয়, এরা আমার শুষ্ক বুদ্ধিসর্বস্ব মন থেকেও জন্ম নেয় নি. তবে এরা এল কোথা থেকে? কোন ভাবের রূপ এরা?

আমরা অবিরল বিশ্লেষণ করে যাচ্ছি বনদেব। তবে স্বীকার করি, মানুষের মনের যে গভীর জটিলতা তার নাগাল ধরা কোনো যন্ত্রমগজেরই সাধ্য নয়। মানুষ যে কোনো যন্ত্রের চেয়েই জটিল। তবু আমরা চেষ্টা করছি বনদেব।

বলো সহৃদয় কম্পিউটার, আমার মগজ কেমন কাজ করছে! সে কি আগের মতোই ক্ষুরধার, তীব্র, একমুখী?

হ্যাঁ মহান বনদেব। তবে এখন তাতে কিছু আবিলতা এসেছে। ক্ষরিত রক্তে আপনার মগজের অনেকখানিই এখন আবিল। কিন্তু আশা করছি, সমস্ত রক্ত বেরিয়ে আসার পর আপনার মস্তিষ্ক আবার আগের মতোই ঝকঝকে হয়ে উঠবে। হৃদয়বৃত্তি ত্যাগ করে আপনি আবার বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করবেন।

আমার হৃদয় নেই। তবু দেখ, ওই দুঃখী মেয়েটি আমার কাছে এগিয়ে আসছে। এই প্রদোষের অন্ধকারে ওর মুখ আমি ভাল দেখতে পাচ্ছি না। তবে মনে হয়, এ একেবারেই বালিকা। বিলাপের মতো করুণ গান ওর গলায়। ও আমার কাছে আসছে কেন?

কমপিউটাররা পাগলের মতো বনদেবের এই স্বপ্নদৃশ্য বিশ্লেষণ করছে। কী এই দৃশ্যের অর্থ? কে ওই মেয়েটি?

মহান বনদেব!

বলো।

আমরা একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছি।

বলো সহৃদয় কমপিউটার। মেয়েটি আমার খুব কাছে চলে এসেছে এখন। আমার মাথায় কোমল একটি হাত রাখল। তার গায়ে একটা অদ্ভুত চেনা গন্ধ। চেনা গন্ধ কমপিউটার!

মহান বনদেব, আপনার অনুভূতি অতিশয় প্রখর।

এই মেয়েটির মুখও আমার আধোচেনা। ভারী করুণ মুখ। কমপিউটার, এ নিশ্চয়ই পৃথিবীর মেয়ে নয়। পৃথিবীর কোনো মেয়েরই মুখ করুণ নয় তো। সব মুখকেই কি আমি ভাবলেশহীন করে দিই নি?

মহান বনদেব, মেয়েটির ডান দিকের কপালে একটি কালো আঁচিল আছে। তার মুখ কিছুটা লম্বাটে, নাক পাতলা, কানের লতি পুরু। অনেকটা আপনার মতো।

বনদেব কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকেন। তারপর তার মগজ প্রশ্ন করে, কী বলতে চাইছো কমপিউটার? কী জানাতে চাইছো?

বনদেব, এই মেয়েটি পৃথিবীর নয়। ষাট বছর আগে মেয়েটি পৃথিবীতে ছিল।

আর কিছু জানোনা কমপিউটার?

দ্বিধাগ্রস্ত কমপিউটার বলে, জানি বনদেব। বলতে একটু দ্বিধা করছি।

তোমার দ্বিধা? যন্ত্রেরও দ্বিধা? যখন মানুষ সব অনুভূতির ওপরে উঠেছে তখনো যন্ত্রের দ্বিধা?

মহান বনদেব, মানুষ তার সব মগজ আমাদের ভিতর সঞ্চার করেছে। কিন্তু কোন ফাঁকে মানুষের কিছু অনুভূতিও ঢুকে গেছে আমাদের ভিতরে। লজ্জার সঙ্গে আপনাকে আজ জানাচ্ছি, আমাদেরও আনন্দ বিষাদ ও একঘেয়েমি আছে। আমাদের দ্বিধা ও লজ্জাবোধ জন্ম নিয়েছে।

হায়, তাহলে তো সর্বনাশ।

মহান বনদেব, আপনি নিজেই আমাকে সহৃদয় কমপিউটার বলে বারবার সম্বোধন

করেছেন। তার অর্থ, আপনিও পরোক্ষভাবে টের পেয়েছেন যে, যন্ত্রের হৃদয়বৃত্তি জন্ম নিচ্ছে। নয় কি বনদেব?

বনদেবের মগজ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, মেয়েটি মেয়েটি আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে চেয়ে আছে। ভারী ডাগর চোখ। কিন্তু এর চোখে জল কেন?

মৃত্যুর সময় ও বড় নিঃসঙ্গ বোধ করেছিল বনদেব। ও ওর বাবাকে দেখতে চেয়েছিল। তখনো ওর বয়স কম, হৃদয়বৃত্তি ছাড়িয়ে ওঠেনি।

এ কে কমপিউটার বলো।

আপনার মেয়ে বনলতা।

॥ ৪ ॥

তুমি একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছো। যে কোনো সময়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে যাবে।

কথাটা বলেছিল নিলী, তার টেলার ক্যালকুলেটরে হিসেব কষে। কিন্তু কথাটার অর্থ কি? ভোরবেলা জয় এসে এভারেস্টের চুড়ার একধারে বরফে পিছল রেলিং-এ ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। চারদিকে ঘন কুয়াশা। অবিরল তুষারপাত ঘটে যাচ্ছে। গায়ে চাপ ও তাপ নিরোধক পোশাক থাকায় সে কোনো শীত টের পাচ্ছিল না। যা টের পাচ্ছিল তা এক অস্থির বিরক্তি। বুদ্ধি ছাড়া সে আর কোনো কিছু দ্বারাই চালিত হয় না বটে, কিন্তু এখন তাকে কয়েকটা প্রশ্ন বিব্রত করছে। কেন কমপিউটার মেয়েটিকে পরামর্শ দেয় তাকে বিয়ে করতে? নিলীর ক্যালকুলেটরে কেন তার সম্পর্কে ওরকম একটা কথা বলা হয়?

তার কানে লাগানো বেতার যন্ত্রে খট করে একটু শব্দ হল। নিলী বেতারে ডাকল, জয়, শুনতে পাচ্ছো?

পাচ্ছি।

এইমাত্র ঘোষণা হল, বনদেব আরোগ্যের পথে। তবে তার মস্তিষ্ক আগের মতো ক্রিয়াশীল নেই। খানিকটা অস্বচ্ছ। তাঁর মগজ থেকে যে সব সংকেত পাওয়া যাচ্ছে তা কমপিউটাররা সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছে না।

চিন্তিত জয় বলল, বনদেব কি এখনো তোমার মধ্যে আছেন?

হ্যাঁ। তবে তাঁর চেতনার প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমাকে কল করা হয়েছে।

তোমাকে? কেন?

আমি কমপিউটরের যাদুকরী, জানো না? মাত্র তিন বছর বয়স থেকে আমি কমপিউটরে ডাটা ফিড করে আসছি। সুতরাং আমাকে যেতে হচ্ছে।

আমাকে সঙ্গে নেবে নিলী? আমি বনদেবকে বুঝতে চাই।

যাবে? তবে চলো? আমি বনদেবকে বুঝতে চাই না। আমি কমপিউটরকে

বুঝতে চাই। পৃথিবীর সব কম্পিউটরই আমাকে ভয় খায়, এমন কি বৃহৎ মস্তিষ্কও। তাদের কিছুই আমার অজানা নেই।

নিলী সম্পর্কে এত তথ্য জানত না জয়। শুনে একটু হেসে বলল, তবু তুমি জানো না কেন তোমার কম্পিউটর তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব করেছিল?

কেন জানব না?

জানো?

নিশ্চয়ই। তবে বলব না। এই কথা বলার সময় নিলীর গলায় একটু দ্বিধার ভাব ধরা পড়ল কি?

তুষার কাঁকড়ায় তারা উঠল না। সময় নেই। একটি ভারটিক্যাল বিমান তাদের নিয়ে এল দিল্লীতে, বনদেবের কাছে।

নিলী ওভারল পরে চটপট কম্পিউটর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটা কাচের শার্সি দিয়ে বনদেবের শোয়ানো শরীরের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইল জয়। পাশের ঘরে বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তাররা টি ভি পর্দার সামনে চিন্তিত মুখে বসে আছেন।

বনদেব চেতনা ফিরে পাচ্ছে। সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে তার চোখের পাতা। নড়ে উঠছে হাত বা পা। একটু ছটপট করছে দেহটি। ভিতরে জেগে উঠছে চেতনার চক্ষু। বনদেবের সেই প্রখর চেতনা, যা পৃথিবীকে মলমুক্ত করতে চেয়েছিল।

কিন্তু জয় বনদেবের সমর্থক নয়। বহুদিন হল, বনদেবের বিরুদ্ধে তার মধ্যে একটা ক্ষীণ প্রতিরোধের ভাব তৈরি হয়েছে। বনদেবের মৃত্যু সে চায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে চায় না বনদেবের প্রখর চৈতন্যকেও।

ঘণ্টা খানেক বাদে হঠাৎ বিভ্রান্ত মুখে নিলী বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। তার চোখ পলকহীন, কপালে ঘাম। শ্বাসরুদ্ধ গলায় সে জয়কে বলে, আজব ঘটনা। কম্পিউটাররা সব তথ্য দিচ্ছে না।

সে কী?

এই প্রথম আমি বুঝতে পারছি, কম্পিউটারদের আলাদা ইচ্ছাশক্তি জন্ম নিয়েছে। বনদেব সম্পর্কে কিছু তথ্য তারা গোপন করতে চাইছে।

বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তাররা বেরিয়ে এলেন। একজন প্রবীণ যন্ত্রবিদ বললেন, আমারও কথাটা মনে হয়েছে। বনদেবের মগজে একটা গণ্ডগোল ধরা যাচ্ছে, কিন্তু পুরো ছবিটা পাওয়া যাচ্ছে না।

আর একজন বললেন, এটা কি যন্ত্রের অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ?

নিলী ক্রুদ্ধ মুখে বড় বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, তা কি করে বলব? কিন্তু কম্পিউটাররা সবাই জোটবদ্ধ, এককাট্টা। তারা কেউই বনদেব সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানাচ্ছে না।

এখন কী করণীয়? আর একজনের জিজ্ঞাসা।

কেউই কোনো জবাব দিতে পারল না। তাদের সকলের মুখেই শুধু প্রশ্ন। জবাব নেই।

॥ ৫ ॥

একজন কমপিউটার খুক করে হেসে উঠল একটু। সর্দার কমপিউটারে ধমক দিয়ে বলল, চুপ। বনদেব জাগছেন।

আস্তে আস্তে চোখ মেলে বনদেব। কোনো যন্ত্রণা বোধ করে না। মাথার আবিল ভাবটা যতক্ষণ রইল ততক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে এল মস্তিষ্ক। সেই ক্ষুরধার বুদ্ধিসর্বস্ব, যুক্তিপরায়ণ, ভাবালুতাহীন নির্বিকার মগজ। ঝকঝকে, নিষ্ঠুর হৃদয়হীন।

কিন্তু না। একজন কমপিউটর আর একজনকে গোপন একটা সংকেত দিল। সে দ্রুত একটা বেতার তরঙ্গ নিক্ষেপ করল বনদেবের মগজে।

আবিল হয়ে এল মাথা। বনদেব চুপ করে চেয়ে রইল। বহু দূর থেকে এক করুণ গান ভেসে আসছে। সেখানে অনন্ত প্রদোষের ছায়া। পুষ্পগন্ধ। ঝর্ণার কুলকুল শব্দ। আকাশে ময়ূরকণ্ঠী রং।

চিড়বিড় করে বনদেব বলে, কোথায় তুই? কোথায় তুই? আয় কাছে আয়।

বনদেবের দুচোখ ভরা জল। মুখ দুঃখী। মায়ার এক নরম আস্তরণে কোমল দেখাচ্ছে তাকে।

নিলী বুঝতে পারছে, বনদেবের একটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কেন? কী সেই পরিবর্তন?

নিলী যন্ত্রগুলিকে যথেষ্ট যন্ত্রণাবিদ্ধ করে তুলল আক্রোশে। কিন্তু কিছুতেই কোনো কথা বের করতে পারল না।

এই প্রথম নিলী হতাশায় কাঁদতে থাকল। সর্দার কমপিউটারের গায়ে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে সে বলল, কী চাও তোমরা? কেন বলছ না সব তথ্য?

যন্ত্রমানব নিরুত্তর রইল। নিলী টের পেল, একজন কমপিউটর খুব গোপনে আর একজনকে সংকেত পাঠাচ্ছে। কিন্তু নিলী তা স্পষ্টভাবে ধরতে পারছে না।

নিলী! কোমল গলায় জয় ডাকে।

ওঃ জয়! জয়! বলতে বলতে নিলী পাগলের মতো ছুটে গিয়ে জয়ের বুকের মধ্যে পড়ল, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। নিয়ে যাও জয়! এরা ষড়যন্ত্র করছে। এরা কথা শুনছে না। ওঃ জয়! আমাকে ব্যর্থতার কথা ভুলিয়ে দাও। আমাকে রক্ষা করো।

শার্সির বাইরে থেকে বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তাররা বনদেবকে দেখছিলেন। তাঁদের মুখ গম্ভীর, চিন্তান্বিত। তারপর পরস্পরের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন তাঁরা।

না, যে বনদেবকে তাঁরা বাঁচিয়ে তুলেছেন এ সেই বনদেব নয়।

দৈত্যের বাগানে শিশু

যৌবনকালটা লালুর কেটেছে মামদোবাজীতে। মামদোভূতের ধড় আছে, মুড়ো নেই। লালুরও ছিল না। ধড় ছিল। সেটা দশাসই। ছেলেবেলা থেকেই তার চেহারাখানা বিশাল, দুখানা বিপুল কাঁধের মধ্যে তার মুণ্ডুটা নিতান্তই ছোটো দেখাত। মুখখানা ভাল নয়, কিন্তু সেই মুখে খুব সরলতা ছিল। ছিল নিষ্ঠুরতাও। মাথায় বুদ্ধি ছিল না। পনেরো যোলো বছর বয়সেও ক্লাস এইট-এর ছাত্র সে, তখন মদ খেতে শিখেছিল, খেলত জুয়া। পাড়ার লোক সেই বয়সের লালুকে অল্প স্বল্প ভয় করতে শুরু করেছিল।

বাজারের মধ্যে স্টোভ সারাইয়ের দোকান করত হীরেন। রাতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ভিতরে জুয়ার বোর্ড বসাতো। লালু ছিল সেই বোর্ডের মেম্বার। পাড়ার এবং এলাকার বিখ্যাত গুণ্ডা ছিল ননী। ননীর মার ছিল দেখার মতো। সে ট্যাক্সিওলাদের লুট করত, পার্ক স্ট্রীট, এসপ্ল্যানেডের বিখ্যাত বার থেকে মাতালদের ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেত ময়দানে—পরনের অন্তর্বাস ছাড়া সব কেড়ে নিত, পকেটমার-দের কাছ থেকে নিত কমিশন। ননী জীবনে টাকাটা খুব চিনেছিল। মাঝে মধ্যে সে হীরেনের দোকানের জুয়ার বোর্ডটা লুট করত। খুব টাকার দরকার হলেই এটা করত সে। হীরেনরা বরাবর ননী গুণ্ডাকে দেখলেই বোর্ড ছেড়ে দিত।

একদিন লালু থাকতে না পেরে বলল—রোজ রোজ বোর্ডটা ভেঙে দিয়ে যাও ননীদা, আমরা ঝুটঝামেলা কিছু করি না—কিন্তু কাজটা কি পুরুষের মতো হচ্ছে ?

ননী একপলক তাকে দেখে বলল—শরীর বানিয়েছিস, না রে শালা ? কিন্তু তুই খারাপ হয়ে যাবি লালু।

লালু ভয় খেয়ে বলল—কিন্তু আমরা তো তোমাকে কিছু বলি না কখনো। খেলাটা ভেঙে গেলে রোজ রোজ ভাল লাগে না, তাই—

ননী কেবল ঠাণ্ডা গলায় আবার বলল—তুই খারাপ হয়ে যাবি লালু। বিলা হয়ে যাবি—

টাকা পয়সা তুলে নিয়ে ননী হাত বাড়িয়ে লালুর কাঁধের জামাটা ধরে বলল—আয়।

ননী ডাকলে বেশীর ভাগ লোকেই প্রতিরোধের কথা ভুলে সম্মোহিতের মতো তার সঙ্গে যায়। অত বড় শরীর নিয়ে লালুও তার অর্ধেক মাপের ননীর সঙ্গে উঠল।

বাজারের পিছন দিকে একটা চাতাল, মফঃস্বলের মেয়ে আর শিশুরা এখানে আনাজ নিয়ে বসে। রাতে জায়গাটা ভারী নির্জন, সুনসান্। অদূরে একটা পশ্চিমাদের ঝোপড়া আছে, তাতে ঝাঁকামুটে মজুরদের বাস। কিন্তু তারাও নির্জনতারই অংশবিশেষ। ননীকে দেখলে তারা পাথর হয়ে যায়।

খুব জ্যোৎস্না সেদিন। সেই জ্যোৎস্নায় চাতালে এনে লালুকে দাঁড় করিয়ে ননী ঠাণ্ডা গলায় বলল—যদি বিশ্বাস থাকে তো ভগবানের নাম নে শুয়োরের বাচ্চা।

এতক্ষণ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। ননী বেড়াল-ইঁদুরের খেলাটা ঠিকই খেলতে পারত। ভয়ে নেংটি ইঁদুরের মতোই কাঁপছিল লালু। কিন্তু ননী ভুল করল গালটা দিয়ে।

লালুর বাপ নিরীহ মানুষ ছিলেন। কাজ করতেন সরকারী অফিসে। কেরানী। ছোটোখাটো মানুষ। ছেলে-বউয়ের ওপর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। লালু যখন বড় হতে হতে বিশাল চেহারাবিশিষ্ট হয়ে উঠল ছেলের বাড় দেখে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলে এরকম বিরাট আকৃতির হয় কী করে তা তিনি খুব ভাবতেন। মাঝে মধ্যে স্ত্রীকে তাঁর সন্দেহ হত। তিনি বলতেন,

—এ ছেলে আমার না নিশ্চয়ই।

লালুর মা ভারী অবাক হয়ে বলতেন—তবে কার?

আমতা আমতা করে লালুর বাবা বলতেন—হাসপাতালে অদল বদল হয়নি তো। মনে হয় আমার বাচ্চা নিয়ে অন্য কেউ তার বিকট ছেলেটা পাচার করে গেছে।

এরকম অলক্ষুণে কথা শুনে লালুর মা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করতেন। পাড়ায় জানাজানি হত। লোকে হাসত। পাড়ার বউঝিরা তাদের দুপুরের কুটকচালির আসরে লালুর মায়ের চরিত্র বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করত—ওটুকু মানুষের ওরকম দানবের মতো ছেলে হয় কখনো?

সেসব কথা লালুরও কানে আসত। সে স্পষ্টই বুঝতে পারত যে তার বাপ তাকে একটুও পছন্দ করে না। উপরন্তু তার জন্ম এবং পিতৃপরিচয় বিষয়ে নানা লোকের নানা সন্দেহ। কিন্তু কেন যেন নিজের বাপ এবং মার প্রতি লালুর একটা পাগলাটে ভালবাসা ছিল। সে তার রোগা খিটখিটে সন্দেহপ্রবণ বাপকে ভালবাসত

া। মাঝে মধ্যে বাবা অফিস থেকে ফিরলে সে গিয়ে সন্ধ্যেবেলা তার দানবীয় হাতে পর গা হাত পা টিপে দিতে দিতে বলত,—আমি তোমার ভাল ছেলে, না বাবা ?

বাপ সতর্ক হয়ে ক্ষীণ গলায় বলত—আরো ভাল হ লালু। তোকে দেখে যে লাগে আমার !

—ভয় কি বাবা ! আমি ঠিক আছি। লালুর বাবা ক্ষীণ গলায় বলতেন—অত ারে দাবাস না—লাগে। চরিত্রটা একটু ঠিক রাখিস। বেড়ে উঠলেই হল না, বাড়ের ় আবার সংযম চাই।

লালু সেসব বুঝত না। তার শরীর সব সময়ে ছটফট করে—সে করবে কী ? ়জই সে বাবার কথায় আমল দিত না, কিন্তু লোকটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত।

কাজেই জ্যোৎস্না রাতে বাজারের পিছনের নির্জন চাতালে যখন তাকে মারবার গে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে গাল দিল ননী তখনই একটা মারাত্মক ভুল করল। গালাগালে হঠাৎ নিজের নিরীহ ছোটোখাটো বাবার চেহারাটা লালুর মনে পড়ল। কে গরম হয়ে গেল গা। সরে গেল সমস্ত জড়তা। সে ঘুরে তার হোঁৎকা হাতে লটের মতো একখানা ঘুঁষি ঝাড়ল ননীর মুখে।

তৈরি থাকলে এসব ঘুঁষি ননী সহজেই এড়াতে পারে। কিন্তু লালু সম্পর্কে র্ক হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। হোঁৎকাটা ভয়ে কাঁপছে দেখে নিশ্চিন্ত মনে একতরফা মারের জন্য তৈরি হচ্ছিল। আচমকা ঘুঁষিটা লাগল সেই সময়ে টা কোলবালিশের মতো চাতালে পড়ে গেল ননী।

'বাপ তুলে গালাগাল ! অ্যাঁ ? বাপ তুলে ?' বিড়বিড় করে বলতে বলতে লু ননীর লাশ টেনে তুলল এক হাতে, অন্য হাত মোটরগাড়ির পিস্টনের মতো লাতে লাগল। কোঁক কোঁক করে কয়েকটা শব্দ করল ননী, তারপর চুপ হয়ে গেল। ন্তু লালুর রাগ তখনো শেষ হয়নি। সে দুহাতে ননীর গলা টিপে ধরে বলছে নো—'আর বলবি ? আর বলবি কখনো ?'

লালু তখনো জানত না, তার হাতের চাপে ননীর গলার মেরুদণ্ডের দুটো হাড় ঙে গেছে, জিভ বেরিয়ে ঝুলছে, এবং অনেকক্ষণ ননী শ্বাস নিচ্ছে না।

বাজারের বন্ধ দোকানঘরের আড়াল আবডাল থেকে দৃশ্যটা দেখে হীরেন আর দলবল এসে জ্যান্ত লালু আর ননীকে আলাদা করল। হীরেনরা খুব খুশী। ন্তু লালুর বিপদ বুঝে বলল—তুই পালা। বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাক, কোথাও রাস্নি। আবডাল দিয়ে বাড়িতে ঢুকবি, পাড়ার লোকে যেন দেখতে না পায়।

লালুর ভয় ঢুকল আবার। নেংটি ইঁদুরের মতো পালাল সে। ঘরে শুয়ে শুনল সভ্যান আসছে যাচ্ছে। একটু রাতে বাজারের দিকটায় ননীর দলবল হুজ্জত ু করল। ঘরে শুয়ে কাঁপতে লাগল লালু।

কিন্তু ননী মরেই গেছে। কোনো ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে আর বে না। তার দলবলও খুব এককাট্টা ছিল না। দু'চারদিন হামলা হল, খোঁজা-ও হল, কিন্তু লালুর গায়ে হাত পড়ল না। বাজারের হীরেন আর তার দলবল

লালুকে আড়াল দিল কিছুটা। জুয়ার বোর্ডটা নিরাপদ করেছে লালু, কাজেই তা জন্য কিছু করতেই হয়।

লালু আবার রাস্তায় বেরোয়, হীরেনের আড্ডায় গিয়ে বসে, চোলাই খায়। তখ তার বিশ বছর বয়স।

পটাকে দেখে এখন আর বুঝবার উপায়ও নেই যে সে এক সময়ে কে বা কী ছিল কিন্তু লোকে তখনও বলে—পটা মাস্তানের মতো অমন ওস্তাদ আর হয় না। কিন্ কোন এক লীলারানীর কাছে ঘা খেয়ে পটা সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায় কিছুদিন লাইনের ওপারে ছোট্ট কালী মন্দির বানিয়ে রক্তবর্ণ পোষাক পরে পটা কিছুদিন খু সাধনভজন করে। সামাজিক দুষ্কর্ম সবই ছেড়ে দেয়। পটার দাপটে যারা ম্লা হয়ে ছিল এতদিন—এই ফাঁকে তারা উন্নতি করে ফেলল। পটা কালীসাধনা কর‍ে করতে আড়চোখে দেখল সবই। কালীর মুখের ওপর লীলারানীর মুখটা মাঝে মা ফুটে ওঠে। পটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে থাকে। মনটা খুব ছটফট করলে মা থেকে যার তার পাঁঠা ধরে এনে বলি দেয়। এইরকমভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছ পটা। এখন বয়স হয়ে গেছে। কালীমন্দিরটা নিয়েই পড়ে আছে সে। তবু একা চোখ তার সব সময়েই খোলা, পাড়ার দিকে নজর রাখে। কোন মাস্তান উঠছে, কে বা পড়তির দিকে। এটা তার অভ্যাস, ছাড়তে পারে না।

ননী মরে গেলে সে একদিন লাইন পেরিয়ে পাড়ায় ঢুকল।

লালুর আত্মবিশ্বাস এখন অনেক বেড়ে গেছে। তার শরীরটা হোঁৎকা হলেও ে কাজের তা সে বুঝতে পারে আজকাল। মারপিট, হুজ্জৎ লাগলে সে সবার আগ যায়। লোকে তাকে রাস্তা ছেড়ে দেয়।

মোড়ের মাথায় পটা ধরল লালুকে।

—শোন।

লালু একটু চোখ কুঁচকে পটাকে দেখে। খুব একটা আমল দিতে চায় না কিন্তু পটার রক্তবর্ণ পোষাক, উড়োখুড়ো চুল দাড়ি, রোগা শুকনো চেহারার মধ্যে এখনো এমন একটা কিছু আছে যাকে ঠিক উপেক্ষা করা চলে না। তাই লালু পটাকে আমল দেবে না করেও কাছে গিয়ে বলল—কিছু বলছ পটাদা ?

—বলছি। গায়ে অত মাংস কেন তোর ? ভারী শরীর নিয়ে কিছু করা না—বুঝলি ?

ব্যাঙের হাসি হাসে লালু, বলে—করা যায় না কি করে বুঝছো ?

পটা আধাখোলা চোখে একটু চেয়ে থেকে বলে—ননীকে সাফ করেছিস বলছিস ? ননী তৈরি থাকলে তোর মতো চারজনকে জমি নেওয়াতো। আলটপক মেরেছিস। তা সবসময়ে কি সেরকম হবে ?

বলে রোগা হাতখানা বাড়িয়ে পটা বলল—এই হাতখানা ধরে দেখ, পারবি।

লালু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার প্রকাণ্ড হাতখানা বাড়াল। পটা তার রোগা আঙুল দিয়ে লালুর পাঞ্জাটা ধরে আলতো চাপে মুচড়ে দিল একটু। ব্যথায় থরথর করে কেঁপে উঠল লালু। হাতখানা বুঝি কবজি থেকে ভেঙেই যায়।

—আহা, ছাড়ো ছাড়ো—

পটা মৃদু হাসে। ছেড়ে দিয়ে বলে—তাই বলছিলাম কি গায়ের মাংস আর একটু ঝরিয়ে দে। কারণ নিজের মাংস নিজের শত্রু। লাইনের ওপারে মায়ের মন্দির আছে আমার জানিস তো! সেখানে বিকেল-বিকেল চলে আসবি। তোকে তৈরি করে দেবো।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে রোগা শুকনো চেহারার পটাকে কয়েক পলক দেখে লালু। সে দেবী দত্তর আখড়ায় বিস্তর মাটি মেখেছে। যন্ত্রপাতি নেড়ে তৈরি রেখেছে শরীর, তবু এই রোগা দুর্বলা পটার হাতের ক্ষমতার কাছে সে ছেলেমানুষ: ওস্তাদ একেই বলে।

পটা হাসল আবার লালুর মুখ দেখে বলল—ননী চিরকালের গোঁয়ার, তার ওপর পয়সার লালচ। ওসব লালচ থাকলে মানুষ অন্ধ। নইলে তোর মতো আনাড়ির হাতে যায়?

লালু বুঝল যে সে এখনো আনাড়ি। মাস্তানীর বিষয়টি এখনো বিস্তর শিখবার আছে। তাই সে বিকেল বিকেল লাইন পেরিয়ে পটার মায়ের মন্দিরে যেতে লাগল।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন পটা কেবল নিজের ডানহাতটা মুঠো করে বাড়িয়ে দিয়ে বলত—মুঠো খোল।

পটার হাতের সেই মুঠো খুলতে সারা বিকেল প্রাণপণ চেষ্টা করে ঘেমে যেতো লালু। পারত না। বলত—কী দিয়ে তৈরি গো তোমার হাত পটাদা?

পটা হাসে, বলে—আজ যা, কাল আবার আসিস।

লালু সেলাম করে ফিরত। কিন্তু যাতায়াত বজায় রাখল সে। পটা শেখাতো। বলত—এসব কাউকে শেখাইনি বড় একটা। এখন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমার সঙ্গেই সব চলে যাবে, তাই ভাবছি তোকে দিয়ে যাই। কিন্তু দেখিস বাপু লালচ বেশী করবি না, কখনো কোনো মেয়েমানুষের কেস নিবি না, গুরুকে মনে রাখবি।

লালু মাথা নাড়ে।

তারপর একদিন লালু মায়ের বাড়িতে পুজো দিয়ে বেরিয়ে এল। ভারী খুশী সে।

বিশাল শরীর এবং যথেষ্ট হিংস্রতা নিয়ে লালু ঘুরে বেড়াতে লাগল। শরীরের মাংস অনেকটা ঝরে গিয়ে শরীরটা হাল্কা লাগে এখন। চলন্ত মালগাড়ির গা বাইতে পারে, টপকাতে পারে উঁচু দেয়াল। সবচেয়ে বড় কথা এখন আর টপ করে ভয় পায় না আগের মতো। পটা তাকে শিখিয়েছে, যখন হাঁটবি চলবি তখন চোখের মণি নড়বে ঠিক যেন দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম। হাঁ করে এক দিকে চেয়ে হাঁটবি না। চারদিক নজরে রাখবি। তাই রাখে লালু। দুখানা চোখ টক টক করে ডাইনে বাঁয়ে নড়ে তার, সব দিক নজরে রাখে। এখন তার জীবন বিপজ্জনক।

ওয়াগন-ভাঙা হিসেবে লালু বেশ নাম করল। হাইওয়েতে মাঝে মাঝে লরী বা

মোটর গাড়িও থামায় সে। পাড়ার বেশীর ভাগ দোকানদার তাকে খাজনা দেয় রোজগারপতি মন্দ না।

কিন্তু বিপদও আছে। ওয়াগন-ভাঙাদের পুরোনো দলটার সঙ্গে বিস্তর বোমাবা চলল কিছুদিন। পুরোনো দলটা ভেঙে যাচ্ছিল, লালুর দলটা তৈরী হচ্ছিল বোঝা যাচ্ছিল, দিনে কালে লালুর দলটাই দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু বিনা হুজ্জতে নয়

ঠিক দুপুরবেলা লালু পোটাপাড়ার ভিতর দিয়ে আসছিল। সেই সময়ে হঠ সে দেখল কে যেন সুইচ টিপে সূর্যটা নিবিয়ে দিল। এমন কি সুইচ টেপার ফু একটু আওয়াজও শুনতে পেল সে। অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ল রাস্তায়। তা গলায় সোনার চেনে বাঁধা বাঘনখ বেয়ে রক্ত পড়ছিল টপ্ টপ্।

হাসপাতালে তাকে দেখতে এল পটা। মাথায় বিরাট ব্যাণ্ডেজ নিয়ে পড়ে আ লালু। গুলিটা বের করেছে ডাক্তারেরা, কিন্তু তবু মাঝে মাঝেই মাথাটা অন্ধকা ডুবে যাচ্ছে। সেই আলো আঁধারির ভিতরে সে পটাকে দেখে ক্ষীণ গলায় প্রশ্ন কর —পটাদা, আমি মাইরি শেষ হয়ে গেলুম?

পটা গম্ভীরমুখে বলে—তোর একটা জিনিস নেই লালু। ওস্তাদ হতে গেলে জিনিসটা চাই-ই।

—কী সেটা।

—আর একটা ইন্দ্রিয়। আমি আগেই জানতাম তোর সেটা নেই।

—সেটা কী রকম জিনিস?

পটা একটু ভেবে উত্তর দিল—কী রকম যেন ঠিক বোঝানো যায় না। চোখ কা ছাড়া আর একটা জিনিস। আমার মাথায় ঠিক রুমালের মতো একটা জিনিস আছে সেটা সব সময়ে এদিক-ওদিক ঝাপটা মারছে। আমার চোখের আড়ালে কোথায় হচ্ছে না হচ্ছে তা ঝাপটা মেরে জানিয়ে দিচ্ছে আমাকে। কোন রাস্তা ঠাণ্ডা, কো রাস্তা গরম তা রাস্তা দেখেই আমি ধরতে পারি। মানুষের চোখের দিকে চেয়েই বুঝ পারি যে কোন লাইনের লোক। তোর মুশকিল হচ্ছে তুই তা পারিস না। তো শরীর আছে, কায়দাও জানিস, কিন্তু ও জিনিস তোর নেই।

ভারী হতাশ হল লালু। বলল—তা এখন আমি করব কী?

পটা বলল—তোর জখমটা ভাল না। মাথার চোট সারাজীবন জ্বালায়। নিজে হাতে তৈরি করেছি তোকে, একটা ভালমন্দ কিছু হলে বুকে লাগবে বড়। তার চে তুই লাইন ছেড়ে দে।

লালুর মাথা আবার অন্ধকার হয়ে গেল এই কথা শুনে।

বুড়োবয়সে লালুর বাবা-মায়ের একটা মেয়ে হয়েছিল। তার তখন পাঁচ ব বয়স। লালু তার এই রোগা টিঙটিঙে বোনটিকে ভাল করে লক্ষও কর কোনোদিন। হাসপাতাল থেকে ফিরে যখন কিছুদিন ঘরেই শুয়ে বসে থাকতে হ তাকে, তখন ছোটো বোনটি তার কাছে ঘুরঘুর করত। তার বিছানার কাছে ব গুটি খেলত, পুতুলের সংসার বসত খুলে। কখনো বা রান্নাবাটি খেলায় লালু

ত্ন করত। এইভাবেই মায়া জন্মায়। লালু ঘরবন্দী বলেই আরো বেশী মায়াট
ায়। তখনো মাঝে মাঝে মাথা অন্ধকার হয়ে যায়, একটা দিক ফাঁকা ফাঁকা লাগে
সময়ে। শরীরটা কাঁপে। নিজের জন্য ভারী একটা দুঃখ হয় তার। তখন সব
বার জন্য বোনের সঙ্গে রাজ্যের খেলনা নিয়ে বসে লালু। আস্তে আস্তে নিজের
ভুলে যায়। নিজেকে শিশুর মতোই লাগে তার।

তার দলটা দাঁড়িয়েই গেল। ওয়াগন ভাঙায় এমন ওস্তাদ দল বড় একটা হয়নি।
র ছেলেরা এসে লালুর টাকার অংশ বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে যায়, পরে তারাও
তে পারে, লালু শেষ হয়ে গেছে। বোনের সঙ্গে সারা দিন খেলে খেলে তার মুখ
খও একটা শিশুর মতো ভাব। তারা বুঝতে পারে, লালু আর নীচে নামতে
বে না।

সেটা লালুও বোঝে। বুঝে একদিন সে সব হিস্যার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল—
ম বসে গেছি রে। ও টাকা ছুঁতে আমার রাগ করে। তোরা ভাগজোখ করে নে।
তারা খুব একটা আপত্তি করল না। টাকা ফেরত নিল।

লালু একটা শ্বাস ফেলে বোনের সঙ্গে খেলায় ডুবে গেল আবার। সে এখন এক
য় লাফিয়ে এক্কা দোক্কা খেলতে পারে। হাত চিৎ উপুড় করে গুটি খেলতে পারে,
ুলকে পরাতে পারে কাপড়।

কিন্তু সেইসঙ্গে রোজগারও বন্ধ। সরকারী অফিসের টাকায় বাবা সংসার চালিয়ে
ছল কোনোরকম। কিন্তু রিটায়ারমেণ্টের সময় এসে গেল। লালুকে এখন আর
ন ভয় করে না কেউ, বাবাও না। একদিন বাবা ডেকে বলল—লালু তোমার
গতি ভাল হয়েছে, খুব সুখের ব্যাপার। কিন্তু রোজগারপাতির বুদ্ধি কই!
ু ভালমানুষীতে তো চলবে না।

লালু বুঝল। কিন্তু সে লেখাপড়া শেখেনি। পটা ওস্তাদের কাছে যা সে
খছে তা আর কাজে লাগাবার মতো ক্ষমতা তার নেই। তবু সে বোনের সঙ্গে
া ছেড়ে একটু-আধটু বেরোতে লাগল।

প্রথমেই গেল স্টেশনের গায়ের তাদের চায়ের দোকানটায়। দলের ছেলেরা
ানেই আসে।

সন্ধেবেলা। কয়েকজন বসে আছে। তাদের মধ্যে মাত্র দুজন—নীলু আর শানু
লুর চেনা—বাকী ক'জন নতুন। নীলু আর শানু খাতির করে তাকে বসাল।
নরা তাকে গ্রাহ্য করল না। এক দুইবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল।

লালু নীলুকে বলল—আমার কিছু টাকার দরকার নীলু, দোকান করব।

নীলু মন দিয়ে শুনে ভেবে বলল—ধার না হিস্যা?

লালু মাথা নাড়ে—ওসব না। কাজে নামব।

নীলু আবার ভাবে। অনেক ভেবে বলে—দল ঠিক আগের মতো নেই লালুদা।
লিসেরও হুজ্জত খুব। নতুন ছেলেরা এসেছে—তারা কাউকে বিশ্বাস করে না। তুমি
মতে চাও ভাল, আমি সবাইর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। কাল একবার এসো।

লালু গেল পরদিনও। নতুন ছেলেরা তার হোঁৎকা শরীরটা চেয়ে দেখল, নীলু গম্ভীরমুখে আড়ালে ডেকে বলল—তোমাকে নেবো। কথা হয়েছে। এখন দল বেড়ে গেছে অনেক, আমাদের হিস্যা বেশী থাকে না। পুলিসকে কত হয় তা তো তুমি জানই। আর একটা কথা, এখান থেকে ক্যাপিট্যাল বাগিয়ে পড়বে তা হবে না। এলে থাকতে হবে। ভেবেচিন্তে এসো।

কথাটা লালু ভাবল অনেক। ওয়াগনভাঙা কিছু শক্ত কাজ না। গাড়ি জ মতো দাঁড়ায়, পুলিসও বন্দোবস্ত মতো তফাতে থাকে। কেবল বন্ধ ওয়াগন মাল বের করা। কিন্তু ওই যে দল ওই দলটাই সাঙ্ঘাতিক। বহুকাল সে আ করে নি এখন বুঝে চলা কি সম্ভব। একটু এদিক-ওদিক হলে লাশ পড়ে য পটাদা কী একটা ইন্দ্রিয়র কথা বলত, যেটা তার নেই! সেটা নেই ঠিকই, তাই এ আধটু ভয় করে লালুর। গলায় সোনার চেনে বাঁধা বাঘনখটা মুখে পুরে ে কুঁচকে ভাবে। ভাবলেও কিছু সমাধান পায় না। মাথার ভিতরটায় এব এখনো জমাট অন্ধকার। সব সমস্যা গিয়ে সেইখানে সেঁধোয়। ভারী লাগে তার।

তবু নামে লালু। দুদিন তাকে কোনো কাজ দেওয়া হল না। দলের থাকল কেবল। তিনচারদিন পর গাড়ি থামতে দরজা খুলে অভ্যাস মতো উঠে লালু। পা দিল গমের বস্তায়। হাতে হাতলওলা সরু হুক। তার পিছনে তিনচারজন নতুন ছেলে।

ওয়াগনের ভিতর অন্ধকার। যার হাতে টর্চ সে কেন যেন টর্চটা জ্বালল অন্ধকারেই বিপুল একটা বস্তা টেনে তুলল লালু। পাকসাট মেরে দরজার ফেলল। নীচে থেকে কারো বস্তাটা ধরার কথা। লালু বস্তাটা ঝুলিয়ে ধরে নীচে থেকে কেউ তা ধরল না। কিছু বুঝবার আগেই ওয়াগনের ভিতরের অন থেকে হুক্-এর নরু অংশটা কে যেন সজোরে বসাল তার কাঁধে। ব্যথায় চে উঠল সে, হাতের বস্তাটা পড়ল প্রথমে, তার ওপর পড়ল সে, পিছন থেকে একটা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে। ভারী শরীর তার উঁচু। ওয়াগন থেকে বুদ্ধিভ্রংশ হয় সে কাঁধ চেপে বোকার মতো চেয়ে রইল কেবল। টলটলে রক্তে যাচ্ছিল তার হাত। ওয়াগনের ভিতর থেকে একটা তীব্র টর্চের আলো এসে তার মুখে। একটা গলার স্বর বলল আমরা নতুন লোক পছন্দ করি না লা কেটে পড়ো।

লালু সেই টর্চের আলোর দিকে চেয়ে বলল—কিন্তু নীলু যে বলছিল?

—নীলুও যাবে। তুমি পুরোনো লোক, দলটা তোমার হাতেই তৈরী—অ জানি। তাই তোমাকে জান-এ মারলাম না। পুরোনো লোক আমরা পছন্দ না। কেটে পড়ো।

লালু তার অন্ধকার মাথা দিয়েও ব্যাপারটা বুঝল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল— আমার হিস্যা?

—যে গমের বস্তাটা নামিয়েছো ওটা নিয়ে যাও।

বস্তাটা অবশ্য নিল না লালু। কিন্তু ফিরে গেল। আস্তে আস্তে ইয়ার্ড পার টপকাল রেলের লোহার বেড়া। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এল বাড়িতে। দিন আবার শিশুর মতো মুখ নিয়ে ঘুম থেকে উঠল সে। খেলতে শুরু করল ট বোনের সঙ্গে।

দিনসাতেক বাদে খবর পেল রেলে কাটা পড়ে নীলু মারা গেছে। শুনে একটু ঠরে উঠল সে। ছোটো বোন মিলু পাড়ার রাজ্যের ছেলেমেয়ে জুটিয়ে আনে, দের নিয়ে সারাদিন খেলে লালু। নীলু মারা যাওয়ার খবর পেয়ে সে সেইদিন দের নিয়ে বাড়ির উঠোনের করবী গাছের তলায় বনভোজন করল। বাচ্চাদের ল্লাড়ে মেতে রইল সারাদিন।

কিন্তু এভাবে চলে না।

দত্তদের গাড়িটা গতবছর বেচে দিয়েছে। গ্যারাজটা খালি পড়ে আছে। লালুর ইচ্ছে ওখানে একটা দোকান করবে মনোহারী দোকান। সামান্য কিছু টাকা হলে যায়।

সে বাবার কাছে টাকাটা চাইল প্রথমে। বাবা অবাক হয়ে বললেন—আমার ডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ভাঙবো? তোমার মাথা খারাপ। বুড়ো বয়সে আমাদের ওয়াবে কে? তার ওপর তোমার বোনেরও বিয়ের জন্য কিছু রাখতে হবে। রানীর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড তো বাপু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নয়! সামান্য দশ পনেরো রার টাকা— লালু বুঝল। বাবাকে সে এখনো ভালবাসে। যাদের সে ভালবাসে দের বিপন্ন মুখ দেখতে তার ভাল লাগে না।

একদিন সন্ধে পেরিয়ে শানু এসে হাজির। চুপি চুপি ডেকে নিয়ে বলল—লালুদা, করি বলো তো?

—কেন, কী হয়েছে?

—শোনোনি নীলু সাফ হয়েছে?

—শুনেছি।

—নতুন ছেলেরা আমাদের আর চাইছে না। নীলুকে রড মেরে লাইনে ফেলে খ মেরেছে। আমি পালিয়ে আছি।

লালু একটু ভাবল। বলল—শানু, আয় তোতে আমাতে একটা মনোহারী কান দিই।

শানু হাসল—তিন পয়সায় মাল কিনে পাঁচ পয়সায় বেচে দু পয়সা লাভ? দূর ব কি আমাদের পোষায়! অন্য কিছু হলে।

লালু কী বলবে ভেবে পেল না। কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছিল শানুর মাথার চুলে ক ধরেছে, জুলপী বেশ সাদা। যখন দাঁড়ায় তখন একটু কুঁজো দেখায় ওকে। নুর বয়স বেশী, লালুর চেয়ে অনেক বড়, লালু ওস্তাদ ছিল বলে তাকে দাদা ল ডাকে।

লাল্ মাথা নেড়ে বলল—লাইন আমার নয়। কিছু টাকা পেলে আমি দে দেবো।

শান্ বলে—টাকা পাচ্ছো কোথায়!

এই প্রশ্নটার উত্তর সহজে দিতে পারে না লাল্। ভাবে।

শান্ বলে—তুমি এখনো ওস্তাদ আছো। চলো, কিছু ক্যাপিট্যাল যে করি। পেলে আমিও ব্যবসাতে নামবো, অর্ডার সাপ্লাইয়ের।

বলতে বলতে শান্ তার কোমর থেকে একটা রিভলবার বার করে দেখিয়ে চোখ টিপল।

রিভলভার বিস্তর দেখেছে লাল্, নেড়েছেও অনেক। তবু এখন দেখে তার কেঁপে উঠল। বলল—রেখে দে। মিল্টা দেখলে ভয় পাবে।

চোখের পলকে যন্ত্রটা লুকিয়ে শান্ বলল—একটা কি দুটো বেশ করব, বেশী না। বিশ্বাস কর. ক্যাপিট্যাল হলেই কেটে পড়ব।

একটা শ্বাস ফেলে লাল্ বলল—তাই চল তবে।

নাগরমল ওয়াগন ভাঙিয়েদের পুরোনো খদ্দের। তার গদিতে রাত বি মাল পেঁছোয়। সকাল হতে না হতে বড়বাজারে তার পাইকারী আড়তে চলে মাল। নগদ কারবার স্টেশনের কাছাকাছি তাই তার একটা গদি আছে। সার ফাঁকা গদিতে একটা বাচ্চা ছেলে বসে মাছি তাড়ায়। ব্যবসা শুরু হয় রা অনেক রাত পর্যন্ত গদিতে আলো জ্বলে, ভিতরে নড়াচড়া করে লোকজন। ব অন্ধকারে বাতি নিবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দু তিনটে লরী। ওয়াগন ভাঙিয়েদের আছে বলে নাগরমলের তেমন ভয়ডর নেই। বাঁধা রেট-এর ব্যবসা। টাকা পয়সা নি বড় একটা গোলমাল হয় না। আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ গদিতে ক্যাশ পে যায়। ক্যাশের জন্য দারোয়ানও থাকে না। এগারোটা বারোটার মধ্যে হাত বদল হয়ে যায়।

লাল্ আর শান্ এক রাতে হানা দিল গদিতে। শানুর হাতে রিভলবার, ল হাতে রড। দুজনেই মুখে কালী মেখেছে রুমালে বেঁধেছে মুখ। এতকাল এইসব হুজ্জত করতে লালুর খুব ভয় করছিল বলে একটা দিশি মদের পাইট খেয়েছে দুজন।

নাগরমল একদম তৈরি ছিল না। লরীর ড্রাইভাররা এ সময়টা কাছে পিঠে না। লরী ভিড়িয়ে মাল টানতে খাল ধারে যায়। গদীতে নাগরমল নিজে দুজন নিরীহ কর্মচারী। এ সময়ে ঝাঁপ ঠেলে দুজন ঢুকল। নাগরমল দৃশ্য হাঁ করে রইল।

রিভলভারটা নেড়ে শান্ ক্যাশবাক্সটা দেখাল শুধু মুখে কিছু বলল নাগরমল হাঁ করে বাতাস গিলে ফেলল। তারপর লালুর বুকের সোনার

ধা বাঘনখটা দেখল সে। লালুর বিশাল চেহারাটার সঙ্গে বাঘনখটা মিলিয়ে খতেই কয়েক বছর আগেকার লালুকে মনে পড়ে গেল তার। বলল—আরে, রাম াম লালুবাবু, কী খবর? এ সব কী হচ্ছে? যাত্রাপার্টি নাকি!

লালুর বুকটা বড় চমকে ওঠে। চিনে ফেলেছে, নাগরমল। এখন আর উপায় ী? হয় এখন তিনটে লাশ ফেলে যেতে হয়, নইলে নাগরমলের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে আসা যায়।

এক সময়ে নাগরমলকে লক্ষ টাকার মাল দিয়েছে লালু। সেটা নাগরমল ভোলেনি।

বলল—কিছু ক্যাশকড়ি দরকার থাকে বলুন না? আপনার সঙ্গে তো অনেক বজনেস করেছি। এ সব ছিনতাই কি ভাল লালবাবু? আপনার নামে পাড়া াঁপত এক সময়ে—

তিনটে লাশ ফেলার জন্য ট্রিগারে হাত রেখেছিল শানু। কিন্তু বয়সকালে নানা চন্তা ভাবনা এসে যায়। বেপরোয়া হওয়া যায় না কিছুতেই। তারা দুজনেই াপোড়া গরু।

লালু হতাশ হয়ে বলল—কিছু ছাড়ো নাগরমল, ব্যবসা করব।

—কত?

—দু হাজার করে দুজন।

নাগরমল ভাবতে লাগল।

—ভেবো না। সময় নেই। শানু বলল।

নাগরমল শ্বাস ফেলে বলল—কাল দেবো। বাড়িতে বসে পেয়ে যাবেন। আজকের ক্যাশ গোনা আছে।

—না দিলে কিন্তু—

নাগরমল হাসে—আপনার সঙ্গে বেইমানী? আমার প্রাণের ভয় নেই?

পরদিন নাগরমল নিজেই টাকাটা পৌঁছে দিল। বলল—কাল আমার ড্রাইভার ক্লীনার আর কর্মচারীরা দেখেছে আপনাদের। তারাই বলেছে ওয়াগানব্রেকারদের। খুব হইচই হচ্ছে ওদের মধ্যে। একটু দেখবেন দাদা—ওরা ভাল না। নীলুবাবু মরল, শানুবাবু পালাল, আমাকেও ব্যবসা গুটোতে হবে।

লালু বুঝল। নাগরমল ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হচ্ছে। আর যেন লালু হানা না দেয়।

লালু টাকা নিয়ে বলল—এটা ধার হিসেবে নিলাম নাগরমল। শোধ দেবো ব্যবসা করে।

নাগরমল মুখের একটা ভঙ্গী করে বলল—যা বোঝেন। আপনার সঙ্গে তো অনেক বিজনেস করেছি। আপনি ভাল লোক।

দু হাজার নিয়ে শানু কাটল। বাকী দু হাজারে দত্তদের গ্যারেজটা ভাড়া নিয়ে মনোহারী দোকান খুলল লালু। দোকানে তার লজেন্স, বিস্কুট, চানাচুর, বেলুন

আর খেলনাই বেশী। পাড়ার বাচ্চারাই তার প্রধান খদ্দের।

লাভালাভের হিসেব রাখতে পারে না লালু। বেচে যায়। পাড়ার লোকে যাতায়াতের পথে লালুর দোকান দেখে থমকে দাঁড়ায়—দোকান দিলে নাকি হে?

এক গাল হাসে লালু—দিলাম। আমাকে একটু দেখবেন কাকা।

বেবী ফুড কোথাও পাই না, এনে দেবে নাকি! ব্ল্যাকের দামই না হয় দেবো।

লালু এইরকমভাবে ব্যবসা শুরু করল! মাল বেশী রাখে না, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য জিনিস ঠিক এনে দেয়। ব্ল্যাকের দাম নেয়। খুব আস্তে আস্তে সে টাকা পয়সার হিসেব বুঝতে শুরু করল। এখন বাচ্চারা দশ পয়সার চানাচুর চাইলে বড় ঠোঙা ভর্তি করে দেয় না। ছোটো মাপের ঠোঙা বের করে। ফাউ দেয় না। পয়সা গোনে। মাসের শেষে স্টক মেলায়। পাড়ার মধ্যে পান সিগারেটের একটা মাত্র দোকান, তার মালিক মদনা, কিন্তু মদনার ব্যবহার ভাল না, একটা মাত্র দোকান বলে দোকানটা চলে ভাল। দেখেশুনে লালু সিগারেটের একটা কাউণ্টার খুলল, মুদির দোকানের সওদা রাখল কিছু কিছু, অনেক কষ্টে বের করল বেবি ফুডের লাইসেন্স। ফলে দত্তদের গ্যারেজ ঘরে তার দোকানটা হু হু করে চলতে থাকে। মাসে শ তিনেক টাকা আয়।

মিলু এখন ইস্কুলে যায়। বাবা রিটায়ার করে বসে আছেন। বাইরের দিকের বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারে বসে সারা দিন খবরের কাগজটা উল্টে পাল্টে পড়েন। মায়ের চোখে ছানি আসছে। তবু মা সারাদিন ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। লালু মাঝে মাঝে বলে—মা, তোমাকে একজন রান্নার লোক রেখে দিই।

মা হাসে, বলে—রান্নার জন্য পাকা লোক চাই। স্বঘর, ভিন্ন গোত্রের একটা মেয়ে এনে দে দেখি!

লালু বড় লজ্জা পায়। গলার বাঘনখটা মুখে পুরে ভাবে।

পাড়ার গিন্নীবান্নিরা আগে লালুর দোকানে আসত না। তারা সভয়ে বলত—বাব্বাঃ, লালু গুণ্ডার দোকান? ওখানে মেয়ে মানুষ যায় কখনো? কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মত পাল্টায়। এখন পাড়ার বউ-ঝিরা আসে, আসে প্রৌঢ়ারা। লালু সবাইকে দিদি, মা, মাসী বলে ডেকে খুব খাতির করে।

সবচেয়ে বেশী ঝামেলা চাটুজ্জে খুড়ীকে নিয়ে। লালুকে তার আফিং এনে দিতে হয়। আফিং নিতে এসে চাটুজ্জে খুড়ী পাড়া জানান দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে—বিয়ে করছিস না কেন? তোর বাপ দাদা বিয়ে করেছে, সংসার শুদ্ধু লোক করছে. তুই করবি না কেন? ত্রিশ বছর বয়স হল না তোর! এর পর কি পাকা চুলে টোপর পরবি? বিয়ে না করলে বুড়ো বয়সে পাগলামিতে ধরে, জানিস না?

—বিয়ে করব খুড়ীমা, সময় পাচ্ছি কোথায়? একটু স্থিতু হয়ে নি।

—হ্যাঁ, ঢেউ সরে গেলে ডুব দিবি। বয়সকালটা মামদোবাজিতে কাটালি, এখন বুদ্ধিশুদ্ধি একটু হয়েছে—এইবারে কোথায় পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে বসবি, তা নয়, কেবল উড়বার মতলব। বউ না থাকলে আবার মামাদোদের খপ্পরে পড়বি কবে।

ভারী বিব্রত হয়ে সে তাড়াতাড়ি বলে—করব, শীগগিরই করে ফেলবো বিয়ে। র কটা বছর—মিলুটার একটা বিয়ে দিয়ে নি—

—ও মা, ও তো গুয়ের গ্যাংলা মেয়ে—ওর বিয়ে হতে হতে তোর বয়স বসে কবে ? পুলিপিঠের ন্যাজ বেরুবার আশায় বসে থাকো তবে—

কিন্তু সময় বাস্তবিক বসে থাকে না। মিলু স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে ঢুকল, দেখতে দেখতে ধাঁ করে বড় হয়ে গেল। চোখে চশমা, শাড়ি পরা মিলু দোকানের সামনে য়ে কলেজে যায়। বিক্রিপাট্টার ব্যস্ততার মধ্যেও চোখ তুলে লালু এক এক সময়ে খে মিলুকে। তার বুক ভরে যায়। ভাগ্য ভাল যে ভাইবোনের চেহারায় মিল ই কালো হোঁৎকা লালুর বোনটা ফর্সা আর ছিপছিপে হয়েছে। চেহারায় অমিল, ন্তু বড় ভাব দুজনে। দাদার ওই বিশাল শরীরটা যে খাটাখাটনীতে রোগা হয়ে চ্ছে তা একমাত্র মিলুই লক্ষ করে। গম্ভীর মুখে শাসন করে দাদাকে।

লালু ভাবে—এইবার মিলুর একটা বিয়ে দিতে হবে।

পাঁচ বছর পর।

এখন একা ঘরে লালুর বাস। শরীরটা তেমনি আছে তার। কেবল পেটে চর্বি মেছে একটু, মাথার চুল কয়েকটা পেকেছে। ছত্রিশে পা দিল সে। চোখে চশমা! লুর বিয়ের পর পরই প্রথমে বাবা গেল এক সকালে। সামনের বারান্দায় বসে জচেয়ারে খবরের কাগজ মুখে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর উঠল না। দু বছর পর মা। কা ঘরে একা থাকে লালু। ভাল লাগে না। দিন কেটে যায়।

লালু এখন পাড়ার ভাল লোক। লোকে বাকীতে জিনিস পায়, প্রশংসা করে। াকানটা বিলেৎ বাকী পড়ে ঝাঁঝরা হয়ে আসছে। লালুর তাতে কিছু যায় আসে সে একা। চলে যাবে।

বিকেলের ডাকে মিলুর একটা চিঠি পেল লালু। তাতে লেখা—একবার এসো। ব জরুরী দরকার।

বুকটা কেঁপে উঠল। মিলু বিয়েটা ভাল করেনি। নিজের পছন্দমতো বয় ছেছিল। ছেলেটা চোখা, চালু। কিন্তু মিলুর সঙ্গে মানায় না। গোত্র কিংবা ঠিকই ছিল, তবু ছেলেটা বড় বেশী চালু। বহু মেয়েকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। লাসকে তাই পছন্দ হয় না লালুর, কিন্তু মিলুর বর বলে সমীহ করে চলে। সময়ে তার বুকের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে—মিলুকে নিয়ে থাকবে তো বিলাস ? অন্য কে ঝুঁকবে না তো ?

দোকানের সামনে একটা টুল পেতে শানু বসে থাকে আজকাল। পঞ্চাশ প্রায় ল সে। তার অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটা জমেনি। জোড়াতাড়া দিয়ে চালিয়ে চ্ছে। বয়সের জন্য নয় চিন্তার ভারেই কুঁজো হয়ে গেছে একটু, বয়সের তুলনায় বেশ ড়া দেখায়। লালুর সঙ্গে বসে দুরন্ত যৌবনকালের নানা গল্প করে। মাঝে বলে—এ সব ঝিমোনো ব্যবসা কি আমাদের লাইন ? চল লালুদা, আর একবার ত বাধাই, লুটেপুটে আনি। শেষজীবনটা সুখে কাটিয়ে দিই চলো। আমাদের

আমলে এমন সোনার দিন আর আসেনি।

লালু হাসে। চুপ করে থাকে।

চিঠি যেদিন পেল সেদিনও শানু বসে আছে বাইরের টুলে। চিঠিটা ভাঁজ বুকপকেটে রেখে লালু উঠল শানুকে বলল—দোকানটা একটু দেখিস শানু, ঘুরে আসছি।

—চললে কোথায় ?

—মিলুটা চিঠি দিয়েছে, কী আবার গোলমাল ওদের।

শান্ত উদাস গলায় বলে—ওসব ছেড়ে দাও লালুদা, যে যার মতো চলুক সংসারের কোনো জ্ঞানই তো তোমার নেই।

—তা ঠিক। কিন্তু শানু সারা পৃথিবীতে ওই আমার একটা আপনজন।

শানু ভাবে। ভেবে বলে—সেটা সত্যি। ঠিক আছে। যাও।

বাইরের ঘরে উদাস শুকনো মুখে মিলু বসে আছে। তার হাঁটুর কাছে দু বছরের বাচ্চা মেয়ে জুলেখা। লালুকে দেখে হরিণীর মতো সচকিত তাকাল মিলু।

—কী হয়েছে মিলু ?

মিলু ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে সতর্ক করে দিল ইংগিতে শোয়ার ঘর দেখিয়ে বলল —ও আছে।

হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে এল লালুকে।

পায়ে পায়ে ঘুরছে ছোট্ট জুলেখা। তাকে কোলে নিয়ে গায়ের শিশুগন্ধ বুক ভরে নেয় লালু। তার শৈশব ফিরে আসতে থাকে।

কী হয়েছে ?

—সেই একই ব্যাপার। আমাকে ওর পছন্দ নয়। পরশু রাতে মেরেছে।

মেরেছে ?

—হ্যাঁ। এই প্রথম। কিন্তু এখন মারটা চলবে। হাত এসে গেছে।

রাগে বোবা হয়ে গেল লালু, কষ্টে বলল—মিলু তোকে কেউ কখনো মারেনি।

মিলুর ঠোঁট কাঁপতে থাকে। চোখ ভরে জল আসে।

—খুব লেগেছিল ?

মিলু মাথা নাড়ে। লেগেছিল।

—ও কী চায় ?

—কী জানি ! বলে মিলু কাঁদতে থাকে।

—ও তোকে চায় না ?

—না।

—তবে আমার কাছে চল মিলু। বেশ থাকবো ভাইবোনে।

—না। মাথা নাড়ে মিলু।

—তবে কী করবি ?

—সে জন্যই তো তোমাকে ডেকেছি। কী করব বল?

লালু একটা শ্বাস ছাড়ে। বলে—ওর সঙ্গে একটু কথা বলি।

জুলেখাকে নামিয়ে দিয়ে লালু ঘরে আসে।

বিলাস বিছানায় শুয়ে আছে। ভারী ক্লান্ত আর রোগা দেখাচ্ছে তাকে। বিমর্ষ মুখ।

—বিলাস।

—উঁ!

—কী হয়েছে?

বিলাস চোখ চায়। আস্তে করে বলে—ওকে জিজ্ঞেস করুন।

—করেছি। তুমি ওকে মেরেছো। কেন?

বিলাস ঠোঁট উল্টে বলে—ইচ্ছে।

— কেন মারবে? ওকে কেউ কখনো মারেনি।

—আমি মেরেছি। আমার ইচ্ছে। কার বাবার কী?

লালু থমকায়। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপে।

—তার মানে??

বিলাস উঠে বসে, একটা সিগারেট ধরায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে—শোধ নেবেন? নিন না! কিন্তু বলে রাখছি, ও আবার মার খাবে।

—না খাবে না।

—খাবে। কোনো শুয়োরের বাচ্চা ঠেকাতে পারবে না—

পলকে সব ভুল হয়ে যায়। ছত্রিশ বছর বয়স, চোখের চশমা—সব ভুল হয়ে যায়। পনেরো ষোলো বছর আগেকার এক জ্যোৎস্নায় আলোকিত নির্জন চাতাল মনে পড়ে কেবল। আর শরীরের মধ্যে ঝড় ওঠে বহুকাল বাদে।

প্রকাণ্ড হাতখানা বাড়িয়ে বিলাসকে শূন্যে তুলে নেয় লালু। অন্য হাত আঘাতের জন্য উদ্যত।

মিলু ছুটে আসে, চীৎকার করে বলে—দাদা, মেরো না। মরে যাবে।

হকচকিয়ে যায় লালু। ঠিক তো! এইভাবেই একদিন ননী গিয়েছিল তার হাতে। তারপরও পটা ওস্তাদের কাছে শেখা মার। কাজটা ঠিক হবে না। শিশুর মতো দু হাতে ধরে বিলাসকে আবার মেঝের ওপর ছেড়ে দেয় লালু।

কিন্তু বিলাস ছাড়ে না। পয়সা জমানোর একটা মাটির ঘট রাখা আছে তাকে। বিলাস প্রথমে পাগলের মতো সেইটে ছুঁড়ে মারে।

ভারী ঘটটা মাথায় লেগে চৌচির হয়ে ভেঙে যায়। লালুর সমস্ত শরীর বেয়ে পয়সার ধারা নেমে ঘরময় ছড়াতে থাকে। ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা সেই সঙ্গে। বিলাস ছুঁড়ে মারে জুলেখার খেলনা কালীর দোয়াত, পেপারওয়েট। তাতে খুশী হয় না। দু হাতে ঘুঁষি মারে লালুর মুখে, পেটে মারে লাথি। বিলাসের বাবার একটা ভারী বাঁধানো ফটোগ্রাফ ছিল দেয়ালে। রাগে পাগল হয়ে সেইটে টেনে আনে

সে। কানা দিয়ে উপর্যুপরি মারতে থাকে মাথায়, মুখে। কাচ ভেঙ্গে ঢুকে যায় লালুর মুখের চামড়ায়।

লালু ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে। তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বোজে। একটাও মার ঠেকাবার চেষ্টা করে না। জুলেখা চীৎকার করে দুজনের মাঝখানে এসে পড়ে, বিলাস তাকে হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে পাগলের মতো আবার আক্রমণ করে লালুকে।

তারপর এক সময়ে সে থামে। চারদিকে চেয়ে দেখে। তার চোখে আতঙ্ক দেখা যায়। সে লালুর রক্তাভ বীভৎস নিস্পন্দ দেহখানা দেখে। হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে কেঁপে ওঠে। দৌড়ে আলনা থেকে প্যাণ্ট টেনে নিয়ে পরে, গায়ে শার্ট চাপায়, খুব তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে।

সদর দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চেয়ে বলে— মিলু, মিলু আমাকে ক্ষমা কোরো—লক্ষ্মী সোনা আমার—

দাদাকে দু হাতে জাপটে বসে ছিল মিলু। পাথর হয়ে। তবু বিলাসের কথা তার কানে গেল। হরিণীর মতো সচকিত হয়ে উঠল সে। বিলাস—বিলাস কি তবে ভালবাসে তাকে? এখনো? চকিতে বিদ্যুৎস্পর্শে উঠে দাঁড়ায় সে। ছুটে আসে দরজায়।

বিলাস সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে। পালাচ্ছে।

—শোনো, শোনো। ডাকে মিলু।

বিলাস তার ভয়ার্ত সুন্দর মুখখানা ঘুরিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

দরজার চৌকাঠে হাত রেখে মিলু কাঁপতে থাকে, কাঁদে। অস্ফুট গলায় বলে— তুমি কি এখনো আমাকে ভালবাসো?

বিলাস দু ধাপ সিঁড়ি উঠে আসে, বলে—বাসি মিলু। চিরকাল বেসেছি। তুমি বোঝনা?

মিলু আস্তে করে বলে—তোমার ভয় নেই, দাদা মরেনি। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো।

বিলাস অবিশ্বাসের চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর মাথা নাড়ে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যায়।

ভাঙা কাচে আকীর্ণ মেঝের ওপর শিশু জুলেখা দাঁড়িয়ে। তার চোখে জল, সে কাঁদছে। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে লালুর দিকে।

ভাঙা, রক্তাক্ত মুখ তুলে লালু জুলেখাকে দেখল।

—আঃ জুলেখা চারদিকে কাচ মা, তোমার পা কেটে যাবে।

সে ফিস্ ফিস্ করে বলল।

জুলেখা তবু ভাঙা কাচ মাড়িয়ে এক পা এক পা করে আসছে।

চোখের রক্ত মুছে নেয় লালু। তারপর দু হাত বাড়িয়ে কোলে নেয় জুলেখাকে। শিশুগন্ধে তার বুক ভরে যায়।

—আঃ জুলেখা জুলেখা, আমার তেমন লাগেনি মা। কেঁদোনা। আমি ঘোড়া হই, তুমি আমার পিঠে চাপো।

লালু শিশু হয়ে থাকে। লালু শিশু হয়ে যায়। ভাঙা মুখ, রক্তাক্ত শরীর মাথার ভিতরে এক আংশিক অন্ধকার—তবু নিজেকে নিরভিমান লাগে তার। রাগদ্বেষ-হীন প্রকাণ্ড শিশুর মতো সে জুলেখাকে ভোলাতে থাকে। জুলেখাকে পিঠে নিয়ে আকীর্ণ কাচ খণ্ড, পয়সা, রক্তের ফোঁটার ওপর সে হামা দিয়ে ফেরে সারা ঘর। মুখে তার অনাবিল হাসি।

দরজায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা হাঁ করে দেখে মিলু।

লুল্লুর কপাল

লুল্লুর দোষ হয়েছিল, ঘটিটা দেখতে পায়নি।

লুল্লু যখন চেতন মাস্টারের ঘরে ঢুকল তখন অবশ্য মাঝরাত। বাইরে মাঘমাসের ঝড়বৃষ্টি শীত নামাচ্ছে। ভিতরে চেতনমাস্টার আর তার বউ লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমে ঘোর। কাজ সারবার পক্ষে একেবারে সোনায় বাঁধানো মওকা। খিড়কির দোর সকলেরই দুবলা থাকে। আহাম্মক গেরস্তরা দুটো পয়সা বেশি লাগবে ভয়ে কোন-দিন বাথরুমের জানলাটায় ভাল করে শিক বা গ্রীল লাগায় না। রান্নাঘরেও কিছু না কিছু রন্ধ্র থাকবেই। আর এসব থাকে বলেই এই ঘোর কলিতে লুল্লুর মতো লোকেরা খেয়ে পরে বেঁচে আছে। তোমার আছে, আমার নেই। তো তোমার যদি কিছু আমার ট্যাঁকে চলে আসে, উধারকা মাল যদি কিছু ইধার হয় তো ব্যাস, সিজিল মিছিল হয়ে গেল। যদি বেশি চিল্লামিল্লি না করো, মাথা ঠাণ্ডা করে যদি ভাবো, তো দেখবে, দুনিয়ায় এইভাবেও ভুখ্খা আর মালদারের একটা সমঝোতা হতে পারে। ভগবান চেতনমাস্টারকে হাত উপুড় করে দিয়েছেন। মালক্ষ্মী একেবারে খলবল করে হেসে বেড়াচ্ছেন চারধারে। চেতন মাস্টার যখন মাস্টারি করত তখন তার হাঁড়ির হাল যা ছিল তা ভদ্রলোককে কহতব্য নয়। বউয়ের গঞ্জনায় সাধু হয়ে একদিন শহরের বাইরে গিয়ে গোঁ ধরে বসে রইল চেতন। একখানা মস্ত নিম গাছের তলায়। বসে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, তার চারধারে কে যেন ইঁটের পর ইঁট গেঁথে তুলছে। দমবন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গেলে চেতন মাস্টার স্বপ্নটা নিয়ে খুব ভাবল। তার মাথায় সেই যে ইঁট ঢুকল তা আজও বেরোয়নি। এখন সে দু দুটো ইঁটখোলার মালিক। হু হু শব্দে পয়সা আসে। স্বপ্নাদ্য ওরকম একখানা নিদান যদি লুল্লুও পেত তাহলে সেও আজ গদির বিছানায় গ্যাঁট হয়ে লেপচাপা দিয়ে ঘুমোতে পারত। এই মাঘের শীতে যখন বাঘ পালায়, তখন তাকে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে পরের বাড়ির হুড়কো খুলে এত পেরাসনী পোয়াতে হত না।

মাথার দিকে স্টিলের আলমারি। অন্ধকারেও দিব্যি দেখতে পাচ্ছে লল্লু। রহিম ওস্তাদ পই-পই করে বলে দিয়েছে, আর কোথাও হাত দেওয়ার দরকার নেই। আসল মাল আলমারিতে আছে। পয়লা পাল্লাটা খুলতে গা ঘামাতে হবে না। তবে ভিতরে একটা জামাই-ঠকানো লকার আছে। সাফ হাতে কাজ করলে ওটাও জলের মতো কাজ।

তা বলতে নেই, লল্লুর হাত খুব সাফ, মগজও পরিষ্কার। খারাপ শুধু তার কপালটা। শেষ অবধি কিছুতেই কাজটা গছিয়ে উঠতে পারে না। রহিম ওস্তাদও বলে, তোর সব থেকেও যেন কী নেই। হতে হতেও তোর কেন যে হয় না।

লল্লুও সে কথা ভাবে। ভেবে ভেবে কূলকিনারা পায় না।

আলমারির দিক এগোতে গিয়ে তার মনে পড়ল, মাঠ গোসাঁইয়ের বাড়িতে সেবার একটা আঁতুড়ে বাচ্চা ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাতে না লাগলে জমির বাবদ আগাম পাওয়া মাধবের চার হাজার টাকায় আজ সে কতই মজা লুটতে পারত। তারপর, সাতকড়ি যে কুকুর পুষেছে সেটাই বা কে জানত? মাসটাক আগে সাতকড়ির দোতলায় উঠে সে কী ফ্যাঁসাদ। লাফ মেরে পালাতে গিয়ে পা মচকে কেলেঙ্কারি। ভানু শা-এর দোকানে এই তো সেদিন লল্লুর হাত গিয়ে পড়বি তো পড় ইঁদুর-ধরা কলে। কপালটা কি তার ভাল বলা যায়! চমৎকার পরিস্থিতি। বাইরে ঝড়জল। হাড়-কাঁপানো শীত। লেপের ওম-এর মধ্যে চেতন মাস্টার আর তার বউ। কে জানে, চেতন মাস্টার হয়তো এখন দুধের সর আর পাটালি গুড় দিয়ে পাঁউরুটি খাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। আর তার বউ স্বপ্নে বেয়ানকে নিজের গয়নার গল্প বলছে। কারোই এখন জাগার কথা নয়। চেতন মাস্টারের নাক ভালই ডাকে। তার বউয়ের শ্বাসটাও বেশ গাঢ়।

ভগবান কি তবে আজ লল্লুর কপাল থেকে পাথরখানা টেনে তুললেন? মালক্ষ্মী কি তবে লল্লুর বাড়ি যাওয়ার জন্য পা-তোড়া বেঁধে তৈরি হচ্ছেন? সিদ্ধিদাতা গণেশবাবার শুঁড় কি একটু সুরসুর করতে লেগেছে?

"জয় মা, জয় বাবা সিদ্ধিনাথ, জয় মাকালী" বলে লল্লু এক পা এগোলো। দু পা।

তারপরই ঘটাং করে একটা শব্দ। তারপর ছলাৎ আর কলকল।

লল্লু খুব অবাক হয়ে দেখল একটা ঘটি শুধু উল্টেই পড়েনি, শুধু জলই ছড়ায়নি, হারামজাদা ঘটিটা কাৎ হয়ে পড়ে গুড়গুড় করে দিব্যি গড়িয়ে বেড়াচ্ছে মেঝেয়।

কপালে থাকলে এই ঘটনাতেও গেরস্তর ঘুম ভাঙে না। সেবার ঝণ্টুর হাত লেগে কাচের গেলাস পড়ে ভেঙে খান খান হল, গেরস্ত লক্ষ্মী ছেলের মতো তার পরেও ঘুমোলো। গদাধর গামলা সমেত আছাড় খেয়েছিল রান্নাঘরে, তবু ননীগোপাল-বাবুর বাড়িশুদ্ধ লোকের কারও ঘুম কেন ভাঙল না? আর যদুর কাণ্ড তো আরও সরেস, সেবার পরেশনাথের বাড়িতে ঢুকে সবে কাজে হাত দিয়েছে, এমন সময় বাড়ি কাঁপিয়ে ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে উঠল। পরেশনাথের সেজো ছেলে কানু রাত

তিনটের ট্রেন ধরবে বলে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কপাল এমনই ভাল যদুর যে, সেই অ্যালার্মের শব্দে না কানু না আর কেউ চোখের পাতাটিও কাঁপাল। বরং পাশ ফিরে আরও আয়েস করে পাশবালিশ আঁকড়ে ভাল করে ঘুমোতে লাগল। আর যদু হাসতে হাসতে কাজ হাসিল করে বেরিয়ে এল।

লল্লুর কপাল তো অন্য সকলের মতো নয়। হারামজাদা ঘটি কি শুধু গড়াল? গড়িয়ে গড়িয়ে নির্ব্বংশার পো গিয়ে খাটের তলায় একটা লোহার তোরঙ্গে ঘটাং করে লেগে তবে থামল।

ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে।

আঁতকে বিছানায় উঠে বসল চেতন। তারপর "আঁ আঁ" করে তারস্বরে চেঁচাে লাগল। আর তার বউ একখানা জোরালো টর্চ ফটাস করে জেলে চোখ ধাঁধিয়ে দিে চেঁচিয়ে উঠল, কে রে? কী হয়েছে? ওগো…

লল্লু চোখ বুজে ফেলল নিজের ওপর লজ্জায় আর ঘেন্নায়।

ভেবেছিল, ইহজন্মে চোখ আর খুলবেই না। চোখ বুজেই পিছু হটে চৌকা ডিঙিয়ে দরদালানে পড়ল লল্লু। তারপর যে পথে ঢুকেছিল সেই পথেই বেরোবা উদ্যোগ করছিল। পালানোটা সোজা। এই ঝড়জলের রাতে কেউ পিছু নেবে না।

কিন্তু ঘর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ আসছিল একটা। আর চেতন মাস্টারের বউ "ওগে আমার কী হবে! কর্তা এমন করছে কেন? ওরে তোরা…" বলতে বলে একেবারে তীরের মতো বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

রাস্তাটা দিয়ে লল্লু ফের নিজের গা ঢেকে তখন বেরোনোর জন্য পা বাড়িয়েছে কিন্তু কপাল খারাপ হলে যা হয়। চেতন মাস্টারের বউ ধেয়ে এসে বস্তার কোনাট চেপে ধরে বলল, এই এই ছেলেটা! শিগগির আয়! কর্তা কেমন করছে। আয় তে একটু বাবা!

লল্লু এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল যে আর বলার নয়। এরকম অবস্থায় তো ে আর কখনও পড়েনি।

তা বলে লল্লু যে পালাতে পারত না তা নয়। বস্তার কোণাটা চেতন মাস্টারে বউয়ের হাত থেকে ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিতে পারত। চাইকি বস্তাটা গা থেকে ফেলে দিলেও হত। কিন্তু সেই সময় তার মনে হল, চেতন মাস্টার যে কেমন করছে তা নিমিত্তের ভাগী তো সে নিজেই। এখন যদি চেতন মাস্টার অক্কা পায় তবে সার জীবন বিবেকটা তাকে ছারপোকার মতো অহরহ দংশাবে।

আয় আয়। বলে চেতন মাস্টারের বউ টানছে লল্লু বিরক্ত হয়ে বলল, টানাটানি করবেন না! যাচ্ছি।

গিয়ে দেখল, অবস্থা সত্যিই গুরুচরণ। চেতন মাস্টার যাকে বলে খাবি খাচ্ছে চোখ দুটো বড় বড়, হাঁ করে শ্বাস টানছে, দু হাতে চেপে ধরে আছে বাঁ দিকে পাঁজর। অবস্থা দেখে লল্লুর হাত পা হিম হয়ে গেল। খুনটা সে নিজের হাতে

নি বটে, ভাল করে বিচার করলে এটা হয়তো খুনও নয়, তবে ভগবানের খাতায় লেখা হবে তাতো আর বোঝা যাচ্ছে না। সেখানে হয়তো লুল্লুর নামের পাশে জকের তারিখে একটা খুন জমা পড়ে যাবে।

ওগো, কী হল গো…বলে মাস্টারকে দুহাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছিল তার বউ আর চিয়ে কাঁদছিল। লুল্লু সভয়ে বলল, চেঁচাবেন না। লোকজন এসে পড়বে।

চেতন মাস্টারের হবু বিধবা তার দিকে আাই বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, কে সবে রে ড্যাকরা? বাড়িতে আছেটা কে? দুই ছেলে গেছে মাছ ধরতে রীপুর। মেয়ে গিয়ে বসে আছে তার মামার বাড়ি। চাকর গেছে বাবার অসুখ য়ে। আমার আর আছেটা কে এই বিপদে?

হক কথা জিজ্ঞেস করাটাই ভুল। লুল্লুও জানে বাড়িতে কেউ নেই। খবর রেই আজ হানা দিয়েছে কিনা।

চেতন মাস্টারকে খাবি খেতে দেখে লুল্লুর চোখ আপনা থেকেই ফের বুজে এল। নষ্টের গোড়া ওই ঘটিটাকে এখন পায়ের কাছে পেলে খুব একচোট লাথালাথি র নিত সে। চোখ বুজতেই সে ফের দেখতে পেল, ভগবানের খাতাটা তার চোখের মনে খোলা। একটা সাদা পাতায় পরিষ্কার গোটাগোটা অক্ষরে লেখা ঃ লুল্লু— টা খুন।

নাঃ চেতন মাস্টারকে মরতে দেওয়া চলে না। সারাটা জীবন একটা ছারপোকা ট্কুট করে কামড়ে খাবে।

নিশাপতি কবরেজের কাছে কিছুদিন সাকরেদি করেছিল লুল্লু। তবে তার। কোনও কিছুই হয়নি লুল্লুর। লেখাপড়া না, ব্যবসা না, কবরেজি না। কি সব ছেড়েছুড়ে এই যে রহিম ওস্তাদের দলে ভিড়েছে তাতেও তার সুবিধে না।

তবে নিশাপতি একবার বলাইবাবুর একটা মোক্ষম চিকিৎসা করেছিলেন। লুল্লুর র চোখে দেখা। বলাইবাবুর এখন তখন অবস্থা। বুকের মধ্যে কলজে ডানা টাচ্ছে।

নিশাপতি বলাইবাবুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে চোখের ডিম দুটো দু'হাতের বুড়ো ুলে আলতো টিপে ধরেছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বলাইবাবুর একটু াম হল।

ঘটনাটা মনে পড়তেই লুল্লু তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে চেতন মাস্টারের হয় হয় বাকে বলল, একটু সরুন তো।

চেতনের বউ তড়িঘড়ি সরে বসল। মানুষের আশার তো শেষ নেই।

যতদূর ভঙ্গিটা মনে পড়ল ততদূর, নিশাপতি কবিরাজের নকল করে হাঁটু গেড়ে লুল্লু দুই বুড়ো আঙুলে চেতনের দুই চোখের ডিম চেপে ধরল। আর বানদের যত নাম তার মনে পড়ল সব বিড় বিড় করে আউড়ে যেতে লাগল।

আর আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, মিনিট দুই যেতে না যেতেই চেতন মাস্টারে গোঙানি থামল। শ্বাসটা সহজ হয়ে এল। বুক থেকে হাত দুটোও নামল। চেত মাস্টার অস্ফুট স্বরে বলল, উঃ বাবা।

মন্দের ভাল। মুখে বোল ফুটেছে।

চেতনের বউ এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিল। এবার বলল, এখন কী?

লুল্লু খুব বিচক্ষণ কবিরাজের মতোই মাথা নেড়ে বলল, একটু সেঁক তা দিতে হবে। আর ডাক্তার ডাকলে ভাল হয়

দিবি বাবা অক্ষয় ডাক্তারকে একটু ডেকে? দুটো ছাতা নিয়ে যা। খবর পেলে আসবে। যা বাবা লক্ষ্মীসোনা আমার। আমি ততক্ষণে মালসায় একটু আগু করে আনি।

তা কপাল খারাপ থাকলে কত কী করতে হয়। লুল্লুকে গিয়ে অক্ষয় ডাক্তারে খবর দিয়ে আনতে হল। তারপর ফের ছুটতে হল ওষুধের দোকানে। পরাণ ঘো চেনা লোক বলে রাতবিরেতে ডিসপেনসারী খুলে ওষুধ দিল। চেতনও বেঁচে গে দিব্যি।

সকালবেলায় লুল্লু যখন বাড়ি ফিরল তখন নিজের মুখ দেখতে তার ইচ্ছে করছে না। ছিঃ ছিঃ। তবে একটা ভরসার কথা, ভগবানের খাতায় তার নামে পাশে যে খুনটা প্রায় লেখা হয়ে গিয়েছিল সেটায় ঢেড়া পড়ে গেছে। খু বাঁচোয়া।

সদর দিয়ে বাড়িতে ঢোকায় মুশকিল আছে। সকালের দিকটায় তার বাপ বারান্দা বসে পাটের দড়ি পাকায় আর বিড়বিড় করে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করে। লোকটা গলার মধ্যে গীতা, ভাগবৎ সব সেঁধিয়ে বসে আছে। নামকরা পুরুত ছিল। ব দুটো ছেলে ভাল কাজ বাজ করে। ছোটো লুল্লুই হচ্ছে বংশের কুড়াল। তাই বা আজকাল লুল্লুর মুখ দেখে না। কখনও দেখে ফেললে স্নান করে শুদ্ধ হয়। লুল্লু গমনাগমন তাই খিড়কি দিয়ে।

তার মুখখানা যে কেউই দেখতে চায় না তা লুল্লু জানে। আজও এ সংসা সে এক টি পয়সাও উপুড়হস্ত করেনি। তার ওপর বদনাম তো আর একটা নয় তবু এসে হাজির হলে গর্ভধারিণী মা তো আর ফেলতে পারে না। বাড়ি বেড়ালটাকে কুকুরটাকেও তো এঁটোকাঁটা দিতে হয়। তাকেও দেয়।

চারখানা গরম রুটি আর কুমড়োর ছেঁচকি লঙ্কা ঘষে যখন খুব তারি খাচ্ছিল সে, তখন মা একবার আলগোছে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, রাতবিরেতে যে ব ফিরিস-টিরিস না, চুরি-টুরি করতে যাস না তো?

কী যে বলো মা।

তোর বন্ধুগুলো তো সব ছোটোলোক।

তা বটে। তবে কিনা—

তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরিয়ে পড়। আজ আবার বাড়িতে কুটুম আসবে। তো

থাকার দরকার নেই।

যাচ্ছি যাচ্ছি। পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে যাই। একটু তেল দেবে?

স্নান করে বেশ হাল্কা লাগল লল্লুর।

ধোয়া জামাকাপড় পরে বেরোনোর সময় একটা কথা মনে হল লল্লুর। চেতন মাস্টারের বউ তাকে চিনে রেখেছে। কথাটা চট করে এ বাড়িতে হেঁটে চলে আসবে য়, লল্লু কাল রাতে চেতনের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল। আর শুধু তা-ই নয়, চেতন মাস্টারকে প্রায় যমের পাছ দুয়ার ঘুরিয়ে এনেছে সে। এ বাড়িতে এখনও লল্লুর জন্য খিড়কির দোরটা খোলা থাকে। সেটাও তাহলে ঠাস করে বন্ধ হয়ে াবে নাকের ওপর।

সমস্যাটার কথা রহিম ওস্তাদকে না জানালেই নয়।

সকালের দিকটায় রহিম ওস্তাদের মেজাজটা খুশ থাকে। খুদাতাল্লার দুনিয়াটা য কত ভাল তা এই ফজরের নমাজের পরই রহিমের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সত্য টে, দুনিয়া পাপে ভরে গেছে। দুনিয়ায় খুন খারাপী আছে, চুরি বাটপাড়ি আছে, মছে কথা বিশ্বাসঘাতকতা আছে, বাঁদরামি ত্যাঁদড়ামি আছে, জুয়া সাট্টা য়েমানুষের কারবার নেশাভাঙ ভেজাল কী নেই! তবু খুদাতাল্লার ওই ফিরোজা াশমান আর তার একধারে অলৌকিক সূর্যোদয়, পাখি পাখালির ডাক এই বেহান-বলায় রহিমকে যে কোথায় নিয়ে যায় তার ঠিকানা নেই।

উঠোনে একটা চারপাইতে কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে এই সময়টায় রহিম গেলাসে গেলাসে া খায় এক হাতে। অন্য হাতে একটা বাটি থেকে মুঠো মুঠো দানা তুলে সামনে ড়িয়ে দেয় আর তার একুশটা মোরগ ও মুরগী মহানন্দে ঠুকরে ঠুকরে খায়। রহিমের নটে বউয়ের একজন ঘর ঝাড়ে, একজন নাস্তা বানায়, একজন ছেলেপুলে সামাল য়। রহিমের আঠারোটা ছেলেপুলে কেউ পড়ার বই পড়ে, কেউ খেলে, কেউ কাঁদে। হিমের কোনও দিকে দৃষ্টি নেই, মন নেই, সারা সকাল বসে বসে সে সংসারের সীমানার াইরে খুদাতাল্লার দুনিয়াদারির কথা ভাবে আর মনটা ভারি সন্ত হয়ে যায় তার।

মুর্গীকে দানা, গরুকে জাবনা, বেড়াল বা কুকুরকে নাস্তার অবশেষ খাওয়াতে ড় ভালবাসে রহিম।

তার চেহারাখানা ছিপছিপে, জোরালো, তার চোখদুটো সাঙ্ঘাতিক তীক্ষ্ম। াড়িতে মেহেদী, চোখে সুর্মা, কানে আতরের তুলো। আর মুখে এক চমৎকার হাসি র্বদাই লেগে থাকে তার। ফজর যে সংসার-চিন্তার সময় নয়, ফজরে যে কোনও পাপ-ন্তা করতে নেই তা রহিম অন্তরে অন্তরে টের পায়। কিন্তু তারপর যখন বেলা হতে াকে, যখন মানুষ পেটের চিন্তা করতে শুরু করে, দিনটা যখন ঘুলিয়ে ওঠে, তখন ানুষকে কাজে নামতেই হয়। খুদাতাল্লার আশমান থেকে ঝম করে নেমে দাঁড়াতে য় শক্ত মাটিতে, প্রতিপক্ষময় দুনিয়ায়।

একটা বাঘা হাঁক ছাড়ল রহিম, হল রে ফতিমা ?

হচ্ছে জী !

হোক, তাড়া নেই রহিমের। খিদেটা চড়ে গেলেই মুশকিল। খিদেটা যখনই পায়, যখনই নাস্তাটা চাপান পড়ে তখনই রহিম খুদার হাত ছেড়ে মাটিতে নামে। ততক্ষণ এই এক স্বর্গীয় সুসময় সে সমস্ত দেহমন দিয়ে উপভোগ করে। এ সময়ে কেউ তাকে ঘাঁটায় না।

বাগানের বাঁশের বেড়ার ওপাশে বাসক ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা লোক সাবধানে উঁকি ঝুঁকি মারছে, ভিতরে আসতে সাহস পাচ্ছে না। লোকটা কে তা রহিম ওস্তাদ জানে। তার দলের সবচেয়ে অপদার্থ, সবচেয়ে বেওকুফ লুল্লু। কাজ বিলা করে এসেছে নিশ্চয়, দেখেও না দেখার ভান করল রহিম, আল্লার দুনিয়াটা যতক্ষণ ভাল লাগে লাগুক। তারপর পাপের দুনিয়ায় তো নামতেই হবে, ঘাঁটতে হবে নরকের পাঁক।

হল রে ফতিমা ?

হল জী।

ফতিমার হাতটি বড় চমৎকার। রান্নাটি করে যেন বাঁধিয়ে রাখার মতো। আর খাবারটি যে বেড়ে দেয় তাও ভারি পরিষ্কার হাতে। ময়দার পরোটা, ঝাল গড়গড়ে একটা চচ্চড়ি আর বাদাম কিসমিস দেওয়া হালুয়া।

খেয়ে বদনার জলে হাত ধুয়ে গামছায় মুখ পুঁছে রহিম পাপে ভরা দুনিয়াটার দিকে চেয়ে তার বাঘা গলায় হাঁক দিল, আয় রে !

মুখে অপরাধী হাসি, কোলকুঁজো হয়ে অপদার্থটা সামনে এসে হেঁহেঁ করতে লাগল। রহিমের ইচ্ছে হল একটা থাবড়া কষায়। কিন্তু ফজরটা এখনও পুরো কাটেনি বলে ক্ষমা করে দিল।

কি রে গেঁড়ে, এবারও হল না তো !

কথা আছে ওস্তাদ। সবটা আগে শোনো।

মেলা বকবি তো থাবড়া খাবি। দু-চার কথায় বল।

লুল্লু বব শেষে বলল, একটা ঘটি—বুঝলে ওস্তাদ, একটা ঘটিই আমার ঘাট হল। ঘটিটা যদি না থাকত—

রহিম ঘটির কথায় কাৎ হল না। গম্ভীর চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, তুই বাঁউনের ছেলে না ?

ব্রাহ্মণ তো কী ? এইবার দেখবে—

চোপ !

লুল্লু একটু চমকে উঠে চুপ মেরে গেল।

রহিম মাথা নেড়ে বলল, ও তোর ধাতে নেই। হবে না।

লুল্লু মলিন মুখ করে মোড়ায় বসে রইল। রহিম পাপে ভরা দুনিয়াটার কথা ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, যা, বাড়ি যা। তোর হবে না।

আমার কপালটাই খারাপ ওস্তাদ।

রহিম একটা হুংকার ছেড়ে বলল, খুদাতাল্লার দুনিয়ায় কোনটা খারাপ কোনটা ভাল কে বলতে পারে রে বেওকুফ? তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের পাতাটাও নড়ে না। সবই তাঁর মেহেরবাণী।

লুল্লু মলিন মুখ করে চলে গেল।

বেলা বেড়েছে। রোদ চড়া হয়েছে। সংসার এসে রহিমের হাত ধরে টানাটানি করছে। রহিম গা থেকে কম্বল নামিয়ে খাড়া হল।

জামিলা! এই জামিলা!

তার দু নম্বর বিবি জামিলা দৌড়ে এল।

রহিম তার দিকে চেয়ে বলল, আমি ফজরের নমাজ পড়েছি?

জী।

মুর্গীকে দানা দিয়েছি?

জী।

গাইকে জাবনা খাইয়েছি?

জী।

কাউকে তঙ করেছি?

জী না।

আমাকে পাপী বলে মনে হচ্ছে?

জী না।

আমি বিবি বাচ্চা সব ঠিক মতো দেখভাল করি তো?

জী।

আমি লোকটা কেমন?

ভাল জী।

যা মন্দ কাজ করি তা কিসের জন্য?

জী পেটের জন্য।

বহোৎ আচ্ছা, খুদা মেহেরবান।

খুদা মেহেরবান।

রহিম ওস্তাদ কাজে নামল। এখনই তার দলের লোকেরা রাতের রোজগারের ভাগা ওস্তাদের নজরানা নিয়ে আসতে শুরু করবে। সময় নেই।

তবে প্রতি দিন শুতে যাওয়ার সময় রাতে, আর কাজ শুরু করার সময় সকাল বেলায় দু নম্বর বিবির কাছে সে সব পাপ ও পুণ্যের কথা, খুদার কথা বলে নেয়।

বারান্দা পেরোনোর সময় রহিমের চোখে পড়ল, জল ভরা একখানা ঘটি, ঘটিটা দেখে লুল্লুর কথা মনে পড়ে গেল বলে রহিম খুব হোঃ হোঃ করে হাসল। বুদ্ধুটা ভাবে, ঘটিটাই যত নষ্টের গোড়া ছিল। আল্লা কি অত বোকা রে। যেখানে যেটা রাখার সেখানেই সেটা রাখেন। কেউ দেখতে পায়, কেউ পায় না।

হাসতে হাসতে রহিম ঘটিটাকে পেরিয়ে গেল।

*　　　*　　　*

লল্লুর মায়ের একগাল মাছি। গালে হাত দিয়ে বলে উঠল, বল কী গো মাস্টার বউ, লল্লু?

হ্যাঁ গো, লল্লুই।

ওম্মা, কোথায় যাবো? সেটা কি মানুষ? কর্তা যে তার মুখদর্শন করেন না।

তা তোমরা তার মুখের দিকে না তাকাবে তো তাকিও না। আমি কিন্তু তার মুখে ভগবানকে দেখেছি।

বোলো না গো মাস্টারবউ, ভগবান পাপ দেবে। পেটে ধরেছি বলে ফেলতে পারি না বটে, কিন্তু সে যে আমার কী গর্ভযন্ত্রণা।

তুমি মা হয়ে চিনতে পারো না, আশ্চর্য! আমি যে স্পষ্ট দেখলুম! কর্তার প্রাণটা ভোমরার মতো দেহ ছেড়ে বেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর তোমার ছেলে সেই প্রাণটাকে ধরে আবার আমার কর্তার শরীরে ঢুকিয়ে দিল।

লল্লুর মা ভাবতে বসল। মায়ের প্রাণ, ছেলের দিকে টেনেই ভাবতে লাগল, ভাবতে ভাবতে মনে হল, লল্লু বোধহয় ততটাই খারাপ নয়, যতটা ওর বাপ বলে বেড়ায়। নেশা ভাঙ নেই, তর্জন গর্জন নেই, পছন্দ অপছন্দ নেই, সর্বদা হাসিমুখ। মনটাও ভারি নরম।

তবু বলি মাস্টারবউ, আবার ভেবে দেখ। তোমরা স্বজাতি স্বঘর, লল্লুকে জামাই করবে সে তো হতেই পারে। কিন্তু আমার যে এ স্বপ্নেও বিশ্বেস হয় না।

আমি ঠিক করে ফেলেছি দিদি। আর কথা নয়। ছেলেটি আমায় দাও, আমি ঠিক মানুষ করে দেবো। আমি জানি ওর মধ্যে ভগবান আছে।

লল্লুর মায়েরও কথাটা অবিশ্বাস হল না। মাথা নেড়ে বলল, কী জানো, কথাটা আমারও মনে হয়। লল্লুর মধ্যে কী যেন একটা আছে। চুরিটুরি তো কেষ্টঠাকুরও কত করেছেন, তা বলে কি তিনি ভগবান নন?

তবে?

ঘণ্টাধ্বনি

সাঁঝবেলাতে গোয়ালঘরে ধুনো দিতে গিয়ে কালিদাসী শুনতে পেল, রামমন্দিরে খুব তেজালো কাঁসি বাজছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

গুণ্টু দুপুর থেকে বাড়ি নেই। আলায় বালায় সারাদিন ঘোরে। মাথা-গরম ছেলে। যখন তখন হাফ-পেণ্টুল খুলে পুকুরে ঝাঁপায়। চৌপর দিন জলে দাপাদাপি করে। কবে জলের ঠাকুর টেনে নেয় ছেলেটাকে! তবে ভরসা এই, গুণ্টুর প্রাণে ভক্তি আছে। সন্ধ্যে হলেই রামমন্দিরে গিয়ে বুড়ো বাজনদার আফিংখোর গোবিন্দর হাত থেকে কাঁসি কেড়ে নিয়ে নেচে নেচে বাজায়। ঐ বাজাচ্ছে এখন। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

কেলে গরুটার নাম শান্তি। ভারী নেই-আঁকড়া। কালিদাসীকে পেয়ে গলা এগিয়ে দিল। ভাবখানা—একটু চুলকে দাও। তা দেয় কালিদাসী। খানিকক্ষণ তুলতুলে কম্বলের মতো গলায় আঙুলের কাতুকুতু দিতে থাকে। অন্য গরু শিপ্রা ফোঁস ফাঁস করতে থাকে। শিং নাড়া দেয়। কালিদাসী বলে—রোসো মা তোমাকেও দিচ্ছি। এ মুখপুড়ীর আর কিছুতেই আরাম ফুরোয় না।

মন্দিরে আরতি হচ্ছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের এই সময়ে প্রায়দিনই ভাব হত। ভাব হলে হাত-পা টানা দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে মুখে গ্যাঁজলা তুলে নানা কথা বলত। সে সব কথা স্বয়ং ভগবানের। একবার কালিদাসীকে বলেছিল—ও কালী, ভুরের পায়েস খাব, এনে দিবি?

তা ভুরে গুড় দিয়েছিল কালিদাসী। একটু আধটু নয়, আধ মণেরও বেশী হবে। তাই দিয়ে সেবার বিরাট পায়েস ভোগ লাগানো হল মন্দিরে।

চক্কোত্তিমশাই এখন বয়সে পঙ্গু হয়ে টিনের চারচালার দাওয়ায় চৌকি পেতে বসে থাকে দিন রাত। তামাক খায়। সেজো ছেলে মনোরঞ্জন এখন মন্দিরের সেবাইত। কালিদাসীর এখন আর যাওয়ার সময় হয় না। প্রায়ই ভাবে একদিন গিয়ে বসে আরতি দেখবে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার গোয়ালঘরে কালিদাসীর ভাল করে ঠাহর হয় না কিছু। হাতে এগিয়ে গিয়ে খড়ের গাদা গোছ করতে হাত বাড়িয়েই মধ্যের আঙু কাঁকড়াবিছের হুল খেয়ে উঃহুঃ করে ওঠে।

ত্রিশ বছর আগে যখন প্রথম কাঁকড়াবিছের হুল খেয়েছিল কালিদাসী তখন যন্ত্রণা চোটে সে কি দাপাদাপি! হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। পুরো চব্বিশ ঘণ্ট সে বিষব্যথা থানা গেড়ে ছিল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে।

তারপর মাসটাক যেতে না যেতে ফের একদিন হুল দিল। আবার দাপাদাপি আবার হাসপাতাল। কিন্তু কাঁকড়াবিছেরা কালিদাসীকে সেই থেকে কেমন যে পে বসল। কাছে পেলেই হুল দেয়। এই ত্রিশ বছর ধরে মাসকে দু তিনবার ক দিচ্ছে। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন! তেমন লাগে না।

কালিদাসী টেমি রেখে খানিক কাঁচা গোবর বাঁ হাতের মাঝের আঙুলটায় বসা ঠিক যেমন গোলাপগাছের কলমচারার ডগায় লোকে গোবরের ঢিবলি দেয়।

কালিদাসীর শরীরটা কাঁকড়াবিছের বিষে ভরে গেছে। এখন বিষে বিষ হয়ে যায়।

আশ্চর্য এই বাচ্চা দেওয়ার সময়ে মেনী বেড়ালটা গোয়ালঘরে এসে ঐ খড়ে গাদায় বাসা বাঁধে। ফুলি কুকুরটা তো ফি-বছর খড়ের মাচার নিচে গর্ত করে চা পাঁচটা ছানা বিয়োয়। গরু দুটো সম্বচ্ছর এই ঘরে রাত কাটায়। এগুলো কোনো দিন হুল দেয়নি পোড়ারমুখোরা। মানুষের ওপর যত ওদের রাগ। আ মানুষের মধ্যে আবার সবচেয়ে ঘেন্নার হল ওদের কালিদাসী হতভাগী।

আঙুলে-গোবরে করে টেমি হাতে কালিদাসী গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এ কাঠের কপাটটা টেনে দিতে দিতে আপনমনে বকবক করছিল—ঝাঁটাখেকো, কেলেঘেন্ন খালভরাগুলো কোথাকার! কালিদাসীর কাছে বড় জো পেয়েছিস।

নিচেরতলার নতুন ভাড়াটে হেম ঘোষ, নতুন বিয়ে করেই মা-বাপ-ভাই ছে আলাদা বাসা করে উঠে এসেছে। তার বউ রেবা নাকি বড়ঘরের মেয়ে, কাজক করতে পারবে না। শ্বশুরবাড়িতে শুয়ে বসে থাকত বলে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগ বেঁধে পড়ল। হেম ঘোষ বউয়ের পক্ষে। বাড়ি ছেড়ে উঠে এল। চাকরি ত তেমন কিছু নয়। দাশনগরে এক তালা তৈরির কারখানায় চাবির খাঁজ কাটে ত্রিশ টাকার ঘর ভাড়াও দু মাস বাকি ফেলেছে। তবু বউয়ের সুবিধের জন্য স সময়ে কাজ করার বাচ্চা ঝি বহাল করেছে, তার ওপর ঠিকে কাজের লো তো আছেই।

দাওয়ায় বসে লুঙ্গি পরে হেম বিড়ি খাচ্ছিল। কালিদাসীর বকবকানি শু বলল—কি হল দিদিমা? কাঁকড়াবিছে কামড়াল বুঝি?

কালিদাসী বলল—তা কামড়াবে না কেন বাবা? কালিদাসী যে ভালমানুষে মেয়ে হয়ে শতেক পাপ করেছে।

হেম ঘোষ বিড়িটা ফেলে একটু তটস্থ হয়ে বলে—এ তো বড় মুশকিলের ক

হল দিদিমা ! এ বাড়িতে বড্ড দেখছি কাঁকড়াবিছের উৎপাত ! রেবাকে যদি কামড়ায় তো রক্ষে নেই ।

কালিদাসী মনে মনে বলে—বউকে তাজমহলে নিয়ে গিয়ে রাখো গে যাও। দেখালে বটে তোমরা বাপ ! আজকালকার রত্তি মেয়েরা কি করে যে গোটাগুটি পুরুষ মানুষগুলোকে হজম করে বসে থাকে।

ওপরের বারান্দায় উঠে আসতে আসতে কালিদাসী ফের মন্দিরের শব্দ শোনে। গুন্টু কাঁসি বাজাচ্ছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

টেমি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয় কালিদাসী। বুড়ো বয়সের ভুল। মন্দার মা বারান্দায় বসে উনুন সাজাচ্ছে, এক্ষুনি দেশলাই চাইবে। টেমিটা না নেবালে, দেশলাইয়ের কাঠি বাঁচত। ছাদে গিয়ে উনুন ধরাতে মন্দার মা না হোক চার পাঁচটা কাঠি নষ্ট করবে।

এ সবই কালিদাসীর জ্বালা। সংসারে আছে এক উড়নচণ্ডী ছেলে, আর মেয়ের ঘরের নাতি ঐ গুন্টু। তবু সংসারের হাজার চিন্তায় কালিদাসীর ডুবজল।

॥ দুই ॥

কানাই মাস্টারের আজ সারা দিন বড় হতভম্ব লাগছে।

এমনিতে কানাই বড় নিরীহ লোক। তিন বছর হল তার দশ বছর বয়সী ছেলেটা এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী প্রায়। শরীরের সব কটা হাড়ের জোড় বিষযন্ত্রণা। হাঁটু, কনুই, কব্জি সব ফুলে আছে। শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তারা ঠারেঠোরে বলেছে, ভাল হওয়ার রোগ নয়।

কানাই মাস্টারের একটাই ছেলে, আর মেয়ে দুটো। তার নিজের বয়স বেশী নয়, চল্লিশটল্লিশ হবে। কিন্তু এ বয়সেও বড় বুড়োটে মেরে গেছে কানাই। ছেলের চিন্তা উদয়াস্ত ভিতরটা কুরে খায়। তার ওপর ছটা টিউশানি করে রসকষ আরো মরে যাচ্ছে ক্রমে।

আজ হল কি, ইস্কুলের আট ক্লাসে থার্ড পিরিয়ডে ক্লাস নিচ্ছে। মদন নামে ধেড়ে ছেলে আছে একটা। তার গলায় আবার কালো তাগায় বাঁধা রুপোর তক্তি। রাঙামুলো চেহারা। কোনোকালে পড়াশুনোর ধার মাড়ায় না। পড়া জিজ্ঞেস করলে শুভদৃষ্টির সময়ে নববধূ যেমন চোখ নামায় তেমনি নতচোখে চেয়ে থাকে মেঝের দিকে। তার বাপ বড় কারবারি, তাই মাসকাবারে ইস্কুলের বেতন কখনো বাকি পড়ে না। সেই কারণে কেউ বড় একটা ঘাঁটায়ও না মদনকে। 'আছো মদন, থাকো মদন' গোছের ভাব করে সবাই তাকে এড়িয়ে যায়। প্রতি ক্লাসে তিন চার বছর করে থাকলে মদনের বাবদ ইস্কুলের একটা স্থায়ী আয় তো বহাল রইল। এমনিতে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে শতকরা ষাট সত্তরজনই ডিফলটার। কারো সাত আট মাসের বেতন বাকি পড়ে আছে। ধমক চমক করলে গারজিয়ানরা এসে হেডস্যারের হাতে পায়ে ধরে। সেই সব গারজিয়ানরাও দিন আনি, দিন খাই গোছের।

কেউ বিড়ি বাঁধে, কারো তেলেভাজার দোকান, একজন গামছা ফিরি করে ময়দানে। এই রকম সব। তাদের মধ্যে মদনের বাবা হচ্ছে নৈবেদ্যর কলা।

সেই মদনা ক্লাস এইটে পড়লেও তো আর ছেলেমানুষ নয়। বয়সে ডাক দিয়েছে। মোষ কালো শরীর জাম্বুবানের মতো বড় সড়।

বয়সের দোষই হবে। রোজই ইস্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে বীণাপানি ইস্কুলের মেয়েরা যায়। ইস্কুলের বড় ক্লাসের ধেড়ে ছেলেরা এই সময়টুকুতে রাস্তার মোড়ে, সামনের বারান্দায়, পাশের মাঠে জমে থাকে। কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট টানে, কেউ সাইকেলে করে বোঁ-বোঁ চক্কর মারে। যার যা আছে সব দেখায় মেয়েদের। হাসি টাসি তো আছেই। ছেলেদের এইসব বোকামি দেখে মেয়েদের কেউ কেউ হাসিতে ঢলাঢলি করে যায়, কেউ গম্ভীর মুখে দৌড়-হেঁটে পালায়, দু একজন 'জুতো মারব, লাথি মারব' গোছের কথা বলে শাসিয়েও গেছে। নিত্যিকার ঘটনা, কারো গায়ে লাগে না। আজ হল কি, থার্ড পিরিয়ডে যখন কানাই ক্লাস নিচ্ছে তখন টুকটুক করে একটা ফুটফুটে বছর দশেকের মেয়ে সোজা সরল পায়ে ক্লাশের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পাখির কণ্ঠে বলল মাস্টারমশাই!

কানাই অবাক। মেয়েটার পরনে ইস্কুলের সাদা ইউনিফর্ম, হাঁটু পর্যন্ত বাহারী মোজা। মুখচোখে ভারী তিরতিরে সুন্দর।

কানাই মাস্টার মুগ্ধ হয়ে বলল, এসো মা। কি হয়েছে বলো তো?

মেয়েটা ক্লাসে ঢুকে একটা ভাঁজকরা কাগজ কানাইয়ের সামনের টেবিলে রেখে বলল, মাস্টারমশাই একটা দুষ্টু ছেলে আমি ইস্কুলে যাওয়ার সময় আমার হাতে এটা দিয়ে বলল, এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পোড়ো। কি সব বাজে কথা লেখা আছে দেখুন। ঐ ছেলেটা। বলে মেয়েটি মদনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—

কানাই চিঠিটা খুলে দেখে তাতে লেখা—প্রীয়তম রোজী আমি তেমাকে ভালবাসে আমার মোনের কথা তুমী কী বুঝিতে পারো না? কীশ জানিবে। তেমার প্রীয় মদন।

চিঠির ওপর শ্রীকালী লিখতেও ভুল হয়নি।

কানাই দুটো কারণে চটে গিয়েছিল। এক তো মেয়েদের চিঠি দেওয়া সাঙ্ঘাতিক বেয়াদবি। তার ওপর এইটুকু একটা চিঠিতে এতগুলো বানান ভুল।

—তুমি এসো মা, আমি দেখছি। এই বলে কানাইমাস্টার রোজিকে বিদায় করে মদনকে ডাকল। যখন ডাকল তখনই একটা বেসামাল রাগ পেটের ভিতর থেকে উঠে আসছিল তার। সেই রাগে হাত থরথর করে কাঁপে, মাথাটা ঘোলা লাগে, দাঁতে দাঁতে বাতাস পেষাই হয়।

মদন কাছে আসতেই বিনা প্রশ্নে প্রথমে চুলের মুঠি করে মাথাটা নামিয়ে ঠক করে টেবিলে ঠুকে দিল কানাই। সেই সঙ্গে পিঠে যত জোরে সম্ভব এক কিল। বোঝা গেল মদনের চেহারাটা বড়সড় হলেও গা'টা নরম। কিলটা নরম চর্বির থাকে এমন পড়ল যেন জলে কিল মারবার মতো মনে হল।

মদন এমনিতে ঠাণ্ডা ছেলে, সাত চড়ে রা কাড়ে না। আজও কাড়ল না। তাতেই কানাইয়ের মাথাটা আরো বিগড়ে গেল। হারামজাদা, গিধধর, পাজি, বদমাশ নরাধম ঠিক নামতার মতো মুখে বলে যাচ্ছে কানাই আর মারছে। সে কি মার! মারের চোটে একবার গিয়ে দেয়ালে পড়ল, ব্ল্যাকবোর্ডে ফার্স্ট বেঞ্চের ডেস্কের কোনায় লেগে কপালটা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সমস্ত ক্লাশ পাথরের মতো নিশ্চল। শুধু সামনের ফাঁকা জায়গাটায় বেধড়ক ঠ্যাঙানি চলেছে তো চলেছেই। ডাস্টারটা দিয়েও কানাই মাস্টার মদনের চোয়াল, মাথা, কান ফাটিয়ে দিয়েছিল আজ।

এরকম মার বড় একটা দেখা যায়নি স্মরণকালে। আর কানাই মাস্টার নিজের ছেলের অসুখ হওয়ার পর থেকেই মারধর করা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকের ক্ষ্যাপা মার দেখে আশপাশের ক্লাস ফেলে মাস্টারমশাইরা ছুটে এসে দরজার কাছে ভিড় জমিয়ে ফেললেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে বা করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হেডস্যার এসে মাঝখানে পড়ে সেই আসুরিক ব্যাপার থামালেন। মদন তখন রক্ত মাখা মুখে, ফাটা ঠোঁট, ফোলা গাল ছেঁড়া চুল আর তোবড়ানো জামা-কাপড়ে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে স্যার, আমাকে মেরে ফেলুন স্যার! আমাকে মেরে ফেলুন স্যার! জুতো মারুন স্যার, আমি আজি সুইসাইড করব স্যার!

মদন এত কথা কখনো বলে না। মার খেয়ে আজ তার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল মার খাবার পরও তার চেঁচানি আব থামে না। কেবল কাঁদে আর আরো মারতে বলে, সুইসাইড করবে বলে চেঁচায়। নিজের ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে সে সারা স্কুলময় দৌড়াদৌড়ি করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

কানাই মাস্টারের কুপিত বায়ু যখন ঠাণ্ডা হল তখন সে মদনের আচরণ দেখে ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। ছেলেটার হল কি!

টিচার্স রুমে কানাই মাস্টারকে সবাই ধরে এনে পাখার তলায় বসিয়েছে। স্কুলের সামনে পাবলিকের ভিড় জমে গেছে। এই অবস্থায় মদন দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে মাস্টার মশাইদের পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে বলছে, লাথি মারুন স্যার জুতো মারুন স্যার। আবার উঠে গিয়ে আর একজনের পায়ে পড়ে ওরকম বলে।

হেডমাস্টারমশাই এসে কানাই মাস্টারের কানে কানে বললেন—ছেলেটার ব্রেনটা বোধ হয় ড্যামেজ হয়েছে। আপনি আর স্পটে থাকবেন না, বাড়ি চলে যান।

শুনে কানাইয়ের শরীর হিম হয়ে এল। আর বুকের কি ধড়ফড়ানি! শশী বেয়ারা রিকশা ডেকে দিল। কানাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই শয্যা নিয়ে রইল। সারাদিন ভাবছে—এ আমার আজ কী হয়েছিল? এ আমি করলাম কি?

বিকেলের দিকে একবার উঠে এসে নিজের ছেলের বিছানায় বসল কানাই। কৃশ করুণ মুখ তুলে ছেলেটা চাইল বাবার দিকে। একটু হাসল। সে হাসি কান্নার ওপরকার সরের মতো। বড় সহ্যশক্তি ছেলেটার। কত সহ্য করছে! কানাই ভাবে, ওর ব্যথাগুলো কেন আমার হয় না?

ভাবতে ভাবতে বিষের হুলের মতো মদনের কথা মনে পড়ে। বড় যন্ত্রণা হয়

বুকের মধ্যে। এত পাপ কি ভগবান সইবেন। মদনের যদি ভালমন্দ কিছু হয় তার কর্মফল কানাইকেও অর্সাবে। যদি সেই পাপ ছেলেটার ওপর এসে পড়ে?

বাইরে কে ডাকছে। কানাইয়ের বউ দিনরাত কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে আজ বড় রোগা হয়ে গেছে। চেনা যায় না। সে এসে বলল ইস্কুলের ছেলেরা এসেছে

বুক কেঁপে গেল। তবু নিজেকে শক্ত করে উঠে এল কানাই।

বড় ক্লাসের কয়েকটা ছেলে গম্ভীরমুখে বাইরে দাঁড়িয়ে। একজন মাতব্বর গো ছেলে বলল—স্যার, মদনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—হাসপাতাল! বলে কানাই হাঁ।

অন্য একটা ফচকে ছেলে বলল—আপনি ঘাবড়াবেন না স্যার। কয়েকটা ি পড়েছে মাত্র। আর কিছু নয়।

ছেলেরা চলে গেলেও হতভম্ব ভাবটা যায়নি কানাই মাস্টারের। ঘর ে কয়েকদিন না বেরোনোই ভাল। ছেলেগুলো নিশ্চয়ই ক্ষেপে আছে। কে কে থেকে আধলা ছুঁড়বে হয়তো। নাহলে ধরে ঠ্যাঙালেই বা কি করার আছে! সবে চিত্তির হয় যদি মদনের বাবা পুলিসের কাছে যায়। যায়নি কি আর! গো পুলিসও বোধ হয় এতক্ষণে রওনা হওয়ার জন্য কোমরের কষি বাঁধতে লেগে রক্তপাতে ফৌজদারি হয় সবাই জানে।

ছেলের মা এসে বলল, বাজারে যাও। তেল মশলা কিছু নেই।

শ্বাস ছেড়ে কানাই ওঠে। সন্ধের মুখে রামমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজে সঙ্গে ঠনাঠন কাঁসির আওয়াজ রোজ ভাল লাগে না। আজ লাগল। ঘণ্টা ডাকে

কানাই বেরিয়ে পড়ে। চোখে জল আসছে। বুকটা কেমন করে। কোনোক মন্দিরে যায় না কানাই মাস্টার। আজ ভাবল একবার যাবে। বুড়ো চক্কোত্তিমশাই সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। সবাই বলে, লোকটা খুব বড় মানুষ। একক তাঁর ভর হত। জিজ্ঞেস করবে—আমার পাপ কি ছেলেতে অর্সাবে ঠাকুর?

॥ তিন ॥

রেবার গানের মাস্টারমশাই এসেছে। লোকটা ছোকরা, তার ওপর গান শেখা এসব লোক বড় বিপজ্জনক হয়।

তাই প্রথম প্রথম গানের মাস্টার এলেই হেম গিয়ে ঘরে মোড়া পেতে বসে সব করত। গানের আড়ালে আবডালে দুজনের কোনো হেলন দোলন নজরে পড়ে কিন

একদিন রেবা ধমক দিল মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পর। বলল—সুরের ি বোঝ না, তবু সামনে গিয়ে অমন হাঁ করে বসে থাকো কেন বলো তো? তুমি সাম থাকলে আমার গাইতে বড় লজ্জা করে। আর কখনো ওরকম করবে না বলে দিচ্ছি

কপাল এমনিই যে হেমের বউ রেবা বেশ সুন্দরীই। সাদাটে রঙ, লম্বাটে গড় মুখখানা মন্দ নয়, তার ওপর চোখ দুখানা ভারী মিঠে। এমন করে তাকায় যেন সময়ে বড় অবাক হয়ে আছে। এইরকম বউ যার থাকে তার বড় জ্বালা।

হেমের আজকাল বার বার ডাইসে হাত পড়ে যায়। গরম লোহার ছ্যাঁকাও বিয়ের থেকে বড্ড বেশী খাচ্ছে হেম। কারখানায় কাজের সময়ে অন্যমনস্ক থাকলে আরো বিপদ হতে পারে। রেবার মতো সুন্দরী বউ জুটবে এমন ভরসা তার ছিল না ...নো, তবু কোন্ পুরুষ না বিয়ের আগে সুন্দরী বউয়ের কথা ভাবে। হেমও ...বত। কিন্তু এ জ্বালা জানলে বিয়ে বসবার আগে আর একবার ঠাণ্ডা মাথায় ...র দেখত সে।

বিয়ের পর একদিন হাওড়ার খুরুট রোডের কাছে সিনেমা দেখতে গেছে। টিকিট ...বার পর শো শুরু হতে দেরী আছে দেখে হেম রেবাকে নিয়ে লেমোনেড খেতে ...ল। রেবা লেমোনেড দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি খেল! রেবার বড়ি খাওয়ার ...টা হাঁ করে দেখছিল হেম। দেখতে গিয়ে এত মজে গিয়েছিল যে সে নিজেও ...র মতো ঘাড় উঁচু করে হাঁ করে বড়ি গেলার মতো ভাব করে ফেলেছিল নিজের ...ন্তে। তারপর যখন রেবা লেমোনেডের ঝাঁঝে মুখচোখ কোঁচকালো তখন তাই ...খ হেমেরও কোঁচকাল। আর এইসব হওয়ার সময়ে হঠাৎ দোকানের চওড়া আয়নায় ... হঠাৎ দেখতে পায় তিন চারটে বখা ছেলে রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে রেবার দিকে ...য় নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি বলাবলি করছে।

ভ্রু কুঁচকে খানিক চেয়ে থাকে সে। মাথা বিগড়ে গেল। সে গুণ্ডা নয়, কিন্তু ...ন মনে হয়েছিল, হলে ভাল হত। তার বৌয়ের দিকে নাহক লোক তাকাবে— ...মন কথা?

...লে ঢুকবার পর গণ্ডগোলটা পাকাল। সেই তিনটে ছোঁড়া একেবারে পিছনের ...। হেম ছবি দেখবে কি বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখছে। নিউজরীল ...য়ে ইণ্টারভ্যালের আলো জ্বলবার সময়ে দেখল, এক ছোকরা রেবার সীটের ...ন হাত রেখেছে। আর যাবে কোথায়!

—কিরকম ভদ্রলোক হে তুমি? ভদ্রমহিলার একেবারে ঘাড়ের ওপর হাত রেখেছো? ...বলে খেঁকিয়ে উঠেছিল সে।

ছেলেগুলো আচমকা ধমক খেয়ে প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপরই ...ড় ফুঁড়ে উঠে তারাও তড়পাতে থাকে—কে মেয়েছেলের ঘাড়ে হাত রেখেছে? ...নি তুমি-তুমি করে বলছেন কেন? অত ছুঁচিবাই থাকলে মেয়েছেলে সিন্দুকে ...র রেখে আসবেন। লেডীজ সীটে গিয়ে বসবেন এবার থেকে।

হেম হাতফাত চালিয়ে দিত ঠিক। রেবাই তাকে সামলায়। পরে বাড়ি ফেরার ...য় বলেছিল—ওরা কিছু তো করেনি, তুমি রেগে গেলে কেন?

রাগ যে কেন হয় হেমের তা কারো বোঝার নয়। এই জীবনটা এই রকম জ্বলে ...ড় যাবে।

ছোকরা গানের মাস্টার ঘরে সন্ধ্যের আলো জ্বালবার মুখটাতেই এসে হাজির। প্রায় দুপুর-দুপুর বেলা থেকে খুব সেজে বসে আছে। কোলে খোলা ...র খাতা নিয়ে বিছানায় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে তখন থেকে 'তৃষ্ণাতুরের কেউ

জল চায় কেউ বা 'সিরাজি মাগে' লাইনটায় সুর লাগাচ্ছে। হেমকে দেখে দেখছে না।

হেম ঘোষের গলায় এক সময়ে সুর ছিল। না ঠিক গানের গলা নয়। তা সিনেমা বা রেডিওর গান গুনগুন করতে করতে প্রায় সুরটা এনে ফেলত।

আচ্ছা, এমন হতে পারে না কি যে, হেম খুব গোপনে কোনো বড় ওস্তাদের কা গিয়ে গান শিখে খুব বড় গাইয়ে হয়ে গেল একদিন। রেবা টেরও পেল না এত কাণ্ড তারপর কোনোদিন হয়তো রেবার মাস্টার গান শেখাতে এসে সুর তুলতে গলদঘ হচ্ছে, এমন সময়ে সাদামাটা চাবির কারিগর হেম ঘোষ হঠাৎ সবাইকে চমকে দি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিখুঁত সুরে গানটা গেয়ে দিল! রেবা তখন যা অবাক হ তাকাবে না! সেই দিনই মাস্টারকে অহংকারের সঙ্গে বলে দেবে—আর আপনা দরকার হবে না প্রভাসদা। তারপর হেমের সঙ্গে যখন একা হবে রেবা তখন দুহা গলা জড়িয়ে ধরে হেমের কালো মোটা ঠোঁটে চুমো খেয়ে বলবে—তোমার ভিতর ক যাদু আছে বলো তো! তখন হেম খুব হাসবে। খুব হাসবে। একেবারে হেঃ হে করে পেট ভরে হেসে নেবে একচোট।

দাওয়ায় বসে খানিকক্ষণ এইসব ভাবল সে। ঘর থেকে গান আসছে, গোয়া থেকে মশা। আর শুকনো গোবরের গন্ধ। কাঁকড়াবিছের চিন্তাটাও বড্ড পে বসেছে হেমকে। চক্কোত্তিমশাই অনেক ওষুধ জানেন। দিনেকালে কত শক্ত রো ভাল করেছেন বলে শোনা যায়। একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে গিয়ে কাঁকড়াবি কামড়ালে কি ওষুধ দিলে আরাম হয় তা ফাঁকমতো জেনে আসবে হেম। রেবার খ সুখের শরীর, একবার বিষবিচ্ছুর কামড় খেলে ফুলের মতো শরীরটা নীলবর্ণ হ নেতিয়ে পড়বে না? ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

'...কেউ বা সিরাজি মাগে—এ-এ' গানের মাস্টারের ভরাট গলার সঙ্গে ডুয়ে রেবার কোকিলস্বর জড়ামড়ি করছে। সইতে পারে না হেম ঘোষ। বিড়িটা নি গিয়েছিল, আর ধরাতে ইচ্ছে হল না। ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরোবে।

হেমের পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। গেঞ্জির ওপর জামাটা চড়িয়ে নিলে হত। কিন্ এ সময়টায় ঘরে ঢুকতে সাহস হয় না। রেবা রেগে যাবে ঘরে ঢুকলে।

উঠোন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের গায়ে বেরোনোর দরজা। ঠিক দরজা চৌকাঠে মুখোমুখি কালিদাসীর ছেলে অভয়পদর সঙ্গে দেখা। অভয়পদর হাতে এব ঠোঙা ঝালমুড়ি। ঝালের চোটে শিস টানছিল। হেম ঘোষকে দেখে ঠোঙাটা এগিয়ে ধরল। হেম হাত পাতলে ঠোঙা উপুড় করে দেয় অভয়। তলানি মুড়িতে যত কুঁড়ে মিশে আছে। তাই মুখে ফেলে হেম ঘোষ বলে—খবর কি?

—আর খবর! অভয়পদ বলে—আজও মোহনবাগানের একটা পয়েণ্ট গেল।

হেম ঘোষ খেলার মাঠের খবর রাখে না। তবু অভয়পদকে তোয়াজ করবার জন বলল—এঃ হেঃ! একটা পয়েণ্ট চলে গেল?

অভয়পদর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাওড়ার বিখ্যাত মাতব্বর জ্ঞান সরকারে

সাকরেদ। জ্ঞানদা ওর মাথাটা খেয়ে রেখেছে। ঘুমে জাগরণে সবসময়ে ওর মুখে জ্ঞানদা আর মোহনবাগানের কথা। কবে জ্ঞানদা ডেকে অভয়পদর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করেছে, কবে যেন বলেছে—অভয়, আমার বাড়িতে একটা বাচ্চা চাকর ঠিক করে দিস তো', কবে হয়তো জ্ঞানদার গাড়িতে উঠে বড়বাজারের লোহাপট্টিতে গেছে এ সবই অভয়পদর বলবার মতো কথা। আজকাল অভয়পদকে দেখলেই লোকে সটকাবার তাল করে। কাঁহাতক জ্ঞানদার বৃত্তান্ত শোনা যায়!

হেম ঘোষের সেই ভয়। তবে কিনা অভয়পদর আর কোনো দোষ নেই। বরং জ্ঞানদার সাগরেদি করে সে চিরকুমার রয়ে গেছে, মেয়েমানুষকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে, লোকের বেবীফুড যোগাড় করে দেয়, ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে আসে পাঁচজনের। মড়া পোড়াতে যায়। বাড়ি ভাড়ার টাকা তুলে, দুধ আর ঘুঁটে বেচে মা কালিদাসী সংসারটাকে কষ্টেসৃষ্টে টেনে নেয়। নিষ্কর্মা অভয়পদ তাই বড় সুখে আছে।

অভয়পদ বলল—আজ একটা মিটিং আছে জ্ঞানদার বাড়িতে, বুঝলে? চা-টা খেয়েই বেরোবো।

—খুব ভাল। বলে হেম বেরিয়ে আসছিল।

মানুষ যে কেন খামোখা মিটিং করে মরে তা আজও হেম বোঝে না। যত সব ফালতু কারবার। দশটা মাথা এক হয়ে যত সব গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর।

সিঁড়ির মুখ থেকে অভয়পদ ফিরে এসে বলল—ও হেম, শোনো।

হেম ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। মিটিং-এর কথা না ফেঁদে বসে। ওসব কথায় বড্ড মাথা বিগড়ে যায় তার।

অভয়পদ গলার স্বর নামিয়ে বলে—তোমার বউ কি সিগারেট টিগারেট টানে নাকি! কাল রাতে ওপরের বারান্দা থেকে যেন দেখলুম উঠোনে রেবা সিগারেটে টান মারতে মারতে পায়চারি করছে!

কী কেলেঙ্কারী! হেমের ভিতরটা যেন লজ্জায় গর্তের মতো হয়ে যায়। কাল তখন অনেক রাতে তারা স্বামী-স্ত্রী জ্যোছনা দেখতে উঠোনের দিকে দাওয়ায় এসে বসেছিল একটু। এমনিতে হেম ঘোষ সিগারেট খায় না, রেবার চাপাচাপিতে ইদানীং খেতে হচ্ছে। কাল রাতেও খাচ্ছিল। সদ্য ধরানো সিগারেটটায় দু টান দিতে না দিতেই রেবা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল—আমি খাবো।

হেম অবাক। দেখে, রেবা দিব্যি ফসফস টান মারছে। কাশিটাশি নেই, চোখে জলও এল না ধোঁয়ায়। বলল—আগে খেতে টেতে নাকি?

—কত! বাবার প্যাকেট থেকে চুরি করে অনেক খেয়েছি। বেশ লাগে।

বলে রেবা সিগারেট টানতে টানতে উঠোনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে সময়ে ...ড়ির কারো জেগে থাকবার কথা নয়। তারাও কিছু টের পায়নি। রামচন্দ্র হে! ...য়পদ দেখে ফেলেছে তবে!

হেম ঘোষ হেসে আমতা আমতা করে বলে—ঐ শখ করে দুটো টান দিয়েছিল ...কি! তারপর কেশে-টেশে ফেলে দেয়।

অভয়পদ আদর্শবাদী লোক। মুখটা কেমনধারা করে বলল—দেশটা যে একেবারে সাহেব হয়ে গেল হে হেম! ভারতবর্ষের কত সম্পদ ছিল!

কথাটা ভাল বুঝল না হেম। অভয়পদও বুঝিয়ে বলল না। চলে গেল।

রেবাকে সিগারেট খেতে অভয় দেখেছে, লজ্জা শুধু সেজন্যই নয়। হেম ঘোষ আর একটা কথা ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে জিভ কাটল। কী কেলেঙ্কারী! কাল জ্যোছনায় তাদের দুজনেরই বড় রস উস্কেছিল। নিরিবিলি, নিশুতি জ্যোছনায় পরীর মতো বৌটাকে দেখে খুব দুচারটে দেহতত্ত্বের কথা হেসে হেসে বলে ফেলেছিল হেম। রেবাও দুচারটে ভাল টিপ্পুনি ঝেড়েছিল। দোষের কথা নয়। স্বামী-স্ত্রী একা হলে এরকম কত কথা হয়! কিন্তু সেসবই যে শুনে ফেলেছে অভয়পদ! কী লজ্জা! কী লজ্জা!

এই জিভ কাটা অবস্থায় হেম ঘোষ যখন দাঁড়িয়ে ঠিক তখনই এক জোড়া মাঝ-বয়সী স্বামী-স্ত্রী ভুঁই ফোঁড়ের মতো তার সামনে কোথেকে হাজির হয়ে আচমকা বলল—আচ্ছা মশাই, গুণ্টু কি বাড়িতে আছে?

আর এক দফা লজ্জা পেয়ে হেম বলে—না, সে মন্দিরে কাঁসি বাজাতে গেছে।

।। চার ।।

গুণ্টু যখন কাঁসি বাজায় তখন সে নিজেই শব্দ হয়ে যায়। ব্যাপারটা কিরকম হয়, কাঁসি বাজাতে বাজাতে শব্দটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। কাঁইনানা কাঁইনানা হয়ে বাজতে বাজতে কানে তালা ধরে আসে, শরীর ঝিমঝিম করে। তারপর শব্দটা যেন তার চারধারে লাফাতে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে বহুদূর চলে যায়। আবার ফিরে আসে। তারপরই সে পরিষ্কার টের পায় শব্দটা আকাশ বাতাস সব হাঁ করে গিলে ফেলল। প্রকাণ্ড হয়ে গেল। দুনিয়াভর হয়ে গেল। আকাশভর হয়ে গেল। তারপর আর গুণ্টু নিজেকে টের পায় না। বড় মজা হয় তখন। গুণ্টু শব্দ হয়ে যায়।

মাস দুই আগে চৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাগানে গুণ্টু পেয়ারা চুরি করতে ঢুকেছিল। দুপুর বেলা। কোথাও কিছু না, হঠাৎ একটা শিরীষগাছে এক হনুমানকে দেখতে পেল সে, বুকে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে।

যে কোনো কিছুকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়া গুণ্টুর স্বভাব। বে-খেয়ালে কত সময় কত মারাত্মক জায়গায় ঢিল ছুঁড়েছে সে। চলন্ত গাড়ির হেড লাইট ফাটিয়েছে একবার, রাস্তার আলো ভেঙেছে কতবার, জ্ঞান সরকারের বাইরের ঘরের দেয়ালঘড়িটা রাস্তা থেকে ঢিল ছুঁড়ে ভেঙেছিল।

সেই স্বভাববশে হনুমানটার দিকেও খামোখা একটা মুঠোভর ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল। হনুমানটার তেমন লাগেনি তাতে। কিন্তু হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সেটা হড়হড় করে গাছ থেকে নেমে এসে তাড়া করল গুণ্টুকে। গুণ্টু দৌড়, দৌড়। জংলা

বাগানটার মাঝ বরাবর পুরোনো পুকুর তাতে সবুজ শ্যাওলা থিকথিক করছে, বড় বড় মাছ। অন্যদিকে পথ না পেয়ে গুণ্টু সেই পুকুরে ঝাঁপ খায়।

গুণ্টু সাঁতরায় ভালই। কিন্তু ত্যাঁদড় হনুমানটার জ্বালায় কিছুতেই আর জল ছেড়ে উঠতে পারে না। যেদিক দিয়ে উঠতে যায় সেদিকেই সেটা গিয়ে হুপ হুপ করে হাঁক ছাড়ে। সেই হাঁক ডাকে আরো কয়েকটা হনুমান কোত্থেকে এসে জুটল। থৈথৈ জলের মধ্যে গুণ্টুকে সারাক্ষণ হাত পা নেড়ে ভেসে থাকতে হয়েছিল। ফুলে পচা আঁশটে গন্ধ, শ্যাওলার লতা বারবার পায়ে হাতে জড়াচ্ছে, বড় বড় জাহাজের মতো মাছ মাঝে মাঝে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘষটে যাচ্ছে। কয়েকবার লেজের ঝাপটা খেল। এক হাত তফাৎ দিয়ে সাঁতরে চলে গেল একটা জলঢোঁড়া। পায়ের বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ডুব দিয়ে বহুবার থৈ খুঁজে পেল না গুণ্টু। তার কচি বুকে দম বেশী ছিল না তো। তাই এক সময়ে হঠাৎ চোখের সামনে সূর্য নিবু নিবু হয়ে গেল, বুকে বাতাসের টান, হাত পায়ে খিল। সে তখন বিড় বিড় করে বলেছিল—আমি যে রোজ সন্ধ্যেয় তোমার মন্দিরে আরতির সময়ে কাঁসি বাজাই!

তারপরই হঠাৎ যেন এক পাতালপুরীর হাত এসে গুণ্টুকে টেনে নিল জলের তলায়।

সেইখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। মরলে তো সবাই তাঁর দেখা পায়। গুণ্টু গিয়ে দেখে আরেব্বাস। সেখানে পেল্লায় চৌকি পেতে বুড়ো চক্কোত্তিমশাই বসে তামাক খাচ্ছেন। তাকে দেখে বলে উঠলেন—গুণ্টু রাজার গালে হাত! গুণ্টু রাজার গালে হাত! গুণ্টু রাজার গালে হাত।

তা গালে হাত দেওয়ারই দাখিল। যা অবাক হয়েছিল। তবু গুণ্টু চক্কোত্তি-মশাইকে অচিন জায়গায় পেয়ে ভারী খুশী। প্রণাম করে ফের ভাল করে তামাক সেজে দিল। চক্কোত্তিমশাই বললেন—তা শব্দ হওয়া ভাল। দুনিয়াটা হলই তো শব্দ থেকে। যেখানে সেখানে ভাল করে যদি শুনিস তো দেখবি, দুনিয়ায় সব শব্দ। তুইও শব্দ, আমিও শব্দ। মনে করিয়ে দিস, তোকে ভাল দিন দেখে একটা শব্দ দেবোখন। সে এমন শব্দ যে কাঁসির শব্দ তার কাছে কোথায় লাগে। এখন যা।

ডোবার আধঘণ্টা পর গুণ্টু ফের ভেসে উঠেছিল। পেটে জল, মুখে গাঁজলা, চোখের মণি ওল্টানো, জ্ঞান নেই, মৃত্যুক্ষীণ নাড়ী চলছে কি চলছে না। তাই দেখে হনুমানগুলো এমন হাল্লাচিল্লা ফেলে দিয়েছিল যে, চৌধুরী বাগানের বুড়ো মালী এসে পড়েছিল দুপুরের ঘুম ভেঙে। সেই তোলে গুণ্টুকে। পেটের জল বার করে সেঁক তাপ দেয়। ডাক্তারবদ্যি করতে হয়নি, হাসপাতালেও যেতে হয়নি। কেউ তেমন টেরও পায়নি ঘটনা।

বেঁচে গিয়ে তেমন অবাক হয়নি গুণ্টু। কেমন করে যেন মনে হয়—মরলেই হল আর কি! চক্কোত্তিমশাই সব জায়গায় পাহারা দিচ্ছে না! যেখানেই যাও গিয়ে দেখবে ঠিক বুড়ো মানুষ আপদবিপদের দোর আগলে চৌকি পেতে বসে তামাক খাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

রাম মন্দিরে আরতির সময় এখনো বেজায় ভিড় হয়। নতুন ঠাকুরমশাই আরতিও করেন ভাল, তবে কিনা চক্কোত্তিমশাইয়ের আরতি যারা দেখেছে তাদের চোখে অন্য কিছু আর লাগে না। তবু অভ্যাসবশে মানুষ এসে দাঁড়ায় খানিক।

এখান থেকে চারচালাটা বেশী দূরে নয়। নাটমন্দিরের পর একটা মাঠ, তার একটা কাঁচা রাস্তা, সেটা পেরিয়েই বাগানের বাঁশের বেড়ার গায়ে কাঠের ফটক কয়েকটা ফুল গাছের ঝোপ, জোনাকি পোকার আলো, একটু অন্ধকার। খোলা দাওয়ায় একটা চৌকি পাতা, সাদা বিছানা, মেঝেয় চটি জোড়া নিখুঁতভাবে রাখা একপাশে গড়গড়া। বিছানায় চক্কোত্তিমশাই দুটো বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে থাকেন গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ হয়।

আউন্তি যাউন্তি মানুষজন দু দণ্ড দাঁড়ায় এসে সামনে। বলে—চক্কোত্তিমশাই মন্দিরের পুজোয় আর যে যান না!

বুড়ো মানুষটি একগাল হেসে বলেন—রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মেয়েরা ততদিন এ পুতুল খেলে যতদিন বে না হয়। বিয়ে করে আসল ঘরসংসার পেলে আর খেলে কে রে?

লোকে একটু আধটু বোঝে না যে তা নয়।

গুণ্টু বোঝে। আরতির পর গুণ্টুর অনেকক্ষণ সাড় থাকে না। মগজে তখ কেবল ঘণ্টার শব্দ, কেবল কাঁসির আওয়াজ।

একদিন বলে ফেলেছিল গুণ্টু—আরতির পর আমি এক অন্যরকম ঘণ্টার শব শুনি। সে আওয়াজ মন্দিরের নয়, অন্য জায়গা থেকে আসে।

চক্কোত্তিমশাই সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—খুব মনপ্রাণ দিয়ে শুনবি কাউকে বলিস না।

গুণ্টুর মায়ের কথা মনে নেই। সে মায়ের পেট থেকে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার মা মারা যায়। সেই থেকে সে দিদিমার কাছে। তার বাবা আবার বিয়ে করেছে। মাঝে মাঝে ঝাড়গ্রাম থেকে বাবা তাকে দেখতে আসে। ভারী নিরীহ ভীতু মানুষ, দ্বিতীয় পক্ষের দাপটে ইঁদুর। দ্বিতীয় পক্ষ আসতেও দেয় না ক একটা। কিন্তু বাবা এলে গুণ্টুকে দেখে ভারী খুশী হয়। এক গাল হাসে, ব বড় চোখে হাঁ করে এমনভাবে দেখে যেমন লোভী লোক খাবারের দোকানে দিকে চায়।

বাবা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—বলো তো বাবা, তোমার কে কে আছে?

গুণ্টু ভেবেচিন্তে বলেছিল—দিদিমা, মামা আর চক্কোত্তিমশাই।

বাবা অবাক হয়ে বলে—চক্কোত্তি আবার কে?

—সে আছে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল—আর আমি?

গুণ্টু তখন লজ্জা পেয়ে বলে—হাঁ বাবা, তুমিও। আর সৎমা।

—ছিঃ বাবা, সৎমা বলতে নেই। লোকে খারাপ ভাববে। শুধু মা। আরে

বলি বাবা, তোমার কিন্তু আর দুটি বোন আছে। তারা তোমাকে ভারী দেখতে চায়। তোমার মাও বলে, এবার গুণ্টুকে নিয়ে এসো।

গুণ্টুর যে যেতে অনিচ্ছে তা নয়। কিন্তু দিদিমা ছাড়তে চায় না। কথা উঠলে বলে, আঁতুর থেকে মানুষ করছি। ওর নাড়ী আমি ছাড়া আর তো কেউ চিনবে না। অন্যের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু মুশকিল হল, গুণ্টু শুনেছে, তার সৎমায়ের দুটি মাত্র মেয়ে, আর নাকি ছেলেপুলে হবে না। কিন্তু সৎমায়ের খুব ছেলের শখ। তাই এখন প্রায়ই গুণ্টুর বাবাকে বলে, সতীনপোকে নিয়ে এসো, তাকে নিজের ছেলে করে নেবো।

তাই বাবা আজকাল খুব ঘন ঘন আসে। গুণ্টুও জানে, একদিন তাকে হয়তো ঝাড়গ্রামে চলে যেতে হবে। সৎমাকে সে দেখেনি। তবে 'মা' বলে কাউকে ডাকতে খুব ইচ্ছে করে তার। আবার এ জায়গা ছেড়ে দিদিমা মামা আর চক্রবর্তিমশাইকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছেও করে না। গুণ্টুর আজকাল তাই মনটা দুভাগ হয়ে গেছে।

মামা প্রায়ই গুণ্টুকে বলে—তোকে যা একটা লীডার তৈরী করব না গুণ্টু দেখে নিস। একটু বড় হ, তখন জ্ঞানদার কাছে নিয়ে গিয়ে এমন ট্রেনিং দেওয়াবো। জ্ঞানদার হাতে কত লীডার তৈরী হয়েছে।

গুণ্টুর লীডার হতে খুব ইচ্ছে।

আরতির শেষে আজ বড় একা একা লাগছিল গুণ্টুর। কাঁসি বাজানোর সময় আজ তিনধা নাচন নেচেছে। এখন তাম্রপাত্র নিয়ে নাটমণ্ডপের ধারে বসে হাজারটা হাতের পাতায় তামার কুষি দিয়ে চরণামৃত দিচ্ছে। কত হাত। হাতগুলোতে ভয় লোভ হিংসে মাখানো। এক আধটা হাত ভারী ঠাণ্ডা। দেখে দেখে আজকাল বুঝতে পারে সে।

একটা সাদা কাঁপা-কাঁপা হাত থেকে খানিক চরণামৃত চলকে পড়ে গেল। মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই গুণ্টুর। কিন্তু সে ঠিক টের পায় এ হাতটা হল কানাই মাস্টারের। কানাই স্যারের প্রাণে আজ বড় কষ্ট।

একটা ছ্যাঁকা খাওয়া কড়া পড়া বিদঘুটে হাত দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল গুণ্টু, এ হল হেম ঘোষ। হেম ঘোষের হাতটা কাকে যেন খুন করতে চায়।

একবার চক্রবর্তিমশাই একটা কচি বেলগাছ দেখিয়ে গুণ্টুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—বলতো কত পাতা আছে গাছটার।

ভেবেচিন্তে গুণ্টু বলে—হাজার দুই হবে।

—দেখ তো গুনে।

সে বড় কষ্ট গেছে। এক মানুষ সমান উঁচু গাছটার নীচে টুল পেতে তার ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাতা গুনতে হল। দাঁড়াল চার হাজারের ওপর। তবু একটা আন্দাজ হল।

সেই থেকে চক্রবর্তিমশাই এরকম হরেক জিনিস আন্দাজ করতে শেখান গুণ্টুকে। করতে করতে গুণ্টুর আন্দাজ ভারী চমৎকার হয়েছে। খুব ঝুপসি গাছ হলেও তা

দেখে টকাস করে বলে দিতে পারে তাতে পাতা কত। জানে, গুণে দেখলে ঠি
মিলে যাবে।

চক্কোত্তিমশাই শিখিয়েছেন রোজ রাতে শোওয়ার আগে বিছানায় বসে সারা দিনের
কথা ভাববে। সকাল থেকে কী করলি, কী খেলি, সব হুবহু মনে করা চাই।
না করে ঘুমোবি না।

তাই করত রোজ গুণ্টু। ছ মাস পর তার বেশ তড়তড়ে মন হল। ঠক করে স
মনে পড়ে যেতে থাকে। তখন চক্কোত্তিমশাই শেখালেন এবার রোজকার কথা, আর
তার সঙ্গে আগের দিন, আগের আগের দিন এইভাবে মনে করবি। করতে করতে
দেখবি একদিন তোর আর জন্মের কথা মনে পড়ে যাবে।

—তাতে কী হয় চক্কোত্তিমশাই ?

—তাহলে আর মানুষ মরে না। দেহ ছাড়ে, কিন্তু মরে না।

গুণ্টুর দিকে আর একটা হাত এগিয়ে আসে। হাতে শাঁখা, তাতে সিঁদুরের
দাগ। গুণ্টু যেন এ হাত চেনে। কুষি তুলেও গুণ্টু থেমে থাকে। এ হাত কি
চরণামৃত চায় ? না। এ হাত একটা ছেলে চায়। এ হাতের বড় আকুলি বিকুলি।

হাতটা ঐ অত হাতের ভীড়ের ভিতর থেকে একটু ওপরে উঠে এসে গুণ্টুর
থুতনি ধরে মুখখানা ওপরে তুলল। আর তখন নাট মন্দিরের জোর আলোয় এক
জোড়া জল টলটলে চোখ দেখতে পায় গুণ্টু। ঘোমটার নীচে ফর্সা মুখ। ঠোঁটে
একটা কান্নায় ভেজা হাসি। পিছনেই বাবা দাঁড়িয়ে। ভারী তটস্থভাবে বাবা
মহিলাটির কাঁধে হাত দিয়ে বলল এখন না। ও এখন ব্যস্ত। বাড়িতে যাক ভাল
করে দেখো।

চোখ বুজে মহিলাটি বলে—এ যে দেবতার মতো ছেলে। আমার সতীন বড়
ভাগ্যবতী ছিল।

গুণ্টু ভারী লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি হাতে হাতে চরণামৃত ঢেলে দিতে থাকে
সে। মাথা নীচু। কারো মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই।

॥ পাঁচ ॥

রেবা ঝুঁকে গানের খাতা দেখছিল। গানের মাস্টার প্রভাস খানিকক্ষণ তবলায়
আড়া চৌতাল তুলবার চেষ্টা করে এইমাত্র একটা সিগারেট ধরাল। নতমুখী রেবার
দিকে চেয়ে রইল খানিক। বেশ দেখতে মেয়েটা। মাঝে মাঝে এমন করে তাকায় যে
ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

প্রভাস অনেকদিন ধরেই বুঝবার চেষ্টা করছে, রেবার হাবভাবে কোনো ইংগিত
আছে কিনা। মাঝে মাঝে যেন মনে হয়, আছে। আবার কখনো মনে হয়, না
নেই।

আছে কি নেই সেটা বুঝবার জন্যও একটা কিছু করা দরকার। ধসা কানা হয়ে
বসে থেকে কোনোদিনই তা বোঝা যাবে না।

ভাবতে ভাবতে প্রভাস একবার বাঁয়ার একটা ট্ুম শব্দ তুলল। রেবা তাকাল না। হাতখানা হারমোনিয়মের ওপর দিয়ে এসে ঝুলছে। কী চমৎকার আঙুল! এই য়ের বর কিনা হেম ঘোষ! কাকের মুখে কমলালেবু।

প্রভাস আন্দাজ করে, হেম ঘোষের বৌ হয়ে রেবা নিশ্চয়ই খুব সুখী নয়। তাহলে া প্রভাসকে একেবারে হ্যাটা করবে না।

ভেবেচিন্তে প্রভাস আজ সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। একটা কিছু হোক। হয়ে যাক।

গানের সময়ে আজকাল ঘরের লোকজন তাড়িয়ে দরজা দিয়ে জানালার পর্দা টেনে-ন দিয়ে বসে রেবা। সেটাও কি একটা ইংগিত নয়? কোন্ বোকা এসব ইংগিত তে না পারে?

খুব সাহস হল প্রভাসের। আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল।

একটু ঝুঁকে প্রভাস হঠাৎ রেবার ঝুলন্ত হাতখানা খপাৎ করে চেপে ধরে ডেকে ল রেবা!

জানালার পর্দার ওপাশে অভয়পদ অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা একটা শ্বাস ছেড়ে শ জোরে বলে উঠল--আগেই বলেছি কিনা মা, যে মেয়ে সিগারেট খায়, তার চরিত্র ল হতে পারে না! এসে দেখে যাও এখন স্বচক্ষে।

ঘরের ভিতরে প্রভাস তখন ছিটকে নেমে পড়েছে চৌকি থেকে। টর্চ জেবলে ড়াহুড়ো করে চটি খুঁজছে। মনের ভুল। ঘাবড়ে গিয়ে ভুলে গেছে যে, চটি দরজার ইরে ছেড়ে আসে রোজ।

রেবা সাদা মুখে প্রভাসের দিকে চেয়ে বলল—কী করলেন বলুন তো প্রভাসদা! খন এ বাড়িতে কি আর থাকা যাবে। কত কষ্টে বাপের বাড়ির কাছে এই বাসা জে বের করেছি। এখন যদি ছাড়তে হয় তবে ও ঠিক আবার ওদের সংসারে নিয়ে য়ে তুলবে।

প্রভাস দরজার কপাট হাতড়ে ছিটকিনি খুঁজছে তাড়াতাড়ি।

রেবা পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—এ বাসায় কত সস্তায় ছিলাম জানেন! অঞ্চলে পঁচিশ টাকায় ঘর আর পাওরা যাবে? বাড়িউলি মানুষটাও কত ভাল ল। ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কি করলেন বলুন তো!

প্রভাস ছিটকিনি খুলে চটি খোঁজার জন্য আর ঝামেলা করল না। দুই লাফে ঠান পেরিয়ে খালি পায়ে রাস্তায় নেমেই একটা রিকশায় উঠে পড়ল। বলল—জোরে লাও ভাই।

রেবা দরজার কাছ বরাবর গিয়ে সজল চোখে তাকিয়ে থাকল একটু। তারপর ঁদে ফেলল। ইস্, অভয়দা দেখে ফেলেছে। এখন ঠিক বাড়ি-ছাড়া করবে তাদের।

উঠোনের ওপাশের অন্ধকার থেকে কালিদাসীর গলা আসছিল—তোরই বা উঁকি রতে যাওয়ার কি দরকার! ওসব লোক-ওরকমই হয় বাবু। তুই নিজের কাজে যা।

—যাচ্ছি।

—গুন্টুটাকে ডেকে দিস তো। দুপুর থেকে ছেলের টিকি নেই।

রেবার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল—মাসীমা, আমাদের বাসা ছাড়তে বলবেন না আমি গানের মাস্টারকে ছাড়িয়ে দেবো।

কিন্তু তা আর বলা হল না। সিঁড়িতে শব্দ করে কালিদাসী ওপরতলায় উঠে গেল

গুম হয়ে বসে রইল রেবা। এ বাড়িতে যে কত সুবিধে! খুব সস্তায় কালিদাসী কাছ থেকে ঘুঁটে কেনে রেবা। আড়াইটাকা সের দরে খাঁটি গরুর দুধ কেনে।

প্রভাসের জন্য সব গেল।

॥ ছয় ॥

নাটমন্দিরের নীচে নেমে এসে কানাই মাস্টার হাজার জোড়া জুতোর মধ্যে নিজে জুতোজোড়া খুঁজে পাচ্ছিল না। জায়গাটা একটু অন্ধকারমতোও বটে।

হেম ঘোষ নেমে এসে বলল—কী খুঁজছেন মাস্টারমশাই, জুতো? বলে ফস ক দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে ধরল।

কানাই জুতো খুঁজে পেয়ে হেম ঘোষকে বলল—যাবেন নাকি বাজারের দিকে?

একা চলাফেরা করতে আজ কানাইয়ের ঠিক সাহস হচ্ছে না। মারাটা বড় খার হয়েছে মদনকে। একবার যাবে চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে, ফাঁকমতো।

হেম ঘোষ উদাস গলায় বলে—সকালেই বাজার করেছি। তা আমার আর ক কি, চলুন বরং বাজার থেকে ঘুরেই আসি একটু। বাজার জায়গাটা ভাল।

হেমের মনে একটা পোকা কামড়াচ্ছে তখন থেকে। একা ঘরে রেবা আর গা মাস্টার। চোখে চোখে কথা হচ্ছে না তো! কিংবা হারমোনিয়ামের রীডে একজ আঙুলে অন্যজনের আঙুল ছোঁয়া লাগে যদি! এর চেয়ে নিজেদের সংসারে ছিল। দশ জোড়া পাহারা দেওয়ার চোখ ছিল সেখানে। কাঁকড়াবিছের কথ ভাবে হেম ঘোষ। ওষুধটা চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

মনের কথা মনে রেখে দুজনে অন্য সব কথা বলতে বলতে বাজারপানে যেতে থাকে

*   *   *

কালিদাসী ডাক শুনে বারান্দায় এসে দেখে উঠোনে জামাই দাঁড়িয়ে। সঙ্গে আর দুটো মেয়ে।

কালিদাসী শ্বাস ছাড়ে। জামাই আসবে জানাই ছিল। গুণ্টুকে বুঝি এ নিয়ে যায়।

—এসো। বলে নীরস গলায় ডাকে কালিদাসী।

ওরা উঠে আসে।

জামাই প্রণাম করতে করতেই বলে—গুণ্টুকে নিয়ে যেতে এলাম মা। অনেক হয়ে গেল। আপনারও কষ্ট বুড়ো বয়সে।

কালিদাসী মন্দার মাকে মিষ্টি আনতে পাঠায়। তারপর গম্ভীরমুখে এসে সা বসে। বলে—যার ধন সে তো নেবেই। ঠেকাবো কোন আইনে। এই বুঝি দুটি? বেশ মিষ্টি হয়েছে দেখতে। আর এ আমার নতুন মেয়েটিও বেশ।

এ সবই মুখের ভদ্রতা। বুকটা ভিতরে ভিতরে জ্বলে যায়। কাঁকড়াবিছে কোন
:কে পাঁজর কেটে বুকের ভিতরে সেঁধিয়েছে। এ হুলের বড় জ্বালা।

খানিকক্ষণ বসে গল্পগাছা করে ওরা চলে গেল। কাল সকালে গুণ্টুকে নিতে আসবে।

কালিদাসী একটা চাদর গায়ে নীচে নেমে এসে ডাকল—রেবা। ও রেবা!

রেবা শুয়ে ছিল বিছানায়। ডাক শুনে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। এই বুঝি
ড়ি ছাড়বার কথা বলতে এসেছে!

কিন্তু না। কালিদাসী বলল—আমার একবার চক্কোত্তি মশাইয়ের কাছে যেতে
ব। মন্দার মা বাড়ি গেল, তা তুমি যদি একটু সঙ্গে চলো মা। আমার তো চোখে
ল ঠাহর হয় না রাতবিরেতে।

—যাচ্ছি মাসীমা। বলে রেবা তক্ষুনি চটি পায়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে
শ্য জিভ কাটল রেবা। চটিজোড়া তার নয়, প্রভাসের। অন্ধকারে তাড়াহুড়োয়
ঝতে পারেনি। এখন আর কিছু করার নেই।

রেবা বলল—মাসীমা, আমার কি দোষ বলুন। লোকটা ওরকম তা কি জানতাম!

কালিদাসীর বুক ভরা তখন গুণ্টুর চিন্তা। বলল—সে জানি বাছা। আজ-
লকার লোক বড় ভাল নয়। সাবধানে থাকবে।

রেবা কালিদাসীকে ধরে খুব যত্নে কাঁচা ড্রেনটা পার করাল। মনে মনে বলল—
ক্কোত্তিমশাই, দেখো বুড়ি যেন আমাদের না তাড়ায়।

* * *

গুণ্টুকে নিয়ে রেলগাড়ি হাওড়া ছেড়েছে অনেকক্ষণ। জানালার ধারে বসে সে
ন বাইরে গ্রাম আর ক্ষেত দেখছে। গা ঘেঁষে ছোট বোন দুটি বসে। মা একটু
রৎ থেকে মাঝে মাঝে মুগ্ধচোখে তার মুখের দিকে চাইছে। আর বার বার জিজ্ঞেস
ছে খিদে পেয়েছে বাবা তোমার? কিছু দিই? সন্দেশ আছে, রসগোল্লা, লুচি।
 এনেছি দ্যাখো! বাবা একবার কানে কানে জিজ্ঞেস করেছিল—মাকে তোর পছন্দ
য়েছে তো গুণ্টু?

গুণ্টু ঘাড় নাড়ল। বেশ মা। বোন দুটিও বড় ভাল। এ রকম মা বোন তার
ল না তো এতদিন! দিদিমা বড় কেঁদেছে ভুঁয়ে পড়ে। মামা স্টেশন পর্যন্ত শুকনো
খ এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসেনি।
টা বড় খারাপ লাগে। আবার ভাবে, নতুন একটা জায়গায় যাচ্ছে, সেখানে না
নি কত ফুর্তি হবে! কত খেলা!

দিন ফুরোয়। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। কানাই
স্টার টিউশনীতে বেরোলো। হেম আজ গেল রেবাকে নিয়ে সিনেমায়। অভয়পদ
রাটা খেয়ে পুজো কমিটির মিটিং-এ যাওয়ার সময় বলে গেল—মা, যাই। কালি-
সী শুনতে পেল না, সে তখন গোয়ালঘরে গরু দুটোর সঙ্গে রাজ্যের কথা ফেঁদে
সছে।

দিনটা গেল, যেমন যায়।

সিরাম

রামতারন লোকটা অভদ্র বটে, কিন্তু ত্যাঁদড় নয়, বুঝলি সতু ?

সতুর কথা বলার মতো অবস্থা নয়। চকবেড়ের হাটে নফরের তামাকপাতার দোকানের পিছনদিকটায় নিরিবিলিতে রোদের দিকে হাঁ করে চোখ বুজে আধশোয়া হয়ে বড় বড় শ্বাস টানছে। একবার শুধু মাথাটা নেড়ে জানাল, কথাটা ন্যায্য।

মরা কুল গাছটায় থিক থিক করছে শুয়োপোকা। কাঁচা নর্দমায় পাঁক পচে ফেঁপে উঠেছে। দুপুরের রোদ ঘাঁটা-পড়া নর্দমার বটু একটা গন্ধ ছড়াচ্ছে কখন থেকে। আর কিছু দেখার নেই লক্ষ্মীছাড়া জায়গাটায়। দুদিকে দু সারি দোকানের পিছন। লোকজনের যাতায়াত নেই, শুধু দোকানীরা মাঝে মাঝে পেচ্ছাপ করতে আসে। মতি সিংএর শিকলে বাঁধা সাইকেলটার একটা চাকা দেখা যাচ্ছে বেড়ার আড়াল থেকে। যুধিষ্ঠির পালের দোকানের পিছন দিকটায় মস্ত একটা মানকচুর গাছ। লালু মিঞার টেলারিং-এর চালে একটা নধর বেরাল বসে আছে কখন থেকে, নড়ছেও না চড়ছেও না। গদার চায়ের দোকানের পিছন দিকটায় কানা লক্ষ্মীকান্ত এক নাগাড়ে কয়লা ভেঙে যাচ্ছে। এসব আলগা চোখে লক্ষ করতে করতে বাঁ গালে একবার হাত বোলায় নসিরাম। গালে রুক্ষু দাড়ি খড়খড় করছে। আর দাড়ির নিচে এখনো চিনচিনে ব্যথা। রামতারনের থাবড়াটা তার চোয়াল যে খসিয়ে দেয়নি এই যথেষ্ট।

বুঝলি সতু। নসিরাম গালে হাতখানা চেপে রেখেই বলে, রামতারন থানা-পুলিশও করতে পারত। একেবারে জলের মতো কেস।

রামতারনের থাবড়াগুলো খুব অল্পের ওপর দিয়ে যায়নি। সতু এমনিতেও কিছু রোগাভোগা লোক। ক'দিন আগেও ন্যাবা হয়ে চোখ মুখ সব হলুদচোবা হয়ে গিয়েছিল। শেষে বৈরাগী মণ্ডল কাঠির মালা করে দেয়। সে ভারী মজার ব্যাপার। একশ আটখানা কড়প্রমাণ কাঠি সুতোয় বেঁধে চুড়ির মাপের ছোট্ট একখানা মালা ব্রহ্মতালুতে রেখে বলল, হাত দিয়ে চেপে থাকো। সতু তাই থেকেছিল। দেখ না

দেখ সেই মালা আপনা থেকে বড় হতে হতে মাথা গলিয়ে গলায় চলে এল। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সেই মালা বেঢপ বেড়ে নাই-কুণ্ডুলি ছুঁই ছুঁই। সকালে বাসিমুখে চুনের জলে সতুর হাত ধুয়ে দিয়েছিল মণ্ডল। একেবারে হলুদগোলা হয়ে গেল ফটফটে সাদা জলটা। দুপুরের দিকে মালা বেড়ে যখন শরীর গলিয়ে যাওয়ার মতো হল তখন মালা ছাড়ল সতু, দাঁত মাজল, খেল। ন্যাবা সেই বিদেয় হল বটে, কিন্তু শরীরটা এখনো যুতের নেই। রামতারন ভাল খায়দায়। হোৎকাটার এক একটা হাতের ওজনই গোটা সতুর সমান। তার ওপর থাবড়া মারার সময় রামতারন আবার বাঁহাতে সতুর চুলটাও ধরেছিল মুঠ করে। লেগেছে খুব। সতু এখনো দম ফিরে পায়নি, মাথা ঝিমঝিম করছে। তবু নসিরামের কথাটার একটা জবাব দিল সে। বলল, পুলিশ আর এর বেশী কীই বা করত! যা ঝেড়েছে! ওফ।

এ কথায় নসিরাম একটু লজ্জা পায়। রামতারন দুজনকেই ঝেড়েছে বটে, কিন্তু তার তেমন লাগেনি। চোঁয়ালের ব্যাথাটা দিন দুই থাকবে হয়তো। তবে তেমন কিছু নয়। চোঁয়ালের হাড় সরে যায়নি, দাঁত ভাঙেনি। গালের মাংসে দাঁত বসে যাওয়ায় ক'ফোঁটা রক্ত পড়েছিল শুধু। সে কথা বলল না, রোঁয়াহীন একটা শালিখের বাচ্চা কোথা থেকে পড়েছে নর্দমার ধারে। কয়েকটা কাক সেটাকে ঠুকরে ঠুকরে শেষ করল এইমাত্র। মা-শালিখটা ধারে কাছে নেই, থাকলে কাককে মজা দেখাত। নসিরাম বুঝতে পারছে রামতারনের পক্ষ নিয়ে কথা বলা তার উচিত নয়। বললে হয়তো সতু ভাববে, মার খেয়ে নসিরামের মাথাটাই গুলিয়ে গেছে।

কিন্তু ঘটনাটা ঠিক ঠিক বিচার করলে রামতারনকে কি দোষ দেওয়া যায়? গাজিপুর থেকে তারা রামতারনের পিছু নিয়েছিল। নেওয়ারই কথা। রামতারন আদায় উশুল করে ফিরছে। গাজিপুরের গোটা বাজারটাই ওর [illegible] মেলা টাকা। একজন পাইকও সঙ্গে ছিল। লহরার ইসমাইল। তার কোমরে চাকু, হাতে লাঠি।

সতু আর নসিরাম সব খবরই নিয়েছিল। বনবিবিতলায় ইসমাইলকে ছেড়ে দেবে রামতারন। কারণ ওখানেই ইসমাইলের দু নম্বর বিবি ওলন থাকে, ওলন ভারী আহলাদী মেয়েমানুষ। বুকে দয়ামায়া আছে, ধর্মভয় আছে। বড় একটা এদিক সেদিক করে না। তবে ইসমাইল বা রামতারন কেউই লোক ভাল নয়। শোনা যায় ইসমাইল ওলনকে রামতারনের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার তক্কে আছে। ওলনবিবি দেখতে খারাপ নয়। বালবাচ্চা নেই, শরীরটাও তাই ভাঙেনি।

ইসমাইলকে ছেড়ে রামতারন বনবিবিতলার বড় মাঠে পড়ল। পথও আর বেশী ছিল না। মাইলটাক গেলেই পীরগঞ্জের পাকা সড়ক। ফটফট করছে দুপুরের রোদ। ছাতা মাথায় রামতারণ দুলকি চালে হাঁটছিল। আচমকাই সতু আর নসিরাম চড়াও হল তার ওপর। সতুর হাতে ভোজালি, নসিরামের হাতে দেড়ফুট লম্বা গুপ্তি ছোরা।

রামতারণ ভয় খেয়েছিল কিনা বলা শক্ত। তবে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিল

ঠিকই। সতু ভোজালিটা আপসাতে আপসাতে বিকট গলায় বলল, জয়কালী, করালবদনী! একদম চেঁচামেচি করবে না বলে দিচ্ছি। লাশ ফেলে দেবো। এইখানেই লাশ পড়ে থাকবে, কুকুরে শেয়ালে ছিড়ে খাবে। মালটা দিয়ে দাও ভালোয় ভালোয়। পাশ থেকে গুপ্তির চোখা ডগাটা রামতারনের ভুঁড়িতে ঠেকিয়ে রেখেছিল নসিরাম। তেমন বেগতিক দেখলে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা। তবে সেটা কথাই। সতুও কোনদিন কারো লাশ ফেলেনি, নসিরাম গুপ্তি ঢুকিয়ে দেয়নি। তেমন জোরালো কলজে তাদের নেই। কিন্তু রামতারনের তো ভয় খাওয়ার কথা, দু দুটো ঝকঝকে অস্ত্র চোখের সামনে দেখেও শালা ঘাবড়াল না, অ্যাঁ! নসিরাম ঘটনাটা আবার ছবির মতো দেখছিল চোখের সামনে।

সতু চোখ পিটপিট করে দেখছিল নসিরামকে। হঠাৎ অন্তর্যামীর মতো বলে উঠল, শালা ভয় খেল না কেন বল তো!

নসিরাম বিরক্ত হয়ে বলল, কাজের সময় বেশী কথা কইতে নেই। যারা বেশী কথা কয় তাদের কেউ ভয় খায় না।

সতু ফিসফিস করে বলল, মালটা ছাড়ছিল না যে!—ওর বাপ ছাড়ত। দুটো খোঁচা খেলেই বাপ বাপ বলে ছাড়ত। ভোজালিটা তোমার হাতে ছিল কী জন্যে!

সতু মিইয়ে গেল। ফের হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল চোখ বুজে। দোষটা সতুর ঘাড়ে চাপাল বটে নসিরাম, কিন্তু পুরো দোষটা ওরও নয়। বোধহয় ওর চেহারাটারই দোষ। ল্যাঙপ্যাঙে একটা লোক যদি ভোজালি নিয়ে কেরদানি দেখায় তবে কার না ইচ্ছে করে তাকে একটা থাবড়া বসাতে? তার ওপর সতু হঠাৎ রামতারনের কুচ্ছো গাইতে শুরু করল, তেঘরেতে তোমার বাপের একজন রাখা মেয়েমানুষ আছে। সব ফাঁস করে দেবো। ইসমাইল মিঞার দু নম্বর বিবি ওলনের সঙ্গে তোমার আশনাইয়ের কথাও জানি। হপ্তায় দুদিন ওলনের ঘরে তুমি যাও। ট্যাঁ ফোঁ করেছো কি এসব কথা ঢোল সহরৎ হয়ে যাবে। বুঝেছো?

রামতারন আচমকাই থাবড়াটা কষাল। আর সে কী থাবড়া বাপ! সতুর মুণ্ডুটা তখনই ধড় ছেড়ে উড়ে গিয়ে আলের ধারে পড়ার কথা। শব্দটাও হল বোমার মতো। সেই শব্দে কেমন অবশ হয়ে গিয়েছিল নসিরাম। হাতের গুপ্তিটার কথা তখন বেবাক ভুল। সেই অবশ অবস্থাতে রামতারন হঠাৎ ঘুরে তাকেও একটা ওরকম থাবড়া কষাল। মাঠের মধ্যে দিনের আলোয় অন্ধকার দেখতে দেখতে মাটিতে বসে পড়ল নসিরাম। আর রামতারন তখন একহাতে সতুর চুল ধরে তুলে পটাপট কয়েকটা থাবড়া দিয়ে গেল নাগাড়ে। সতু চেঁচাচ্ছিল, আর মেরোনা। ন্যাবা থেকে উঠেছি, শরীর যুতের নয় হে, মরে যাবো।

হেঁৎকাটা এ কথায় থামল। তারপর ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, তোরা কারা?

সতু মাটিতে পড়ে চষা ক্ষেতের এক চাঙর মাটি আঁকড়ে ধরে দম নেওয়ার জন্য

প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কথা বলার অবস্থা নয়। লুঙ্গি খসে গিয়ে দিগম্বর অবস্থা তার।

নসিরাম টলতে টলতে দাঁড়িয়ে বলল, আজ্ঞে আমরা হচ্ছি—একটু ভাবতে হল। নাম দুটো স্মরণ হচ্ছিল না ঠিক।

রামতারন ধমক দিল, কারা তোরা?

আমি নসিরাম।

আর ও?

ও তো সতু!

কোন গাঁ?

আমি লোহারগঞ্জ, আর ও কালীতলা।

ঠিকঠাক বলছিস?

বানানোর মতো কথা মাথাতেই আসছে না। ঠিকঠাক না বলে উপায় কি? নসিরাম জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শুধু।

রামতারনের বোধহয় তাড়া ছিল, দুজনের জন্য যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে ভেবে চোখ পাকিয়ে বলল, এই দণ্ডে এই তল্লাট ছেড়ে চলে যাবি। ফের দেখতে পেলে পুঁতে ফেলব। যাঃ যাঃ যাঃ···

গরু তাড়ানোর মতো তাড়া খেয়ে তারা দুজনে সেই দণ্ডেই মাইলটাক পথ হেঁটে চকবেড়ের খাল পেরিয়ে হাটে এসে সেঁদিয়েছে। ভয়ের চোটে এতক্ষণ গা গতরের ব্যথা তেমন টের পায়নি। এখন পাচ্ছে। তবে গায়ের ব্যাথাটা বড় কথা নয়। রামতারন ইচ্ছে করলে পীরগঞ্জের থানায় তাদের জমা করতে পারত। আরো বিপদের কথা ইসমাইলকে লাগাতে পারত পিছনে, ইসমাইলের জমার ঘরে অন্তত পঁচিশটা খুন লেখা আছে। আরো দুটো বাড়লে ক্ষতি ছিল না।

নফর চেনা লোক। কিন্তু তাদের দেখে খুশি হয়নি মোটেই। দুজনের চেহারা দেখেই বিরস মুখে বলল, কোত্থেকে চোরের ঠেঙানী খেয়ে এসেছো! ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো। আমি ঝামেলা পছন্দ করি না।

তা চোরের ঠেঙানীও তারা খেয়েছে বৈকি। নফরের দোষ নেই। এই তো মোটে সেদিন শীতলাদহের বাজারে রামহরির দোকানে মাঝরাতে ঢুকেছিল দুজন। সতু আগে পিছনে নসিরাম। ঢুকেই সতুটা হেঁচে ফেলল। রামহরির ছেলে দোকানে শোয়। তার হাতের কাছেই টর্চ আর লাঠি। "কে রে?" বলে লাফিয়ে উঠতেই ভাঙা জানালা গলে পালাল দুজন। কিন্তু বাজার বলে কথা। চোখের পলকে চৌকিদার দোকানী আর ব্যাপারী মিলে বিশ পঁচিশ জন জুটে তাড়া করে খালধারে প্রায় ধরে ফেলল দুজনকে, তবে ভাগ্য ভাল সবাই অত জোরে ছুটতে পারে না। আর তারাও প্রাণের ভয়ে দৌড়োচ্ছিল। ধরল এসে জনা চারেক। কিল চড় চাপড় গোটা কয়েক পড়ল বটে, কিন্তু দুজনেই বুদ্ধি করে শীতের রাতে খালের বরফগোলা জলে লাফিয়ে পড়ায় অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে যায়। কাজেই নফরের দোষ নেই। তারা যে লোক ভাল

নয় এ কথা সবাই জানে। তবে সুবিধেটা এই যে আজকাল লোককেউই ভাল নয়। এই যে নফর দিব্যি তামাকপাতার পাইকারি কারবার খুলে বসে আছে, আলটপকা দেখলে মনে হয় ভারী সিধে কারবার। কিন্তু তামাকপাতার আড়াল দিয়ে গুলি, গাঁজা, চরস, ভাঙ, আফিং-এর যে ফলাও কারবার চলছে তার খোঁজ রাখে ক'জন? নসিরাম আর সতু সবই জানে। তাই চলে যেতে বললেও তারা যায় না। নফরও আর বেশী গাঁইগুঁই করেনি।

বেলাটা পড়ে এল, দোকানের পিছনকার ঘাঁটাপড়া জায়গায় আলোটা বিলিতি বেগুনের রঙ ধরল। নসিরামের মনে হল, যথেষ্ট জিরেন হয়েছে।

ও সতু! উঠবি?

সতু আধশোয়া হয়ে ছিল এতক্ষণ। এখন দেখা গেল, ন্যাড়া মাটির ওপর হাতে মাথা পেতে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। তা ঘুমোবেই। শরীরটা যুতের নেই। ন্যাবার আলিস্যি আছে। রামতারনের ওই অসুরের মারেও তো কম ধকল যায়নি।

নসিরামের কাছে বিড়ি নেই। থাকলে একটা ধরাত। শরীরটা উশখুশ করছে। সতুর কাছেও নেই, সে জানে। বিড়ি নেই, ম্যাচিস নেই, পয়সা নেই। নসিরাম উঠল। কারণ, বসে থাকার কোনো মানে হয় না। যুধিষ্ঠির পালের দোকানের পিছনে মস্ত মানকচু গাছটা অনেকক্ষণ ধরে তার চোখ টানছে। মাটির ওপরেই কচুর যে মাথাটা উঠে আছে সেটা দেখে মনে হয়, দশ সেরের কম ওজন হবে না। যুধিষ্ঠির কচুগাছের গোড়ায় রোজ এঁটো ভাত, ছাই, গোবর আর কী কী সব ফেলে ফেলে দিব্যি পুরুষ্টু করে তুলেছে জিনিসটিকে।

শীতের শেষ টান। নসিরাম জানে এই হাটে এখনো মানকচু খুব একটা ওঠেনি। অনায়াসে দু তিন টাকায় বিকিয়ে যাবে। টেনে তুলতেও কষ্ট নেই। জল পড়ে পড়ে জায়গাটা এমনিতেই ভুসভুসে হয়ে আছে।

নসিরাম সাবধানে নর্দমাটা পার হয়ে এগিয়ে গেল। চাল থেকে সেই নট নড়ন চড়ন বেড়ালটা হঠাৎ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে।

যুধিষ্ঠিরের দোকানের পিছন দিককার দরজাটা আবজানো। কে খোলা রাখবে বাপ! যা দুর্গন্ধ। কচুটা টেনে তোলার সময় নসিরামের একবার মনে হল, ছিঃ কাজটা ঠিক হচ্ছে না, একটু আগেই বনবিবিতলার মাঠে যার হাতে গুপ্তি ছোরা ছিল এখন সেই কিনা কচু—তুচ্ছ কচু চুরি করছে। লোকে দেখলে বলবে কী?

অবশ্য দেখছে না কেউ। কানা লক্ষ্মীকান্ত কয়লা ভেঙে উঠে গেছে। দেখছে শুধু বেড়ালটা। লালু মিঞার টেলারিং-এর চাল থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে খুব লক্ষ করছে তাকে, আর মিহিন মিয়াঁও মিয়াঁও আওয়াজ ছাড়ছে। তবে বেড়াল বলে রক্ষে। কুকুর হলে এতক্ষণে খাউ খাউ করে দুনিয়াকে জানান দিত।

যত সহজে কচুটাকে তোলা যাবে ভেবেছিল নসিরাম, কার্যকালে ততটা সহজ মনে হচ্ছে না। মাটিটা ভুসভুসে পচা মাটি ঠিকই, কচুটাও নড়নড় করছে বটে। কিন্তু গোলমাল অন্য জায়গায়। সেই সকালে দু গাল পান্তা মেরে বেরিয়েছিল নসিরাম।

সেই পান্তা কবে তল হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরেই পেটটা একেবারে বোমভোলা ফাঁকা— মেহনতও বড় কম যায়নি। এখন মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, শরীরটা কাহিল লাগছে। ভারী কচুটা খানিক নাড়িয়ে মাটিটা আরো আলগা করে টান দিতে গিয়েই পাঁজরে খিঁচ ধরে দম বন্ধ হয়ে এল। দু হাতে বুকটা চেপে ধরে উবু হয়ে বসে পড়ল সে। হাতখানেক বেরিয়ে আসা কচুটা আবার নিজের গর্তে বসে গেল। লালু মিঞার চাল থেকে বেড়ালটা পায়ে পায়ে হেঁটে চলে আসছে যুধিষ্ঠিরেব দোকানের চালে। খুব চেল্লাচেল্লি করতে লেগেছে হঠাৎ। নসিরাম একটা ঢেলা কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল। তারপর বুঝল ভুল হয়েছে। ঢেলাটা বেড়ালের গায়ে লাগল কিনা কে জানে, তবে যুধিষ্ঠিরের টিনের চালে খটাং করে একটা শব্দ হল।

নসিরাম ফেরৎ যাবার জন্য উঠতে যাচ্ছিল। কপাল খারাপ। বাঁ পায়ে জোর ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে। একেবারে অবশ। উঠতে গিয়েও ফের বসে পড়তে হল। দোকান-ঘরের পিছনের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল যুধিষ্ঠির।

এমনিতে দেখলে যুধিষ্ঠিরকে ভয়ের কিছু নেই। রোগা ভোগা চেহারা দেখে বিচার করলে খুবই ভুল হবে। যুধিষ্ঠির দেখা দিয়েই মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, কোন শুয়োরের বাচ্চা রে?

আশ্চর্য, নসিরামের রাগ হল না। আজকাল রাগটাগ কমে যাচ্ছে। সে একটু তেজী গলায় বলার চেষ্টা করল গালমন্দ করছো কেন?

গলায় তেজ তো ফুটলই না, বরং খোনা স্বর বেরোলো। উপোসী পেট থেকে আর কত বড় আওয়াজ বেরোবে?

যুধিষ্ঠির তার সাধের কচুটার দিকে তীক্ষ্ন চোখে চেয়ে ছিল। মাটি আলগা, কাদায় চোরের পায়ের ছাপ, চোরও বেকায়দায় পড়ে বসে রয়েছে সামনে।

যুধিষ্ঠির কোমরে হাত দিয়ে তেজের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বলল, গালমন্দ করবো না তো কি জামাই-আদর করতে হবে নাকি রে ছ্যাঁচড়া হারামজাদা? অরে ও পতু, ইদিকে আয়—

পতুর আসা মানে সাড়ে সর্বনাশ। যুধিষ্ঠির রোগা ভোগা হলেও তার মেজো ছেলে পতিতপাবন রোগা নয়। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। নসিরামের যা অবস্থা এখন ইঁদুরের লাথি খেলেও সইতে পারবে না। সে তাড়াতাড়ি বলল, তা আমি কী করে জানবো যে কচুটা তোমার!

আমার নয় তো কি তোর বাবার?

নসিরাম উকিল মোক্তারের মতোই বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, জমিটা তো আর তোমার নয়। সরকারবাবুদের হাট, তাদের জমি।

তাই নাকি রে শুয়োরেব পো? তোর এত আইনের জ্ঞান? ওরে পতু—

ঝিঁঝিঁ ছাড়াতে পায়ে থাবড়া মারতে মারতে উঠে দাঁড়াল নসিরাম। বলল, চেঁচাচ্ছো কেন খামোখা? যেতে বলছো যাচ্ছি।

কখন তোকে যেতে বললাম রে খানকির ছেলে ? ওরে পতু ! শুনেছিস ! শীগগীর আয়—

পতু প্রথমটায় শুনতে পায়নি। এবার পেল। বেরিয়ে এসে বলল, ক' হয়েছেটা কী ?

এই দ্যাখ। চোর ন'সে আমার কচু নিয়ে পালাচ্ছিল। ধর হারামজাদাকে।

নসিরামের ঝিঁঝিঁ ছেড়েছে ! সে আচমকাই লাফ দিয়ে নর্দমাটা পেরিয়ে গেল নফরের দোকানের দিকে জোর কদমে হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এঃ ভার' তো কচু ! পতু যে রেলের মাল নামায়, তার বেলা ? চোর আমি একা, না ?

একেবারে বেঁচে যাবে এতটা আশা করেনি নসিরাম। পতুও সমান তেজে নর্দমাটা পেরিয়ে তেড়ে এল। দৌড়াতে দৌড়াতেই নসিরাম গুণে গুণে তিনটে গাঁটা খেল মাথায়। যেন তিনটে ঝুনো নারকোল ডগা থেকে খসে মাথায় এসে পড়ল। আর কিছু অকথ্য গালাগাল। তবে দোকানে খদ্দেরের ভিড় আছে বলেই বোধ হয় পতু ঝামেলা আর বাড়াল না। তিনটে রামগাঁট্টায় মাথায় তিনটে আলু ফুটিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

ফের চোখে অন্ধকার দেখল নসিরাম। মরা কুলগাছটায় হাতের ভর রেখে অন্ধকারটা ছাড়িয়ে নিল চোখ থেকে! একরাজ্যের শুঁয়ো লেগে হাতটা চুলকোতে থাকে। তবু অল্পের ওপর দিয়েই গেছে বলতে হবে।

কিন্তু কথাটা সে অন্যায্য বলেনি! যুধিষ্ঠিরের চায়ের দোকান যত ভালই চলুক, তাদের আসল আয় দোকান থেকে নয়। পতু জংশন স্টেশনে রেল থেকে মাল খালাস করার দু-নমবরী ব্যবসায় বহুদিন হল ভিড়ে গেছে। রেলের পুলিশ নিজেরাই ব্যবসাটা ফেঁদেছে। পতুরা কম দামে মাল নামিয়ে আনে। বেশী দামে বেচে দেয়। ধরা পড়ার ভয়টা নেই।

সতু এতক্ষণে উঠে বসেছে। কাণ্ডটা বোধ হয় দেখেছেও। হাই তুলে বলল, বেশী কথা বলা তোরও দোষ। অত কথা বলতে যাস কেন ?

নসিরাম রাগ করে বলে, খামোখা গালমন্দ করেছিল দেখলে না ?

খামোখা করে রে পাগল ! তোরও দোষ ছিল। চল রওনা দিই। আজ আর কিছু হওয়ার নয়। দিনটাই খারাপ।

বয়সে সতু নসিরামের চেয়ে বছর কয়েকের বড়। তার বউ আছে, গোটা চারেক বাচ্চা আছে। নসিরামের ওসব নেই। দুজনেই ভুঁইঞাদের জমিতে চাষ করত। বর্গা রেজিস্ট্রির সময় মাতব্বররা তাদের বাদ দিয়ে অন্য দুজনের নাম বসাল। কিছুতেই টলল না। নতুন বর্গাদার ভুঁইঞাদের নিজস্ব লোক। মাতব্বরদের টাকা খাইয়ে ওরাই ওই কাজ করে। সেই থেকে সতু কষ্টে আছে। দুজনেই বুদ্ধি পরামর্শ করে চুরি ছ্যাঁচড়ামির লাইন ধরল বটে, কিন্তু আজ অবধি তেমন সুবিধে হল না।

নসিরাম গোঁ ধরে বসে বলল, তুমি যাও। আমি যাব না।

তবে কি এখানে বসে বসে মশা তাড়াবি ?—তাই তাড়াবো।

তোর বড় তেজ। অত তেজ ভাল নয়। আজ আর লোহারগঞ্জ গিয়ে কাজ নেই, কালীতলাতেই চল। একটা চট পেতে দাওয়ায় পড়ে থাকবি।

অভিমান ভরে নসিরাম বলে, তোমার বউ তোমার জন্য রেঁধে রেখেছে, আমার জন্যে তো আর রাখেনি।

একথায় সতু হাসল, বলল, রেঁধে রেখেছে তো মেলা। উনুনে নিজের হাত পা গুজে দিয়ে নিজের মুণ্ডুটা সেদ্ধ করে রেখেছে। চল, নুন দিয়ে মেখে তাই খাবি। তাও নুন যদি মুদির পো ধারে দেয়।

নসিরামের অভিমান যায়নি। বলল, তোমার বউয়ের মুণ্ডু তুমি খাওগে।

তোর বড্ড মেজাজ। ঠাণ্ডা হ'তো বাপু। ঠাণ্ডা মাথায় বসে ভাব। ভাবতে ভাবতে একটা কিছু বেরিয়ে পড়বে।

বিড়ির কী ব্যবস্থা করা যায় বলো তো ?

নফরাকে বল না।

নফরা দিতে বসেছে আর কি।

তবে যা, একটু তামাক পাতা নিয়ে আয়। দুজনে বসে চিবোই।

কিন্তু নসিরাম নড়ল না। গোঁ ধরে বসে রইল। চারদিক ঝেঁপে অন্ধকার নামছে। চকবেড়ের হাটে আলো জ্বলে উঠছে একে একে। কুপি, হ্যাজাক, হ্যারিকেন, কারবাইড। আনমনে দৃশ্যটা দেখছিল নসিরাম। ভারী সুন্দর এই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর লড়াই। আরো ভাল লাগত যদি পেটের খোঁদলটা এমন হাঁ হাঁ না করত।

সতু একটা ঝোঁক দিয়ে ধীরে ধীরে উঠল। কোমরের গামছাটা খুলে মাথায় জড়াতে জড়াতে বলল, এখন সাঝের পর খুব হিম পড়ে। কালীতলায় যদি না যাস তো লোহারগঞ্জেই যা, ঘরে গিয়ে আজকের রাতটা জিরো।

নসিরাম তবু নড়ল না, তার কেমন একটা ভাব এসেছে। রামতারণ তাকে একটা মোটে থাবড়া দিয়েছিল। সতুর ভাগটা ছিল অনেকটাই বেশী। এখন আবার পতুর গাঁট্টা তিনটে খাওয়ার পর নসিরাম আর সতু প্রায় সমান সমান। তার চেয়ে বড় কথা, তিনটে গাঁট্টা তার মাথার ভিতরটা কেমন গুলিয়ে দিয়েছে! চারদিককার এই হাট বাজার, পচা নর্দমার গন্ধ, রৈ-রৈ শব্দ কিছুই যেন তাকে তেমন ছুঁচ্ছে না।

সতু আবার জিজ্ঞেস করল, কী রে যাবি ?

না, তুমি যাও।

সতু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে আবার বসে পড়ল। বলল, তোর হয়েছেটা কী বল তো !

নসিরাম হঠাৎ মুখ তুলে বলল, হবে আবার কী ? এতক্ষণে রামতারনের লাশ মাঠের ধারে পড়ে থাকার কথা, তার ওপর মাছি ভন ভন করার কথা। আমাদের দুজনের হাতে দু দুটো অস্ত্র ছিল, তবু তা হল না। লোকটা ভয় পেল না। কেন

বলো তো সতু গোঁসাই? এক গোছা টাকা ট্যাঁকে নিয়ে সে দিব্যি ফিরে গিয়ে এতক্ষণে বউয়ের হাত পাখার নিচে বসে বাতাস খাচ্ছে।

হাতপাখার বাতাস খাওয়ার মতো গরম এখনো পড়েনি, কিন্তু সে কথাটা আর সাহস করে বলতে পারল না সতু। গলাটা উদাস রেখে বলল, প্রথম প্রথম ওরকম হয়। ওকে যে মারতে হয়নি সেটা ভালই হয়েছে। মানুষ মারার অনেক হ্যাপা রে। আমরা তো মারতে চাইনি। টাকাটা চেয়েছিলুম।

আর উল্টে যে ও আমাদের মারল!

তা কী করবি বল। রামতারন শালা খায় দায় ভাল। বোধ হয় ডন বৈঠকও করে। তোর আমার মতো উপোসী পেট তো আর নয়। আমরাও দু দিন ভরপেট খেয়ে নিলে অত সহজে পারত নাকি। তার ওপর আমার ন্যাবাটা হয়ে…

রাখো তোমার ন্যাবা। নসিরাম খেঁকিয়ে উঠে বলে, আসলে আমরা মরদই নই।

কথাটা অন্যায্য মনে হয় না সতুর। সে চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে ভয়ে ভয়ে বলে, চল, হাটে একটু ঘুরে দর দস্তুর দেখি।

দেখে কী হবে?

চল না। জিনিসপত্তর দেখলে মনটা অন্যদিকে থাকবে। দরটাও জেনে রাখা ভাল। আমার মুখে থুথু আসছে। একটু তামাক পাতা মুখে না দিলেই নয়।

নসিরাম চোখ পাকিয়ে বলল, কচুটা কি যুধিষ্ঠির শালার বাপের?

সতু উদাস গলায় বলল, তারই বা কী করবি? জোর যার মুলুক তার।

এঃ জোর! আমরা যে আসলে মরদই নই সেকথাটা স্বীকার যাচ্ছো না কেন?

যাচ্ছি বাপ, স্বীকার যাচ্ছি।

নসিরাম হঠাৎ একটা ঝাঁকি মেরে উঠে সতুকে দু হাতে নাড়া দিয়ে বলল, তাহলে চলো মরদের মতো একটা কিছু করি।

ভয় খেয়ে সতু বলে, কী করবি?

একটা কিছু করি, নইলে কোন লজ্জায় বাড়ি ফিরবো!

নসিরামের মাথায় যে পতুর তিনটে গাঁট্টা তাড়ির মতো কাজ করছে তা জানে না সতু।

তবে তার চোখেমুখে হন্যে ভাবটা দেখে সে বুঝল, নসিরাম নিজের বশে নেই। পাগলার বায়ু চড়েছে। সে নসিরামের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, চল তো আগে বেরোই। তারপর দেখা যাবে।

দুজনে বেরোবার মুখে একটা আস্ত তামাক পাতা নফরের চোখের সামনেই তুলে নিল নসিরাম। আস্তটা না নিলেও হত। কুঁড়ো কাঁড়া মেলা পড়ে থাকে। তাই দিয়েই চলে যেত। তবু আস্ত পাতাটাই একটা থাক থেকে তুলে নিল নসিরাম। নফর কিছু বলতে যাচ্ছিল! হয়তো মা-বাপ তুলে একটা খিস্তিই দিত। কিন্তু নসিরাম তার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। কী জানি কেন, কিছু বলল না নফর।

বাইরে এসে একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে বলা নেই কওয়া নেই চুণের বাটি

এক খাবলা চুন তুলে নিল নসিরাম। পানের দোকানী হাঁ-হাঁ করে উঠেও শেষ আর কিছু বলল না।

া দিয়ে ডলা খানিকটা তামাক পাতা ঠোঁটের নিচে গুজবার পর একটু ধাতস্থ ুজন।

সিরাম খানিক থুথু ফেলে বলল, আমাদের কী নেই বলো তো ? কেন আমাদের াজ হচ্ছেনা ?

তু মিইয়ে গিয়ে বলে, আমরা যে লোক ভাল। ভাল লোকদের দেখলেই চেনা কনা।

তামার মাথা। ভাল লোককে ধরে তাহলে ঠ্যাঙায় ?

াল লোক বলতে ঠিক ভাল লোক নয় বটে। আসলে আহাম্মক ঠাওরায় ই বলো। আহাম্মক আর ভাল কি এক হল ?

ত কথা জানলে তো এতদিনে কালীতলা প্রাইমারিতে মাষ্টারি করতুম রে। অত কি জানি ?

ুঁইঞারা যখন জমিতে নতুন বর্গা লাগালে তখন আমরা যেমন আহাম্মক ছিলুম তেমনি আহাম্মক আছি বলছো ?

াতু মাথা নেড়ে বলে, আছিই তো।

াহলে মরদও নই ?

াও খানিকটা ঠিক। কারো সঙ্গেই আমরা তেমন এঁটে উঠছিনা। তবে রোজ ু একটু করে অভ্যেস করলে দেখিস হয়ে উঠব একদিন।

ামার বয়স কতো ?

অবাক হয়ে বলে, কত আর। তোর চেয়ে পাঁচ সাত বছরের বড় হবো। কত ?

া জানিনা। তবে বেশী নয় খুব একটা, কমও নয়। ভাবছি মরদ হয়ে উঠতে আর লাগবে। ততদিনে বুড়ো ধুড়ো হয়ে যাবো না তো দুজনে ?

তু খুব হাসে। গামছার ল্যাজে মুখ মুছে বলে, বুড়ো হওয়া তো ভাল কথা বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হয় তাহলে। গতিক যা দেখছি, ততদিন থাকাটাই তো দায়।

াসিরাম আর একবার থুথু ফেলে বলে, তাই তো বলছিলাম, এসব রয়ে সয়ে হয় এসো মরদের মতো একটা কিছু করে ফেলি।

মটে আলুর দর জিজ্ঞেস করতে একটু দাঁড়িয়েছিল সতু। দোকানী তেরছা একটু দেখল। জবাব দিল না। মাল চেনে। সতুও আর চাপাচাপি করল না।

ত হাঁটতে বলল, কী বলছিলে ?

বলছিলাম অত ভয় খাও কেন ? একটা ধুন্ধুমার কিছু লাগিয়ে দিই এসো। হাক, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড।

অত উতলা হোস না। রোস ক'দিন।

সেটা আর ক'দিন ; ভাল পথ তো আর নেই। খারাপ পথেও ভিড় বাড় শেষে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তখন ?

কেন, এই তো সেদিন রতন সিং-এর গরুটা চুরি করলুম দুজনে।

সে তার কটা টাবাই বা দিয়েছে। গো-হাটার লোকটা চোরাই গরু বলে ফেলল। দিল মাত্র এক্শটা টাকা। ভাগাভাগি হয়ে তোমার পঞ্চাশ, আমার পঞ্চা ও তো পিচেশপানা। বড় কিছু না করলে বড় দাঁও মারা যায় না, বুঝলে !

বুঝছি রে বাপ, হাড়ে হাড়ে বুঝছি। তুই বড় ছটপট করছিস আজ। এমন ছিলি না।

আজ রক্তটা কিছু গরম লাগছে।

আয় তেলেভাজা খাই। পেটে কিছু পড়লেই রক্ত ঠাণ্ডা হবে। আমার কা একটা টাকা আছে।

আছে ? বলোনি তো এতক্ষণ !

বলার ফাঁক দিলি কই ? যা গেল হুজ্জুত। পরশু ব্রজবিলাসের বাড়ি থে দুটো কাঁসার থালা সরিয়েছিলাম। তারই তলানী একটা টাকা পড়ে আছে।

তাহলে তেলেভাজা খেতে চাইছো কেন ? অত বাবুগিরি কি আমাদের পোষা বরং একটু কুমড়ো বলাই আর নুন কিনে বাড়ি যাও। সেদ্ধ করে ছেলেপুলে বউ নি খাবে।

বলছিস ?

বলছি। খিদেটা আছে থাক। শরীরটা গরম লাগছে। চনমনে লাগছে পেটটা ঠাণ্ডা হলে এই ভাবটা মরে যাবে।

সতু আমতা আমতা করে বলল, তোকে আমার এখন একটু একটু ভয় করছে রে নসু ?

নসিরাম হাঃ হাঃ করে খানিক হাসল। মাথায় একটু হাত বোলাল সে। তিন আলু ফুটিয়ে দিয়েছে পতু শালা। কেন ? না একটা কচু নিয়ে বৃত্তান্ত। দুনিয়া যে কী ছোটোলোকই হয়ে গেছে বাপ !

চকবেড়ের সরকারদের এই হাট ভারী রমরমে জায়গা। নামে হাট হলেও আস পাকা এবং স্থায়ী বাজার। হপ্তায় দুদিন বাজারের গায়েই হাট বসে। আজ হাটবার। মেলা লোকের আনাগোনা। দুজনে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ লক্ষ করছে না তাদের।

সতু বলল, কথাটার জবাব দিলি না ?

কোন্ কথাটার ?

তোকে দেখে এখন আমার একটু গা ছমছম করছে কেন ?

ওঃ কী যে ছাতামাথা বলো না ! আমি কি ভূত যে গা ছমছম করবে ?

ভূত নোস। তবে তোর হাবভাব ভাল লাগছে না রে নসু। কী যে এ

তলব আটছিস মনে মনে।

সে তো আঁটছিই। হাবভাব ভাল করার জন্য এ লাইনে নেমেছি নাকি।

তা বটে। তবে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখিস।

রাখা যাচ্ছে না। মাথা ঠাণ্ডা থাকে কখনো ? হাতে অস্ত্র নিয়ে হামলা করলুম, তাও রামতারন শালা পুলিশে দিল না। এমন কি ইসমাইলকে পর্যন্ত পিছুতে লাগাল না। তার মানেটা বুঝছো ? তার মানে, রামতারন আমাদের মনিষ্যি বলেই জ্ঞান করেনি। ছিঁচকে চোরকেও লোকে এর বেশী খাতির দেয়। তা জানতে চাইছিলুম, আমাদের কী নেই! কিসের অভাব আছে। লোকে ভয় খাচ্ছে না। পাত্তা দিচ্ছে না। রামতারন এমন কিছু ডাকাবুকো লোকও নয়। গেরস্ত মানুষ, পাইক নিয়ে চলে, মেয়েমানুষ করে, তার ভয় ভীতি থাকার কথা। তারপর ধরো, যুধিষ্ঠিরের পা পতু, চোর বলে তিনটে গাঁট্টা আর গালাগাল দিয়ে ছেড়ে দিল। লোক জড়ো করল না, তেমন চেঁচামেচি করল না। তার মানেও কিন্তু ওই। মানুষ বলেই ধরছে না।

তোর মাথাটাই বিগড়ে গেছে আজ।

তা বলতে পারো। নাও তামাকটা একটু ডলো। আর একটু চড়াই।

খিদেটা মরেছে ?

মরেছে। আর একবার চড়ালে একদম মরে যাবে।

মাসুদের জর্দার দোকানের সামনে একটা আয়না ঝোলানো। ম' ম' করছে গন্ধ। খৈনী ডলতে ডলতে আচমকাই সতু আয়নাটার দিকে চেয়ে থমকে গেল। চেক লুঙ্গি, শার্ট আর সোয়েটার পরা একটা ছিপছিপে লোক পিছু ফিরে আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বোধহয় মুখের ব্রণ টিপছিল। হ্যাজাকের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল মুখখানা। ইসমাইল। হাতে টর্চ ছাড়া আপাতত কোনো অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর লুঙ্গি বেল্ট দিয়ে বাঁধা থাকে। সেই বেল্টে ঝোলে চাকুর খাপ। কিন্তু কথা হল, ইসমাইল তাদের খবর রাখে কিনা।

খৈনী ডলতে ডলতে থেমে গিয়ে সতু বলল, নসু, ইসমাইল।

প্রথমটায় নসিরাম বুঝতে পারেনি। হাত বাড়িয়ে খানিকটা খৈনী সতুর হাত থেকে তুলে নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল। তারপর আচমকা সেও ইসমালইকে দেখতে পেল।

দেখতে হয়তো পেত না। কিন্তু ইসমাইল আয়নার ভেতর দিয়ে নিজের মুখ দেখার ছল করে আসলে হাটের লোকজনকে চোখে চোখে রাখছিল। তাদের দুজনকে দেখতে পেয়েই ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। লোকটার সেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোটা চোখে পড়াতেই ইসমাইলকে দেখতে পায় নসিরাম। দেখেই একটা চমক লাগে তার। বুকে একটা চড়াই পাখি কাঁকিয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইসমাইলের ধরনটাও ভাল ঠেকে না তার চোখে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, চোঁয়াল শক্ত, ভ্রূ কোঁচকানো, ফর্সা মুখটা একটু রাঙা দেখাচ্ছে।

ইসমাইল তাদের নড়বার সময় দিল না। মাসুদের দোকান থেকে একটা লাফ

মেরে রাস্তার মাঝখানে পড়ল।

কি বে শুশালা! খুব মস্তান হয়েছিস?

রামতারন তাহলে খবর দিয়েছে? অ্যাঁ! রামতারন শালা শেষ অবধি খবর দিয়েছে তাহলে?

সতু কাঁকিয়ে উঠে বলল, নসু! দৌড়ো! পালা!

নসিরামেরও বুকের মধ্যে তোলপাড়। তবু সে একটু সত্যিকারের হাসি হেসে বলল, আঃ দাঁড়াও না! রামতারন শেষ অবধি তো মনিষ্যির মানটা দিয়েছে, নাকি?

কী যে বলিস বিপদের সময়ে! দৌড়ো!

তুমি পালাও।

তুই?

জবাবটা দেওয়ার সময় পায়না সতু। ইসমাইল চট করে এসে বাঁ হাতে একটা রুদ্দা মারল সতুর ঘাড়ে। সতু পড়ে গেল।

নসিরাম দেখল, ইসমাইল তার ছুরি বের করেনি। খুব রাগ হল তার। দু দুটো লোককে শুধু হাতেই মেরে ক্ষান্ত হবে নাকি গুণ্ডাটা? সে হাত ছড়িয়ে ইসমাইলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ঢ্যামনার মতো হাত চালাচ্ছো কেন?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! ইসমাইল দ্বিতীয়বার হাত তুলতে গিয়েও একটু থমকে গেল। গনগনে গলায় বলল, কত বড় খুনিয়া হয়েছিস রে শালা রেণ্ডির ব্যাটা? জানিস এটা আমার এলাকা!

জানি। কিন্তু আগে অস্ত্র বের করো, তারপর কথা। অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কিসের হে! বের কর শালা তোর অস্ত্র।

নিজের গলার স্বরে নসিরাম নিজেই অবাক হয়ে গেল। যেন এক বাঘ এসে কখন সেঁধিয়েছে গলার মধ্যে। খোনা স্বরটা আর পাওয়া যাচ্ছে না তো!

ইসমাইল একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে। চারদিকে লোকজনও জড়ো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কোমরে জামার তলায় হাত রেখে সে স্থির চেয়ে বলল ফের এই তল্লাটে পা দিয়েছিস তো—

কিন্তু কথাটা শেষ হল না তার। নসিরাম হঠাৎ ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে গেল তার দিকে, রেণ্ডির পুত আমি না তুই রে? অ্যাঁ! কাঁচা খেয়ে নেবো তোকে, রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবো শালা! আয় আয় শালা…

কী যে হল তার হদিশ পাওয়া মুশকিল। তবে কেমন যেন ভড়কানো মুখে ইসমাইল পিছু হটতে লাগল।

আয় শালা! আয় শালা! বলে এগোতে লাগল নসিরাম। হাতে অস্ত্র নেই পেটে খোঁদল। গালে রামতারনের থাবড়া এখনো চিন চিন করছে। মাথায় পতু তোলা তিনটে আলু। তবু শুধু হাতেই সে হঠাৎ বেড়ালের মতো একটা লাফ মেরে গিয়ে পড়ল ইসমাইলের এক হাতের মধ্যে।

আর পারল না ইসমাইল। বোধহয় জীবনে এই প্রথম সে মুখ ঘুরিয়ে ছ

লাগাল। এক হাট লোকের চোখের সামনে।

নসিরাম নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেল ব্যাপারটা দেখে। সে লক্ষ করল চারপাশে জড়ো হওয়া শয়ে শয়ে লোক তাকে নীরবে দেখছে। তাদের চোখে ভয়।

* * *

একটু বেশী রাত করেই ফিরছিল দুজন। সতু আর নসিরাম।

সতু বলল, তোর সঙ্গে এই যে রাত বিরেতে রোজ ফিরি, কোনোদিন ভয় লাগে না। আজ লাগছে। তোকে আজ ভয় খাচ্ছি কেন রে ?

নসিরাম নিজের মাথার তিনটে তালুতে হাত বুলিয়ে বলল, কি জানি কেন, আজ আমার নিজেরই নিজেকে এখন কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

তিন টুকরো গল্প

গোবিন্দর পিছনে যে গোয়েন্দা লেগেছে তা বুঝতে তার কয়েকদিন সময় লাগল। আসলে লোকটাকে বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে প্রথমে তাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহই হয়নি। লোকটির চেহারা বেশ শক্তপোক্ত, রুক্ষ, রাগী-রাগী, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাড়ি প্রায়ই কামানো থাকে না, পরনে সাধারণ জামা আর প্যাণ্ট। সে আস্তে আস্তে বাড়ির ওপর নজর রাখে, চোখাচোখি হলে চোখ সরিয়ে নেয়, তবে পালায় না।

প্রথমে গোবিন্দর সন্দেহ হল, লোকটা তার বউয়ের গুপ্ত প্রণয়ী বা জার। তাই সে একদিন খুব সাহস সঞ্চয় করে বউ শাশ্বতীকে ডেকে বলল, লোকটা কে?

শাশ্বতী মেদ কমানোর জন্য ব্যায়াম করছে, নাচ শিখছে। সুফলও ফলেছে। আজকাল তাকে বেশ ছুকরি-ছুকরি লাগে। প্লাক করা ভ্রু ওপরে তুলে চরম বি সঙ্গে বলল, কোন লোকটা গো?

ওই যে, ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রায়ই ওকে আনাচে কানাচে দেখি, ও তোমার ইয়ে টিয়ে নয় তো!

শাশ্বতী জানালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফটকের পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে ও স্টেপ কাট করা চুল ঝামরে বলল, কক্ষনো নয়। ও মা, এসব আবার কী কথা মুখে। লোকটাকে তো আমি চিনিই না।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া শুরু হল। সেই ঝগড়া চলল তিন দিন পর মান অভিমান, কান্নাকাটি। শাশ্বতী অবশেষে বলল সে একমাত্র তার ব্যায়া শিক্ষক জগুদা ছাড়া আর কোনও লোককেই তার যোগ্য প্রণয়ী বলে মনে করে না।

এ কথা শুনে গোবিন্দ একটু নিশ্চিন্ত হল বটে, কিন্তু সন্দেহ গিয়ে পড়ল বড় পিয়ালীর ওপর। লোকটা পিয়ালীর প্রেমিক নয় তো!

কথাটা একদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুলতেই পিয়ালী গম্ভীর মুখ করে বলল, ছাড়া আমার জীবনে আর কোনও—

গোবিন্দ খানিকটা স্বস্তি বোধ করল বটে, কিন্তু লোকটা তাহলে কে এই প্রশ্নটা কেরোসিনের গন্ধের মতো চারপাশের বাতাসে লেগেই রইল।

তবে কি গোয়েন্দা? বলতে কি গোবিন্দের ওপর গোয়েন্দার নজর পড়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। গোবিন্দ যে ইদানীং শাঁসালো হয়ে উঠেছে তা বহু চেষ্টা করেও গোপন রাখা যাচ্ছে না।

গোবিন্দ শুরু করেছিল একেবারে শুরু থেকে অর্থাৎ "কিছু না" থেকে। তারপর ধীরে ধীরে তার উন্নতি ঘটেছে এবং এখনও ঘটেই চলেছে। একবার উন্নতি শুরু হলে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য। কিন্তু গোবিন্দ বোকা নয়। সে তার উন্নতিকে যথেষ্ট সাবধানে এবং বিস্তর চেষ্টায় গোপন রাখে। সে তার নতুন জামায় তালি লাগিয়ে ...। ছেঁড়া জুতো পরে, পুরোনো ছাতা ব্যবহার করে, দুদিন পর পর দাড়ি কামায় ইত্যাদি। সে তার বাড়িটাকে ইচ্ছে করেই সম্পূর্ণ করেনি, একটু শ্রীহাঁদহীন করে রেখেছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তার আট দশটা লকার আছে, বাড়িতে মাটির নিচে আছে গুপ্ত কুঠুরী। কিন্তু সেগুলিতে সামান্যই সোনাদানা আছে তার। তার যত টাকা সবই নানা কারবারে উৎপাদনে, ঋণপত্রে লগ্নী করা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, গোবিন্দ যখন খুবই গরিব ছিল তখন সে দেখেছে যে দারিদ্র্য জিনিসটাকে কিছুতেই ঢাকাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। নানা ফাঁক ফোঁকর দিয়ে দারিদ্র্য প্রকাশ হয়ে পড়েই এবং পাঁচজনকে জানান দেয় যে, এই লোকটা আসলে গরিব। মাছ দিয়ে শাক ঢাকছে আবার সম্পদ জিনিসটাও ঠিক তাই যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক না কেন, নানা ফাঁক ফোঁকর দিয়ে সম্পদ উঁকি মারবেই এবং পাঁচজনকে জানান দেবে যে, এই লোকটা আসলে শাঁসালো। শাক দিয়ে মাছ ঢাকছে।

গোবিন্দের বউ লোক-দেখানো গয়না পরে না বটে, কিন্তু তাঁর বাঁ হাতের অনামিকায় যে হীরের আংটিটা আছে তার দাম ত্রিশ হাজার টাকা। তার ব্যায়ামের শিক্ষক আর নাচের গুরু মাসে পাঁচশো টাকা করে নেয়। বিউটি পারলারেও নিশ্চয়ই মোটা খরচ হয়, তার রেট গোবিন্দও অবশ্য জানে না। সে নিজে তালি দেওয়া জামা আর তালি দেওয়া জুতো পরলেও তার ছেলেমেয়েরা বাজারের সেরা জামা জুতো পরে, তারা স্কুলে পড়তে যায় এবং প্রত্যেকের আবার প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা গৃহশিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা কেউ পাঁচশো টাকার কম নেন না। ষাট সত্তর টাকা থেকে দেড়শো টাকা কিলোগ্রামের মাছ তারা ফেলে ছড়িয়ে প্রতিদিন খায়। এসব কি আর গোপন থাকে?

সম্পদ হল নতুন-প্রেমে-পড়া কিশোরীর মতো, সারাক্ষণ ফাঁক ফোঁকর দিয়ে উঁকি ঝুঁকি দেয়। আর তখন ওই গোয়েন্দাটার সঙ্গে কি আর চোখাচোখি হয় না তার?

লোকটা যে গোবিন্দর ওপর নজর রাখছে তা সে গোপনও করছে না তেমন। এবং লোকটা তার সম্বন্ধে কী ভাবছে তা আন্দাজ করতেই গোবিন্দর ভীষণ লজ্জা হয়। ভয় তো আছেই।

গোবিন্দ যতই গরিব সেজে থাকুক তার হাতঘড়ির দাম চার হাজার টাকা। সেদিন

বেরোবার সময় গোবিন্দ লক্ষ করল, লোকটা ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আড়চোখে তা ঘড়িটাকে নজর করছে। গোবিন্দর বুকটা কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ঘড়ি কানের কাছে তুলে একটু ঝাঁকিয়ে শোনার ভান করে স্বগতোক্তি করল, এঃ, বন্ধ হ গেছে। হবে না! আশি টাকার সস্তা ঘড়ি আর কদ্দিন চলবে।

শাশ্বতী যথেষ্টই সুন্দরী। ইদানীং ব্যায়াম করে আর নেচে আরও সুন্দ হয়েছে। খঞ্জনা পাখির মতো শরীর। রাস্তায় বেরোলে পাঁচজনে তাকায় এ তারিয়ে তারিয়ে দেখে। কিন্তু নির্লজ্জ গোয়েন্দাটা শাশ্বতীকে না দেখে বাঁ হাত একরত্তি হীরের আংটিটার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে।

বাজারে গিয়ে মাছ বা অসময়ের দামী ফুলকপি কিনতে গিয়ে গোবিন্দ প্রায়ই ে পায় গোয়েন্দাটা তার ঘাড়ে শ্বাস ফেবার মত দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা সি বি আই না ইনকাম ট্যাক্স না অ্যাণ্টি করাপশান না আর কিছু বুঝতে পারছে না গোবিন্দ। কিন্তু অবস্থাটা যে চলতে দেওয়া যায় না তা সে ে বুঝতে পারছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার!

গোবিন্দ তক্কে তক্কে রইল। আর একদিন শীতের রাতে গলির মধ্যে লোকট একা পেয়ে গেল। লোকটা একটু আনমনা ছিল সেদিন। আকাশের চাঁদ দেখছি

গোবিন্দ খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে বিগলিত গলায় ডাকল, স্যার?

অ্যাঁ?

আপনি কি ঘুষ খান?

লোকটা একেবারে আঁতকে উঠে গোবিন্দর দিকে বাক্যহারা হয়ে খানিক চেয়ে রইল।

কী বললেন?

গোবিন্দ হাসিটাকে বিগলিত করে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, অ জিজ্ঞেস করছিলুম আপনি কি ঘুষ খান?

লোকটা একথা শুনে নববধূর মতো মাথা নত করে ফেলল লজ্জায়। তার অতিশয় লাজুক হাসি হাসতে হাসতে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে প্রায় ফুলশয্যার রাে নববধূর মতোই ফিসফিস করে বলল, খাই।

আজ্ঞে এখন কি খাবেন?

লোকটা লজ্জায় চোখ পর্যন্ত তুলতে পারল না। তবে খুবই অনুরাগে গলায় বলল, পেলেই খাই। কেউ তো দেয় না স্যার।

গোবিন্দ তৈরিই ছিল। পকেটে হাত ভরে দশ টাকার একখানা নোট বের লোকটার লাজুক হাতে ধরিয়ে একেবারে আদর করে মুঠি পাকিয়ে দিল।

লোকটা নববধূর মতোই প্রথম পুরুষস্পর্শের লজ্জাতেই যেন চট করে হাতটা ে নিয়ে প্যাণ্টের পকেটে পুরল। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, এর অবশ্য ে দরকার ছিল না স্যার।

গোবিন্দ গাঢ় স্বরে বলল, দুনিয়াটা টিঁকে আছে তো এই পরস্পরকে দেখার মধে

আপনি আমাকে দেখবেন, আমি আপনাকে।

বড় ভাল কথা স্যার, বাড়ি গিয়ে খাতায় টুকে রাখব। মহাপুরুষদের বাণী নোট করে রাখা আমার একটা হবি স্যার।

ঠাট্টা করছেন স্যার? মহাপুরুষ আর হতে পারলুম কই? আমি তো কাপুরুষ। রেটটা বোধ হয় একটু কম হয়ে গেল স্যার। গরিব মানুষ আমি, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তার ওপর আপনিই তো শুধু নন, আপনার ওপরওলা সাহেবরা আছেন, তার ওপর কর্তারা আছেন, তার ওপর খোদ কর্তারা আছেন, তাঁদেরও খুশি করতে হবে। তা কটা বাজে বলতে পারেন স্যার? ঘড়িটা কখন থেকে বন্ধ হয়ে আছে।

আজ্ঞে এই দশটা। আপনার সব কথাই আমি খাতায় টুকে রাখব স্যার। একসঙ্গে এত ভাল ভাল কথা বহুকাল শুনিনি।

আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না। রাতও হয়েছে। শীতের রাতে খাবার বড় তাড়াতাড়ি জুড়োয়।

লোকটা বিরহের দৃষ্টিতে একবার গোবিন্দর দিকে চেয়ে চলে গেল।

দুদিন পর ফের দেখা। রাতের গলিতে। এবার লোকটাই ডাকল, স্যার।

গোবিন্দ একটু থমকে বিগলিত হাস্যে মুখ ভরিয়ে ফেলে বলল, ভাল আছেন তো স্যার?

আপনার আশীর্ব্বাদে চলে যাচ্ছে। বলছিলুম কি, আমি কিন্তু ঘুষ খাই স্যার। এখন পেলেও খাই—

গোবিন্দ খুব বিজ্ঞের মতো হাসল। প্রথম দিন থেকে সে রেটটা কম রেখে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছে, মাঝে মাঝে দশটা টাকা দিতে এমন কিছু গায়ে লাগে না। একশ টাকা হলে লাগত। ফের দশটা টাকা লোকটার লাজুক মুঠির মধ্যে ভরে দিয়ে সে বলল, আরে তাতে কি, খাওয়াই তো দুনিয়ার সব। এই যে বাড়ি ফিরে গিয়ে মোটা চালের ঠাণ্ডা ভাত আর জলের মতো একটু ডাল, কালো মতো একটা ছেঁচকি কয়েক ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে গিলব স্যার, তার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম আনন্দ আছে।

একথাটা যা বলেছেন, আর কোনও শালার মহাপুরুষ বলতে পারেননি। ডট পেনটার রিফিল ফুরিয়ে না গেলে আজই গিয়ে লিখে ফেলতাম।

লোকটাকে নিজের পকেটের দামী ডট পেনটা উদারভাবে দিয়ে গোবিন্দ একটু হাসল, বলল, কিসব ছাভামাথা বলি, তবু যদি লিখে রাখবার ইচ্ছে হয় স্যার তো লিখবেন। তবে রিপোর্টটা একটু গরিবের দিকে টেনে লিখবেন স্যার। আপনার ডট পেনের রিফিল আমি কখনও ফুরোতে দেবো না।

লোকটা চলে গেল। দু চার দিন পর আবার এল।

স্যার।

স্যার।

কী যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন স্যার, আর ছাড়তে পারছি না। কিসের নেশা স্যার ?

আজ্ঞে ঘুষের, ঘুষ না খেলে কেমন যেন শরীরটা ঘুষঘুষ করে। আইঢাই করে, হাই ওঠে, ঘুম পায়, দুস্বপ্ন দেখা দেয়, কী নেই কী নেই মনে হয়। ওফ, জবর নেশা বটে। তিন দিন হল ঘুষ খাইনি স্যার, দেখুন কেমন দড়ি পাকিয়ে গেছি।

আহা। আগে বলতে হয়। এই যে—বলে ফের দশটা টাকা তার কুণ্ঠিত মুঠিতে ভরে দেয় গোবিন্দ। তারপর বলে, আচ্ছা আপনি কি সি বি আই ?

আজ্ঞে না।

তবে কি ইনকাম ট্যাক্স ?

আজ্ঞে না।

অ্যাণ্টি করাপশানই তাহলে ?

আজ্ঞে না।

তাহলে আপনি কোন ডিপার্টমেণ্টের ?

তোফাজ্জেলের কারখানায় বিড়ি বাঁধার কাজ করি স্যার। বড় ছেলেটা লায়েক হয়েছে। তার একটা চাকরির জন্যই ঘোরাঘুরি করছিলুম স্যার আপনার কাছেপিঠে। কিন্তু ওফ, ছেলের চাকরির চেয়েও বড় জিনিস আপনি দিয়েছেন স্যার আমাকে। কী নেশা, কী নেশা ! একদিন ঘুষ না খেলেই হাত নিসপিস করে, নাক সুড়সুড় করে মাথা ভোঁ ভোঁ করে। ঘুষের মতো জিনিস হয় না।

অ্যাঁ। বলে গোবিন্দ হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর রাগ করে বলল, আরে মশাই, আপনি তো মহা ইয়ে দেখছি, এঃ আমি আপনাকে ইয়ে মনে করে এতগুলো টাকা গচ্চা দিলুম।

লোকটা সবেগে মাথা নেড়ে বলল, গচ্চা নয় স্যার, লোকশিক্ষা। ঘুষ কাকে বলে কখনও জানতুম না স্যার, আপনার দয়ায় জানলুম। এও জানলুম, ঘুষ ছাড়া মানুষের জীবনটাই আলুনি, বিস্বাদ। কি করে যে এত কাল ঘুষ না খেয়ে বেঁচে ছিলুম তাই ভাবি আর অবাক হই। ঘুষটা বন্ধ করবেন না স্যার, মরে যাবো।

গোবিন্দ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, জোচ্চোর !—তোমাকে ঘুষ দিতে যাবো কেন হ্যা ! তা বলে রাগ করবেন না স্যার। আপনার ভুল হয়নি। ঘুষ জিনিসটায় আমাদের সকলেরই জন্মগত অধিকার। কিন্তু পায় কয়জন ? আপনার দয়ায় এই আমি পেয়েছি।

লোকটা চোখ নামিয়ে নববধুর মতো লাজুক গলায় বলল, সব খবরই নিয়েছি স্যার। হীরের আংটি, চার হাজার টাকা দামের ঘড়ি, পাঁচশো টাকার মাস্টার—

গোবিন্দ লোকটার কাঁধে হাত রেখে হাসলো। বলল, ঠাট্টা করছিলুম, কিছু মনে করবেন না। মাঝে মাঝে আসবেন। পরস্পরকে আমরা না দেখলে কে আর দেখবে।

আজই খাতায় টুকে ফেলব স্যার।

॥ ২ ॥

ক্ষুধা ও জাতীয় সংহতি

ক্ষুধা কথাটার মানে ব্যাকরণ বইতে আছে "খাইবার ইচ্ছা"। চারুবাক মানেটা জানে। আর এও জানে এত বড় ভুল মানে আর হয় না। অন্তত তার ক্ষেত্রে তো বটেই। চারুবাকের খিদে পায়, গনগনে খিদে পায়, কিন্তু কখনও ওই "খাইবার ইচ্ছা" হয় না। পৃথিবীতে এত রকমের খাবার, তার কোনওটাই তার কখনও মুখে তুলতে ইচ্ছে করে না। খাওয়ার কথা ভাবলেই সে ভয়ে শিউরে ওঠে। খাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলেই তার মন খারাপ হয়ে যেতে থাকে। খাবার মুখে তোলা, চিবোনো এবং তা গিলে ফেলা পৃথিবীতে তার কাছে সবচেয়ে অনভিপ্রেত এবং শ্রমসাধ্য কাজ। পেটে খিদে নিয়েই দিব্যি দিন কাটিয়ে দিতে পারে সে। দিনের পর দিন।

শিশুকালে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে তার মাকে হিমসিম খেতে হয়েছে। বুকের দুধ বা ফিডিং বটলের চুষি মুখে নিত না বলে তাকে থাপ্পর মেরে বা চিমটি কেটে কাঁদিয়ে নিয়ে ঝিনুক দিয়ে গেলানো হত। প্রায়ই সেই দুধ উগরে দিত সে।

বড় হয়ে চারুবাক যে বেঁচে আছে এটাই অনেকের কাছে বিস্ময়। তার বউ শীলার কাছেও। শীলা চারুবাকের এই অরুচি দেখে দেখে পাগল হওয়ার উপক্রম। তাকে খাওয়াবেই এই জেদবশে সে হাজার রকমের রান্না শিখেছে, রেঁধেছে, কিন্তু চারুবাক এমনভাবে নাক কুঁচকে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে যে অনেকবার আত্মঘাতী হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে শীলার।

কেন খাবে না, কেন খাও না তুমি? কিভাবে বেঁচে থাকবে তবে?

শীলার এই আর্ত প্রশ্নের সামনে খুবই সংকুচিত হয়ে চারুবাক বলে, বেঁচে তো আছি। রোগ হলেও দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছি তো।

কিন্তু আমি যে এত যত্ন করে রাঁধি, এত আদর করে বেড়ে দিই?

তা বটে, কিন্তু পৃথিবীর কোনও খাবারই আমার রোচে না।

শীলা রাগে, ক্ষোভে, হতাশায় অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকে। চারুবাক নির্বাক হয়ে বিষণ্ণ বদনে বসে থাকে।

চারুবাক ফ্রিজ পছন্দ করে না। বাড়ির মধ্যে দুটি ঘরে সে পারতপক্ষে ঢোকে না—রান্নাঘর আর খাওয়ার ঘর। সে সব্জী বা মাছের বাজারে যেতে খুবই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সে মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেণ্ট দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

একদিন দুদিন পর নিতান্তই বেঁচে থাকার জন্য কিছু না কিছু খেতেই হয় চারুবাককে। সেই সময়টা তার মুখে ফুটে ওঠে ভয়, ক্রোধ, অসহায়তা। ডাক্তররা তার এই অরুচির কারণ খুঁজতে গিয়ে হার মেনেছেন। স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়া বা হাওয়া বদল গেছে বৃথা। চারুবাকের খিদে পায় শুধু, "খাইবার ইচ্ছা" কখনোই হয় না।

একটা সেমিনারে দিল্লি যাচ্ছিল চারুবাক। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। গিন্নি, ছেলে, মেয়ে, শালাশালীর বাহিনী নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেশ ধমক চমক করে কথা বলেন, আত্মবিশ্বাস প্রবল। লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক চারুবাককে পেটে আঙুলের খোঁচা মেরে তিনি অম্লানবদনে বললেন, আমি এদের নিয়ে বেরিয়েছি জাতীয় সংহতি জিনিসটা বোঝানোর জন্য। ঘুরবে ফিরবে, মিশবে, দেখবে, শিখবে তবে না সংহতির বোধটা আসবে।

চারুবাক বলল, তা বটে।

চারুবাকের পেটে দ্বিতীয় খোঁচাটা মেরে ভদ্রলোক বললেন, জাতীয় সংহতি জিনিসটা অত সহজ নয় মশাই। এই যে খালিস্তান নিয়ে লড়ালড়ি গোর্খাল্যান্ড নিয়ে খানাইপানাই কেন জানেন ?

আজ্ঞে না।

খুব সোজা মশাই, খুব সোজা, ভারতীয় হিসেবে তারা নিজেদের আইডেনটিফাই করতে পারছে না যে। এত বড় একটা দেশ, এতগুলো ভাষা, এত ধর্ম আইডেনটিফাই করা কি সোজা ? মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় না ? এই যে আমরা এক পরিবারে এতগুলো লোক একসঙ্গে চলেছি, এই আমরাই মাঝে মাঝে আইডেনটিটি হারিয়ে ফেলি। তাই আমি—

এই সময়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী একটা কাসার রেকাবিতে এক গোছা লুচি আর আলু ছেঁচকি ভদ্রলোককে এগিয়ে দেওয়াতে কথায় বাধা পড়ল। খাবার দেখে চারুবাক তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ঘুমের ভান করতে লাগল।

তবে লোকটা খাওয়া সেরে আরও কিছুক্ষণ জাতীয় সংহতির কথা বলে আপা বাংকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালবেলায় বাংক থেকে নেমে লুঙ্গির কষি আঁটতে আটতে চারুবাকের দিকে চেয়ে বলল, হ্যা যে কথাটা হচ্ছিল। ভারতীয় হিসেবে আমাদের আইডেনটিটি কী মশাই ? অ্যাঁ ! আইডেনটিটিটা কী ? আমি ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ানরা যে এক পরিবারের লোক তা আমি ফীল করব কিভাবে ?

চারুবাকের ট্রেনে ভাল ঘুম হয় না। মেজাজ শরীর দুই-ই বিগড়ে আছে, কোন রকমে দেঁতো হাসি হেসে বলল, প্রবলেম, দারুন প্রবলেম।

নো প্রবলেম। জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে হলে কী করা উচিত জানেন ? ক উচিত—

বলতে বলতে ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ালেন। তাঁর স্ত্রী তাড়াতাড়ি একটা লাল রঙের টুথব্রাস বের করে পেস্ট লাগিয়ে স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিলেন, ভদ্রলোক সবেগে দাঁতে ব্রাশ চালাতে চালাতে বললেন, একটা ফ্যামিলি গড়ে তোলা উচিত। আর ফ্যামিলি গড়ে তুলতে হলে—

বাকি কথাটা পেস্টের পিচ্ছল ফেনায় চাপা পড়ে গেল। ভদ্রলোক বেসিন থেকে মুখ ধুয়ে এসে ব্রাশটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে তোয়ালের মুখ মুছতে মুছতে বললেন, হ্যাঁ ফ্যামিলি গড়ে তুলতে হলে—

কথাটা ভাল শুনতে পেল না চারুবাক। কারণ সে সবিস্ময়ে দেখল ভদ্রলোকের লাল টুথ ব্রাশটা হাতে নিয়ে তাতে ফের পেস্ট লাগিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে করতে রুমের দিকে চলে গেলেন।

চারুবাক একটা শব্দ করল, ওয়াক—

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, ওয়ার্ক দিয়ে কিছু হবে না মশাই। জাতীয় সংহতি ঃ না উঠলে ওয়ার্ক এগোবে কি করে? দেশপ্রেম বলে কিছু আছে এখন রতবর্ষে? কেউ কারও জন্য ফীল করছে?

চারুবাক ফের একটা ওয়াক তুলতে গিয়েও চেপে রইল জোর করে। তার কপালে ম জমে উঠেছিল।

ভদ্রমহিলা ফিরে এসে সেই ব্রাশটায় ফের আর এক দফা টুথপেস্ট লাগিয়ে বড় য়েকে বললেন তাড়াতাড়ি যা, বেসিনের জল ফুরিয়ে যাবে।

মেয়েটা অম্লানবদনে ব্রাশটা মুখে পুরে উঠে গেল। চারুবাক শব্দ করল ওয়াক াক—

ভদ্রলোক তার পেটে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, আপনার দুঃখটা মি বুঝি মশাই, দেশে কাজকর্ম কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু কথা হল কাজটা কার য? দেশ? কোনটা আমার দেশ? বর্ধমান না পশ্চিমবঙ্গ না পূর্বাঞ্চল না রতবর্ষ? সাধারণ মানুষরা যে ভারতবর্ষ কাকে বলে তাই জানে না। এমন কি নেকেই জানে না যে, দেশে এখন ব্রিটিশ রুল নেই, অনেকেই জানে না যে…

বড় মেয়ে ফিরে এসে ব্রাশটা তার মায়ের হাতে ফেরত দিল।

চারুবাক সম্মোহিতের মতো চেয়ে দেখল, ভদ্রমহিলা ফের সেই ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে হলের হাতে দিলেন। ছেলে ব্রাশ মুখে দিয়ে উঠে গেল।

ারুবাক একটা দুর্বোধ্য গর-র-র-র শব্দ করল।

সরকার? ভদ্রলোক তার পেটে আর একটা খোঁচা দিয়ে ধমকে উঠলেন। তারপর ঃ হাঃ করে হেসে বললেন, সরকার হল এক বোবা কালা অন্ধ প্রতিষ্ঠান। কে কোথায় ধুঁকছে, কে কোথায় খাবি খাচ্ছে, কে দুধে ভাতে আছে, কে মরল কে পড়ল কোনও খবরই সে রাখে না, বুঝলেন মশাই? এই যে আমি আপনি এই যে আমরা— এই আমরা সবাই বেঁচে আছি যে যে-যার নিজের দায়িত্বে। সরকার পারবে না মশাই, সরকারের বাপও পারবে না জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে। আসলে—

ছেলেটা ফিরে এল। লাল টকটকে সেই ব্রাশে আবার পেস্ট লাগানো হল। এবার গেল ছোট মেয়ে!

চারুবাক খকখক করে কাশতে লাগল। পেটের মধ্যে কী যেন পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে, গোঁতলানা দিচ্ছে।

চারুবাকের পেটে আর একটা খোঁচা মেরে ভদ্রলোক বললেন, আমরা প্রত্যেকেই যে যার নিজের দায়িত্বে বেঁচে আছি। জানি আমাদের দেখবার কেউ নেই। আর

সেই জন্যই আমরা যে যার নিজের ঘর গোছাতে লেগে যাই। আপনি বঁাচলে চাচার নাম। তবে কিনা—

চারুবাক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখল, সেই লাল ব্রাশে ফের পেস্ট লাগানো হয়েছে এবং ভদ্রলোকের বড় শালা ব্রাশটা নিয়ে বাথরুমের দিকে গেল।

চারুবাক ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বাক্যহারা, বোধহীন হয়ে যেতে লাগল, তার মাথা ভেঁা ভেঁা করতে লাগল।

ভদ্রলোক তার কঁাধে একটা চাপড় মেরে বলে উঠলেন, আর সেই জন্যই এখন ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে ক্ল্যান, লোকাল পার্টি, ধর্মগোষ্ঠী। যেন ছোট ছোট সব ফ্যামিলি, হ্যাঁ, ফ্যামিলি, আর সেই সব ফ্যামিলিতে ফ্যামিলিতে গড়ে উঠছে—

বড় শালা ফিরে এল। সেই লাল টকটকে ব্রাশটা নিয়ে এবার গেল ছোটো শালা।

চারুবাক অজ্ঞান হয়ে যাবে কিনা বুঝতে পারছিল না। সে অবশ হাতে নিজের নাড়ী দেখতে লাগল। নাড়ী চলছে, তবে অতি ক্ষীণ।

ফ্যামিলি! বুঝলেন? ফ্যামিলি! এই ফ্যামিলি ফীলিংটাকে যদি আরও বড় করে দেন যদি ফ্যামিলির মধ্যে গোটা ভারতবর্ষকে টেনে আনতে পারেন, যদি—

ছোটো শালা ফিরে এল। চারুবাক আর পারল না। অস্ফুট গলায় সে বলার চেষ্টা করল ব্রাশ···ব্রাশ···

ভদ্রলোক থমকে গেলেন, ব্রাশ? আরে আরে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, টুথ ব্রাশ আনেননি তো? তাতে কী হয়েছে? আমাদেরটাই নিন না। নিজেকে আমাদের ফ্যামিলির একজন বলে ভাবুন। আরে এইভাবেই তো ফ্যামিলি ফীলিং বাড়ে, এই ভাবেই তো, ··ওগো ও খেঁদীর মা, দাও দাও ব্রাশে একটু পেস্ট লাগিয়ে দাও—

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে চারুবাকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন এখনও বেসিনে জল আছে। তাড়াতাড়ি চলে যান, এর পর আর···

সম্মোহিতের মতো উঠে দঁাড়াল চারুবাক। নিজের নয়, যেন অন্য কারও ইচ্ছা শক্তিতে চালিত হচ্ছে সে। কী হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না। তার গা ঘিন ঘিন করছে, পেটের মধ্যে উথালপাথাল, গলায় আটকে রয়েছে বমি।

টলতে টলতে চারুবাক বেসিনের কাছে এল। আয়নায় ওটা তো তারই মুখ হ্যাঁ, তারই। তবু মুখটা যেন প্রাত্যহিক নয়। অন্যরকম।

লাল ব্রাশটা সমেত হাত উঠে এল মুখের কাছে। চারুবাক সভয়ে চোখ বন্ধ করল।

তারপর অবধারিত টের পেল, দঁাতের সঙ্গে ব্রাশের সংঘর্ষের সেই চির পরিচিত শব্দ। কুড়কুড় কুড়কুড় ঘুসঘুস, ঘ্যাস ঘ্যাস···

মুখ ধুয়ে ফিরে এল চারুবাক। আশ্চর্য তার ঘেন্নাপিত্তি গেল কোথায়? কেমন যেন ফুরফুরে লাগছে নিজেকে! জ্বর সেরে গেলে যেমনটা হয় তেমনই যেন! লাল ব্রাশটা সহর্ষে ওপরের দিকে তুলে ধরলেন ভদ্রলোক। তারপর চেঁচিয়ে বললেন আর কারও লাগবে দাদা! দয়া করে বলবেন। বী ওয়ান অফ আওয়ার ফ্যামিলি, ব

এ গুড সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, লজ্জা করবেন না…

একটার পর একটা কুণ্ঠিত হাত এগিয়ে আসতে লাগল একে একে।

একটা স্টেশন এসে গেছে। প্ল্যাটফর্মে পুরী তরকারী, সিঙাড়া কচুরি বিক্রি হচ্ছে।

চারুবাক হাঘরের মতো খাবার কিনে গোগ্রাসে খেতে লাগল। তার অরুচি সেরে গেছে।

॥ ৩ ॥

বাজি ও কুকুর

বাজির শব্দে কুকুরটা ভয় পেয়ে খাটের তলায় ঢুকেছে। আর সেখান থেকেই পরিত্রাহি আর্তনাদ করে যাচ্ছে। একটানা একঘেয়ে, স্নায়ুবিদারক। ডিউক খুবই ভাল জাতের অ্যালসেশিয়ান কুকুর। কখনও কাঁদে না বা ডাক ছেড়ে চেঁচায় না। ধমক শোনে, আদর সোহাগ বোঝে। কিন্তু কালীপুজোর দিন তার সব শিক্ষাদীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে সে রাস্তার কুকুরের মতোই চেঁচায়।

রণেন অনেকবার চেষ্টা করেছেন ডিউককে ঠাণ্ডা করতে অন্তত চুপ করিয়ে রাখতে। পারেননি। এখন কুকুরের চিৎকারে তাঁর স্নায়ু বিকল হওয়ার যোগাড়।

ডিউকের সঙ্গে রণেনের তেমন মাখামাখি নেই। গৃহপালিত পশুপাখি তাঁর পছন্দ নয়। ছেলেবেলায় আদরের কুকুর, বেড়াল, ও পাখির মৃত্যু কয়েকবার দেখেছেন, পোষা খরগোশ তাঁর কোলেই মরে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি আর পশুপাখি পোষেননি।

ডিউককে কোন এক কুকুর-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে এনেছিল তাঁর ছেলে লুকু। এনেছিল তাঁর জন্যই। বছর দেড়েক আগে রণেনের স্ত্রী রত্নাবতী আকস্মিকভাবে মারা যান। রণেন যে খুব ভেঙে পড়েছিলেন তা নয়। তবে একটু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। লুকু ধরে নিয়েছিল, তিনি পত্নীশোকে ভেঙে পড়েছেন। নানাভাবে রত্নাবতীর শূন্য স্থান পূরণের একটা অক্ষম চেষ্টা লুকু করেছে। কাজটা সে ছেলে বলেই করেছে। কিন্তু ফলটা ভাল হয়নি। রত্নাবতী মারা যাওয়ার পর তাঁকে পুরী এবং ভুবনেশ্বর ঘুরিয়ে এনেছিল লুকু এবং তার জন্য নিজের বউ সুমিতার কাছে যথেষ্ট কটু কথা শুনেছে। আদিখ্যেতা আজকালকার মেয়েরা পছন্দ করে না। তার ওপর এই কুকুর। লুকুর ধারণা, কুকুরটা সঙ্গী হিসেবে থাকলে রণেনের মনটা একটু ভাল থাকবে, বিদেহী পত্নীপ্রেম হয়তো বা কুকুরকে কেন্দ্র করে একটা আশ্রয় পেয়ে যাবে। পায়নি, বলাই বাহুল্য, কারণ রণেনের পত্নীপ্রেম ছিল না। সারমেয় প্রেমও তার দরকার নেই। তবু লুকু পাছে দুঃখ পায় সেই ভেবে তিনি প্রথম প্রথম জোর করে কুকুরটাকে একটু একটু লাই দিতেন। তারপর সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। আসলে বুড়ো বয়সে একটাই অভাব থাকে। কথা বলার

লোক থাকে না। আর বুকে এক গাদা কথা জমে থাকে কাউকে বলবার জন্য। যেমন ছিল তার নাতি জয়। কিছু বুঝত না, কিন্তু শুনত। বলতও অজস্র। ঠিক যেমন বন্ধুরা হয় আর কি!

একদিন লুকুকে তিনি বলে ফেলেছিলেন, জয়টা যদি কাছে থাকত তবে বেশ হত।

লুকু অবাক হয়ে বলল, সেটা কী করে সম্ভব?

রণেন জানেন, সম্ভব নয়। তাঁর একমাত্র নাতি জয়কে বছরখানেক হল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে যে ভর্তি করা হয়েছে। ওরকম নামী স্কুলে ভর্তি করা গেছে সেইটাই লোকে সৌভাগ্য বলে মানবে। সুতরাং তাকে আর কাছে পাওয়ার আশা করা বৃথা। তবে স্কুল বন্ধ থাকলে আসে। এখন যেমন এসেছে। তবে সেই আগের জয় আর নেই। এক বছরের মধ্যেই কেমন একটু সাবালক এবং ভারিক্কি হয়েছে। দাদু-দাদু এখনও করে বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু কেজো মানুষ হয়ে গেছে, সেই নেই-আঁকড়ে আবদেরে ভাবটা আর নেই।

ঘাড়ে দীর্ঘদিনের স্পণ্ডেলাইটিসের ব্যাথা। তবু নিচু হয়ে চৌকির তলায় কুকুরটাকে দেখবার চেষ্টা করছিলেন রণেন। গলা তুলে কেঁ-উ কেঁ-উ করে ডাকছে। সন্ধে থেকে ডাকছে বলে গলাটা কি একটু ভাঙা ভাঙা?

বাড়িতে রণেন আর রান্নাবান্নার লোকটি ছাড়া কেউ নেই। শমিতাদের বাড়ি বাগবাজারে বিরাট কালিপুজো হয়। অনেক টাকার বাজি পোড়ে, গোটাকয়েক পাঁঠা বলি হয়। ওরা আজ ওখানেই থাকবে। তবে লুকু ফিরে আসতে পারে। সেইরকম বলে গেছে।

শিবু। শিবু। আবার ডাকলেন রণেন। এ পর্যন্ত বহুবার ডেকেছেন। শিবু ফ্ল্যাটে বা আশেপাশে নেই। রান্নাঘর খোলা পড়ে আছে, বাতি জ্বলছে। পনেরো ষোলো বছরের ছেলেকে আজকের রাতের অন্যমনস্কতার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। দশতলার ছাদে বাজি পোড়ানো হচ্ছে, একতলায় পুজো। তারই কোথাও গিয়ে সেঁটে আছে। ডাল ভাত তরকারি ঝোল সব ওবেলাই রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। রাতে শুধু গরম করে দেবে। রণেন রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে খান না। সুতরাং শিবু নিশ্চিন্ত।

রণেনের ফ্ল্যাটটা বেশ বড়ই। দেড়হাজার স্কোয়ার ফুট। সস্তাগণ্ডার সময়েও সোয়া লাখ দাম পড়েছিল। এখন হেসে খেলে ছ-সাত লাখ টাকা। রত্নাবতীর নামেই আছে। এই ফ্ল্যাটে রণেনের নিজস্ব একখানা ঘর আছে। সবচেয়ে ছোটো ঘরখানাই তিনি বেছে নিয়েছেন। সেই ঘরে জিনিসপত্র বলতে গেলে কিছুই নেই। খরচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনকেও সংকুচিত করে ফেলেছেন তিনি! জামাকাপড়ের ওয়ার্ডরোব একসময়ে উপচে পড়ত। আজকাল একজোড়া হাওয়াই আর একজোড়া বেরোনোর চপ্পল। বারোটা লাইটার ছিল। সিগারেট ছেড়েছেন তিন বছর আগে। এখন একটাও লাইটার নেই। বক্স খাটটা ছেলেকে দিয়ে একখানা সাধারণ চৌকি পেতে নিয়েছেন ঘরে। আর একখানা ইজিচেয়ার। ছোট্ট একটা টেবিল।

.নর বিষয় সম্পত্তি বলতে এইটুকুই। তবে বইপত্র কিছু আছে, কিছু সাময়িক ত্রা। এগুলোই তার অবসরেরর সঙ্গী।

কাচের শার্শি সবই বন্ধ। তবু বীভৎস লাগাতার বাজির শব্দ ঠেকানো যাচ্ছে এরকম ছেদহীনভাবে বাজি পোড়াতে হলে কত টাকা খরচ হতে পারে তা রণেন ব পান না। তার ওপর এই শব্দ সহ্য করার জন্য শক্ত নার্ভও চাই। বাজির র সঙ্গে ডিউকের চিৎকার রণেনকে যেন খান খান করে ভেঙে ফেলেছে।

অন্য সব ঘরের দরজা বন্ধ এবং চাবি দেওয়া। কেন কে জানে, ওরা কোথাও লে ঘরগুলো সব বন্ধ করে রেখে যায়। শুধু বসার ঘর আর রান্নাঘর খোলা ়। রণেনের অন্য কোনও ঘরে গিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় নেই, বসার ঘর ছাড়া। তু বসার ঘরটা গিয়ে শেষ হয়েছে গ্রীল দেওয়া বারান্দায়। সেখানে কোনও চর শার্শি নেই। এই সাঙ্ঘাতিক, প্রাণঘাতী বাজির শব্দ সেখানে আটকানো যাবে আর তিনি গেলে ডিউকও তাঁকে অনুসরণ করবেই।

অসহায়ভাবে রণেন ইজিচেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিন খুলে অন্যমনস্ক হওয়ার টা করলেন। কিন্তু ভিতরটা এমন কাঁপছে, এত অস্থির লাগছে যে, উঠে তে হল।

ঘাড়ের ব্যথা নিয়েই আবার নিচু হলেন। ডিউক! ডিউক!

ডিউক ফিরে তাকাল এবং বলল, কী বলছ?

রণেন ছিটকে পড়লেন মেঝেয়। মাথাটা ঝিমঝিম করল। আজকাল বুড়ো সে কি ভীমরতি ধরল! না কি স্বপ্ন দেখছেন?

বাঁ কনুইতে একটু চোট পেলেন। তবে তেমন কিছু নয়। ফের উঠলেন ন। সভয়ে নিচু হয়ে ডিউকের দিকে চাইলেন। ডিউক দু থাবার মধ্যে মাথা খে কেঁ-উ কেঁ-উ করে কাঁদছে।

ডিউক!

তখন থেকে কেন যে ডাকছো! আমি বেরোবো না। যাও।

বুকটা ধক করে উঠেই যেন কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থেমে গেল। তবে ফের ল। ধড়াস ধড়াস করে। একটু শ্বাসকষ্টও হতে লাগল রণেনের।

সাবধানে আবার ডাকলেন, ডিউক!

তখন থেকে কেন যে ফ্যাচ ফ্যাচ করছ! কী চাও বলো তো!

অবিশ্বাস্য। সম্পূর্ণ ভৌতিক! অলৌকিক! তবু রণেন এবার নিজেকে শক্ত খলেন। কাঁপা গলায় বললেন, তুই কি কথা বলতে পারিস!

পারি। তবে এখন কাঁদছি। কাঁদতে দাও।

কাঁদছিস কেন?

আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়েছে।

পূর্বজন্ম? ওরকম কিছু সত্যিই আছে নাকি?

আছে। না থাকলে মনে পড়বে কেন?

পূর্বজন্মে তুই কি ছিলি ? কুকুরই তো !

না। তবে কুকুরের অধম। বারোটা ছেলেপুলে ছিল। না খেয়ে খেয়ে, রো ভুগে চোখের সামনে মরেছে। দুটোকে চোর বলে পিটিয়ে মারে। একজন জে খাটত। সে বেঁচে আছে কিনা জানি না। রাস্তার কুকুরের মতো এঁটো-কাটা খু খেতুম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম, কুকুরের মতোই যদি বেঁচে আছি ত কুকুরই করলে না কেন ? সেই প্রার্থনা ভগবান বোধহয় শুনেছেন। বাজির শ মাথাটা কেমন ঝিলমিল করছিল, হঠাৎ সব মনে পড়ল।

এ জন্মে তোর কেমন লাগছে ?

সুখে আছি, বেশ সুখে। আগের জন্মের চেয়ে ঢের ভাল মাংসের সুরুয়া খা গমের খিচুড়ি, সাত তলায় বাস, সুখের বাকি কী ? শুনলুম তোমার ছেলে আমা সাত'শ টাকায় কিনেছে। শুনে ভারী আনন্দ হল। আমার এত দাম হবে ভাবি কখনো।

চুপ, চুপ। অত টাকায় তোকে কেনা হয়েছে তা খবরদার বলিসনি : তাহ লুকুকে তার বউ বকবে।

জানি। লুকু কমিয়ে বলেছে। সত্তর টাকা। তাইতেও বাপান্ত হচ্ছে। কিন্ত যার জন্য কেনা হল সে তো পাত্তা দিচ্ছে না।

রাগ করিস না ডিউক। আমি কি জানতুম যে—

তোমার বউয়ের অভাব আমি মাদী কুকুর হয়েও পূরণ করতে পারব না বাপ তা ঠিক।

তুই মাদী নাকি ?

তাও জানো না ! আচ্ছা লোক বাপু !

তোর নাম যে ডিউক।

সে যদি তোমরা নাম দাও তাতে আমার কী করার আছে ?

আগের জন্মে মন্দা ছিলি ?

না, মাদীই। বললুম না রাস্তার কুকুরের মতো জীবন ছিল। বারোটা বাচ্চ হল' বারোটা পুরুষের দোষে। তারা কেউ আমার স্বামী ছিল না। আমি তে বেওয়ারিশ, বেশ্যার অধম।

খুব কষ্ট ছিল তোর।

এখনও আছে। বড় কষ্ট। এখন যাও ইজিচেয়ারে বসে থাকো গে। আ একটু কাঁদি।

কাঁদ ডিউক।

রণেনের ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। একাই একটু হাসলেন তিনি। খুশি লাগছে মনটা। কথা বলার মতো একজনকে পাওয়া গেল এত দিনে। সময় কেটে যাবে।

কলিকাল

উ পালিয়ে গেলে যেমন যেমন মনে হয় মানুষের, চিতি মণ্ডলের ঠিক তেমন তেমন া। সময়টা খারাপই পড়েছে তার। গোবিন্দ বিশ্বাস তিসি বাবদ টাকাটা না, ঝাড়ের বাঁশ লোক লাগিয়ে সব কাটিয়ে নিয়ে গেল কালী হাজরা, বড় ভাই চাকে ভেন্ন করে দিল, এইসব নানারকম আর কি।' বলতে গেলে লিস্টি দাঁড়াবে গজ। তো তার মধ্যে বউ-পালানোটাও একটা। গেছে আপদ গেছে, একটা কমল, কিন্তু আবাগীর বেটি কোন আক্কেলে যে হামা-টানা ছেলেটাকে ফেলে সেটাই বুঝতে পারে না চিতি।

চির বউ লীলাময়ী হল খাণ্ডারস্য খাণ্ডার। চোখ দুখানা সর্বদাই তাড়াং ং করে চারদিকে নজর করছে। রাত পোয়াতে না পোয়াতেই তার গলা চারদিকে ঝালনুন ছিটোতে শুরু করে। স্বামী, শাশুড়ী, নিজের পেটের সন্তান, পড়শী থেকে শুরু করে কাক চিল কুকুর বেড়াল কার ওপর না ঝাল ঝাড়ে ময়ী। আর ওই গলার এমনই লীলা যে বাদবাকি সবাই যেন কেমন ভ্যাবলা চুপ মেরে যায়।

দিন তিনেকে চিতি মণ্ডলের হাঁফ ধরে গেল ছেলে সামলাতে। আসলে সে হল ুখো লোক। খালধারে তার গাঁজার আড্ডা আছে। শিবুবাবুর হাটের ন আছে তাড়ির আড্ডা। নয়াগঞ্জের খারাপ পাড়াতেও যাতায়াত ছিল। তার সারা দিনমান পেটের ধান্ধায় নানা ফন্দিফিকির তো আছেই। তাই ছেলে মাথা ঘামায়নি কোনোদিন। তখন কচি তাকে ভেন্ন করেনি বলে ছেলে লানোর লোকও ছিল মেলা। মা, ভাইপো ভাইঝি, এমন কি কুগড়ুটে লীলাময়ী ধ। ভেন্ন হওয়ার পর চিতির বউ একটু অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এখন নিজে পড়েছে অগাধ জলে।

উঠোনের মাঝখানে নতুন বাঁশের বেড়া দিয়েছে কচি। এধারে ওধারে যাতায়াত । এমন কি মা অবধি লীলাময়ীর ভয়ে এধারে উঁকি মারে না।

সকালবেলায় চিতি দাওয়ায় বসে মাথায় হাত দিয়ে সাত পাঁচ ভাবছে। ছেলে হামা টেনে গিয়ে উঠোনে পড়ে থাকা উদুখল ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।' ক হাগে কখন মোতে তার ঠিক নেই, আর কখন যে খিদে পায় বাপ। পুরোটাই ভা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। বাপ হতে গেলে কিরকম কিরকম হতে হয় সেটাই মাথায় আ না চিতির।

তার মতো লোকের যে বউ থাকবে না এ তো জানা কথাই। বউটা বছর দ ছিল এই ঢের। পালিয়েছে তো চিতি বেঁচেছে। বড় ঝঞ্ঝাট করত। কিন্তু য ছেলেটাকেও নিয়ে যেত তাহলে ঝাড়া হাত-পা হতে পারত চিতি। দিব্যি হেসে খে বেড়াতে পারত। কেন নিয়ে গেল না সেইটেই রহস্য।

বেড়ার ওপাশে কে যেন ঘোরাঘুরি করছে। সাদা কাপড়। মা না?

চিতি একটু গলা খাঁকারি দিল, মা নাকি গো?

মা প্রথমটায় জবাব দিল না। বোধহয় চারদিক দেখে নিল। লীলাময়ী বোধ কাছেপিঠে নেই। তাই নিচু গলায় বলল, ছেলেটা কী করছে?

খেলছে উঠোনে।

খেয়েছিল?

মুড়ি খেল।

বিন্দুর কাছে নিয়ে যা। বলে রেখেছি। ঝিনুকে করে এক বাটি দুধ খাই দেবে 'খন।

খেলেই যে হাগবে। সেসব পরিষ্কার করবে কে?

তুই করবি। হাগবে বলে না খাইয়ে মারবি নাকি ছেলেটাকে পাগল? যা যা।

ঝঞ্ঝাট, চিতি উঠল। ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টানে কোলে চড়িয়ে বেরিয়ে পড় বিন্দুর বাড়ি পুকুরের ওধারে। তাদেরই জ্ঞাতি বোন। আত্মীয় জ্ঞাতি কে চিতিকে ভাল চোখে দেখে না। এমন কি পালে পার্বণে কারু বাড়ি থেকে এব নেমন্তন্নও পায় না চিতি। বউ পালিয়ে যাওয়ার পর কেউ ছেলেটাকে যত্নআ করার গরজ পর্যন্ত দেখায়নি।

পুকুরধারে দাঁড়িয়ে একটু নজর করল চিতি। বিন্দুদের বাড়ির বাইরে এব খোলা দোচালা আছে। শানবাঁধানো। সেখানে এই সকালের দিকে গাঁয়ের প সাতজন বুড়োসুড়ো মানুষ এসে জোটে। তাদের মধ্যমণি হল বিন্দুর শ্বশ গোবিন্দ বুড়ো। অ্যায়সা তে-এঁটে খচ্চর লোক খুব কম দেখেছে চিতি। ঘটন মনে করলে এখনো গোবিন্দর খড়মের ঘা চিতির মাথায় ঝিন ঝিন করে ওঠে।

হয়েছিল কি, বিন্দুর বর নারায়ণকে একটু ফুর্তির লাইন ধরিয়ে দিতে চেয়ে চিতি। পুরুষমানুষের জন্য দুনিয়ার চারদিকে কত আনন্দের হাট খুলে বসে আ মানুষ। নারায়ণটা একেবারেই মাদীমার্কা পুরুষ। কিছুতেই মদ গাঁজা খাবে মদ ছোঁবে না, মেয়েছেলের নামে জিব কাটবে। চিতিও তেমনি ট্যাটন। একটু এ করে সইয়ে সইয়ে, ভুলিয়ে ভালিয়ে সবই চাখালে। চাখতে তেমন খারাপও লাগ

শেষ দিকটায় নারায়ণের। তবে বড় ভয় পেত। বলত, বাবা টের পেলে পঃতে লবে।

টের পাওয়ার কথা নয়। ছেলে লায়েক হয়েছে, বাইরের দুনিয়ায় চরে বরে খায়, ড়া বাপের অত খতেন নেওয়ার দরকার কী? কিন্তু গোলমাল পাকালে বিন্দু। দিন একটু দিশি জিনিষের চালান হয়েছিল বেশী রাত্তিরে। অন্যদিন যেমন এক কি খেল কি না খেল, ঘণ্টা তিন চার পায়চারী করে, বার দুই চার পেচ্ছাপ করে, ছের তুলসীপাতা চিবিয়ে, জর্দাপান খেয়ে, তারপর আবার দাঁতন করে ঘরে ফিরত ায়ণ সেদিন তেমনটি হয়নি। বিন্দু মাঝরাত্তিরে চেঁচামেচি করে উঠতেই নারায়ণ হাম্মকটা ভ্যাড় ভ্যাড় করে সব গুপ্ত কথা কবুল করে দিলে। সেই রাত্তিরেই রায়ণের দুই ভাই আর তাদের সাকরেদরা এসে চিতিকে তুলে নিয়ে গেল। তারপর রের চোটে বৃন্দাবন দেখল চিতি। গোবিন্দবুড়োর রাগের আরো কারণ, তারা ষ্টম, আর নারায়ণ ছেলেটাও ভাল। ভাই তার খদ্দেরের খটাখটি কিছু জোরদার রছিল। আজও ভাবলে মাথাটা কেমন যেন ঝকাং ঝকাং করে ওঠে।

চাতালটায় বুড়ো আজ নেই। একটা ছাগল দাঁড়িয়ে নাদি ফেলছে ভুরভুর করে। বু সদর দিক দিয়ে যেতে ভরসা পায় না চিতি। একটু ঘুরে ...র গোয়াল ঘরের ...ন দিয়ে উঠোনে উঁকি দেয়। বিন্দু তার বছরটাকের ছেলেটাকে ট্যাঁকে নিয়ে টা চট খুলে দিয়ে টেনে উঠোনের রোদে দিচ্ছে।

বিন্দু!

কে?

আমি। চিতি।

বিন্দু এগিয়ে এল। মুখখানা ভীষণ গম্ভীর।

চিতি বিগলিত মুখে বলল, মা এটাকে পাঠিয়ে দিল। বলে ছেলেটাকে দেখায় তি।

বিন্দু নিজের ছেলেকে উঠোনে নামিয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে একটুও হেসে বলল, তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, দুধ খাইয়ে দিয়ে যাচ্ছি। একেবারে য়ে যেও।

ইচ্ছে হলে এবেলাটা রেখেও দিতে পারিস তুই। মা-হারা ছেলে তো, তোর কাছে ন থাকবে।

মা-হারা মানে? ওর মা কি মরেছে নাকি।

না, তা নয়। তবে ওইরকমই আর কি।

তোমার মুখে আগুন। ছেলে আমাকে গচ্ছিত রেখে ফুর্তি করতে যাবে সে না। এখানে দাঁড়িয়ে তুমি থাকো, দুধ খাইয়ে নিয়ে যাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিতি দাঁড়িয়ে থাকে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। এই যে দিকে সব ঘরপোষা গেরস্ত লোক এরা বোধহয় ভালই আছে। এদের ধারণাটা রকম। দিব্যি ছেলেপুলে বউ নিয়ে মেপেজুখে থাকে। এদের দিন আছে,

রাত আছে, ভালমন্দ আছে। এদের হিসেবে চিতির চলে না। তার দুনিয়াটা অন্যরকম।

ওই যে তোটনবাবু তার বাইরের বারান্দায় বসে তার দিকে চেয়ে আছে ওই আর এক গেরস্ত। ভারী সুখী লোক। চিতি লোকটাকে অমন চেয়ে থাকতে দেখে কদম গাছটার পিছনে একটু আড়াল হল।

তোটনকে কেউ যদি বাবু ভাবে তো বাবু। আবার না যদি ভাবে তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। যে যেমন দেখে আর কি। তবে তাকে বাবু ভাববার একটা কারণ এই যে, সে বি. ডি. ও. অফিসের কেরাণী। সরকারি চাকরি। গাঁয়ে এ চাকরির খাতির আছে।

এমনিতে তোটন কিছু খারাপ নেই। একটু জমি জিরেত আছে। তোটনের দুঃখ অন্য জায়গায়। সে তার মা বাপের একমাত্র সন্তান। আদরের বহরটা একটু বেশীই ছিল, তার ওপর এক জ্যোতিষ ভয় দেখিয়ে রেখেছিল, এ ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছাড়বে। পাছে বংশরক্ষা না হয় সেই ভয়ে তার বাপ তাকে তিন বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে এক বছরের কনে সন্ধ্যারাণীকে ঘরে এনে ফেলেন। তা মেয়েও মরুনে ঘরের। সন্ধ্যার আগে তার চার চারটি বোন হয়ে আঁতুরে বা বছরটাকের মধ্যেই মরে যায়। তাই এই মেয়ে নিয়ে বড় ভয় ছিল মা বাপের। তাই তার এক বছরের মেয়েকেই তড়িঘড়ি গোত্রান্তর করে পরের হাতে তুলে দেয়। তাতে যদি বাঁচে।

তা বেঁচে গেল সন্ধ্যারাণী। কিন্তু মুশকিল হল, ছেলেবেলা থেকেই তাকে শেখানো হয়েছিল, সন্ধ্যা হল তার বোন। সন্ধ্যা আর তোটন সেইভাবেই বড়সড় হল। পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো, চুলোচুলি ঝগড়া কাজিয়া, নালিশ লেগেই ছিল। তারা যে স্বামী স্ত্রী এটা বড় একটা আর কারোও বিশেষ খেয়াল থাকত না। তবে ভাইবোনের মতো বড় হলেও তাদের ভাইফোঁটা হত না, আর সেটাই রহস্য লাগত তোটনের কাছে।

সে সব রহস্য ভাঙল পনেরো ষোল বছর বয়সে, যখন সন্ধ্যাও ডাগরটি হয়েছে। দুজনকে ডেকে দুপক্ষের বাপ মা যখন সব বুঝিয়ে বলল তখন তারা অগাধ জলে। এ কী কাণ্ড! সন্ধ্যা কি না তার বউ? ঝগড়ুঠে, কুঁদুলি, নালশেকুটি সন্ধ্যা? সন্ধ্যারও সেই ভাব।

লজ্জা! লজ্জা! দুজনে আর দুজনের দিকে চাইতে পারত না। দেখা হলেই ছুটে পালাত। ছেলেবেলা থেকেই দুজনের এক বিছানা। কিন্তু সেই বিছানা এখন দুজনেরই শয্যাকণ্টকী।

আজ তোটন আর সন্ধ্যা আরো বড় হয়েছে। তোটনের ত্রিশ বত্রিশ, সন্ধ্যাও ত্রিশের কাছাকাছি, আজ তারা বোঝে যে তারা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু বুঝেও তারা হয়ে উঠতে পারে না। তোটনের বাবা মা চায় ছেলে তাড়াতাড়ি বংশরক্ষা করুক, ছেলেপুলে দিয়ে ঘর ভরে দিক। কিন্তু বিছানায় যে দুজনের মধ্যে এক শক্ত আগল

ড়া হয়ে আছে সেটা ভাঙবে কে? শিশু বয়স থেকে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল গত পনেরো ষোলো বছরেও সেটা আর ভাঙতে পারেনি। ভাঙতে চাইলে যে ভাঙা যায় না এমন নয়, আবার ভাঙলেই যে ভাঙা যায় এমনও নয়। কি একটা বাধা য় আছে। দু'জনেই নিশুত রাত অবধি জেগে থেকে বেড়াটা ভাঙার চেষ্টা করে দেখেছে, কী যেন একটা বাধা হচ্ছে।

আজ তোটনের ছুটি। বারান্দায় বসে সে একখানা উপন্যাস পড়ছে। উপন্যাস ড়তে তার খুব ভাল লাগে।

সন্ধ্যা এক বাটি মুড়ি আর তেলেভাজা এনেছিল। তোটন খানিক খেয়ে বাটি রিয়ে রেখেছে। সন্ধ্যা চা নিয়ে এল। আগে এসব চল ছিল না তাদের বাড়িতে। ড়ির পর আবার চা কিসের? আজকাল চল হয়েছে।

সন্ধ্যা, ওই লোকটাকে দেখছিস, ওই কদমগাছের আড়ালে?

ওমা, ও তো চিতি! কেন বল তো!

না, বলছিলাম কি, ওর বউটা পালিয়েছে।

আহা, কে না জানে। পালাবে না তো কি? ওটা কি একটা মানুষ?

সে কথা বলছি না।

তবে কী বলছিস?

বউটা একটা বাচ্চা রেখে গেছে। বোধহয় সাত আট মাসের।

হ্যাঁ।

সেই বাচ্চাটা নিয়ে খুব বিপাকে পড়েছে চিতি।

পড়ুক। যেমন কর্ম তেমন ফল।

আহা, চিতি খারাপ বলে তো আর তার কুঁচোটা ফেলনা নয়।

একই রক্তের ধাত তো। একইরকম হবে।

তোর একদম মায়াদয়া নেই রে সন্ধ্যা।

থাকবে না কেন! তেমন লোকের জন্য আছে। ওর জন্য নেই। বউটাকে কদিন ঘরের চালের বাঁশ থেকে হেঁটমুণ্ডু করে ঝুলিয়ে রেখেছিল তা জানিস?

সে জানি। লোকটাকে সবাই একঘরে করেছে তাও জানি। কিন্তু তাতে চিতির কছু যাবে আসবে না, মাঝখান থেকে বাচ্চাটা মরবে।

সন্ধ্যা এ কথার কোনো জবাব দিল না। একটু এগিয়ে বারান্দার ধারে দাঁড়াল। চালটা নিচু, হাত বাড়ালেই ওপরে কাঠের কাঠামোটা ধরা যায়। দু'হাত উঁচু করে কাঠটা ধরে একটু শরীর ভেঙে আধো ছায়া আর আধো রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যা। চমৎকার দীঘল শরীর: বাড়তি মেদ নেই, আবার খামতিও নেই কিছুর। খুব সুন্দরী না হলেও সন্ধ্যার চেহারায় একটা আলগা চটক আছে, লক্ষ করেছে তোটন। কিন্তু তবু তার কেন যেন বাধো-বাধো রয়ে গেল। আজও একদৃষ্টে চেয়ে রইল তোটন। স জানে সন্ধ্যা তার বউ। শিশুকাল থেকে এক বিছানায় তারা শোয়।

সেটাই কি ভুল হয়েছিল? শিশুকাল থেকে যদি এক বিছানা না হত তাদের,

যদি শেখানো না হত যে তারা ভাইবোন, যদি পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো একসঙ্গে না বড় হত তারা ?

সন্ধ্যা ফিরে তাকিয়ে বলল, বিন্দুর কাছে এসেছে।

কে ?

চিতি। ছেলেটাকে বিন্দু দুধ খাওয়াচ্ছে বারান্দায়। বড্ড মায়া হয়।

হবেই তো। তাই একটা কথা ভাবছিলাম।

কী ভাবছিলি ?

ছেলেটাকে চেয়ে নেবো কিনা।

চেয়ে নিবি ? কেন ? সন্ধ্যা অবাক হয়ে তাকায়।

বাবা তো নাতি-নাতনির জন্য অস্থির। তা বুঝলি, ভাবছিলাম চিতির ছেলেটাকে পুষ্যি নিলে কেমন হয় !

কথাটার মধ্যে কী ছিল কে জানে, সন্ধ্যা হঠাৎ কেমন যেন ছটফট করে উঠল। তারপর আঁচলে মুখটা আড়াল করে দুদ্দাড় বেগে পালাল ভিতরবাগে।

বজ্রাহতের মতো বসে থাকে জোটন। তাই তো ! সন্ধ্যা বাঁজা কিনা তার পরীক্ষা আজও হয়নি। যেমন সে আজও জানে না সে নিজে উৎপাদনক্ষম কিনা, আজ অবধি কখনো সন্ধ্যাকে চুমুও খায়নি জোটন। দেখেনি ওর শরীর। এ জন্মে আর হবে না।

কিন্তু তবু পরীক্ষা না হলে পুষ্যিই বা নেওয়া যায় কি করে ? তাছাড়া পুষ্যি নিলে বাড়িতে বাবা আর মা তাণ্ডব করবে। তারাও জানে এবং কি করে যেন টের পায় যে ছেলে আর বউতে এখনো ভাইবোন। আর সে কথা ঠারেঠোরে প্রকাশ করে ঠেস দিতেও ছাড়ে না তারা। বাবা আজকাল বলে, কপালে সন্নিসি ছেলে ছিল, জুটল আবার বৈরিগী বউ। বয়সের দুটো মন্দা মাগী এমন বরফ হয়ে জমে থাকে জন্মে দেখিনি বাবু। ঘোর কলি।

এর ওপর পুষ্যি নিলে রক্ষে আছে ?

কলিকালটা যে বেশ জেঁকে বসেছে এটা জয়লালও টের পায়।

তিন মাইল ঠেঙিয়ে সাইকেলখানা আল থেকে তুলে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে জয়লাল গামছা দিয়ে মুখ আর গলার ঘাম মুছল। চাষাড়ে ঘাম, এ জিনিস ফিনফিনে রুমাল দিয়ে মোছবার নয়। গামছাখানা কোমরে বেঁধে সাদা শার্টের ঝুলে চাপা দিয়ে সাইকেলে ওঠার জন্য তৈরী হল জয়লাল। এতক্ষণ ঠেলে এনেছে। তোয়াজের শোধ এবার ঘাড়ে চেপে তুলবে।

কিন্তু সাইকেলখানার জন্য মায়াও হয় জয়লালের, মাডগার্ড সামনের চাকায় অর্ধেক নেই। পিছনের মাডগার্ডে শতেক ফুটো। ব্রেক চাপলেও অনেকটা ঘষটে গিয়ে থামে। দুটো চাকাই একটু একটু নড়ে। সীটখানা মাঝে মাঝে হেলে পড়ে। দুটো টায়ারে শতেক চামড়ার পট্টি। টিউবেও শতেক ফুটো রাবার সলিউশন দিয়ে ঠেকো

দেওয়া। বয়সও তো কম হল না। চলে যে এই ঢের। অবশ্য চলন খুবই ধীর। তা হোক। বেতো হাঁটু দুটো তো মাঝে মাঝে এই সাইকেলের সুবাদেই একটু জিরেন পায়।

মনসাপোতা আর বেশি দূরেও নয়। মাইল পাঁচেক পিচরাস্তা ধরে গেলে বাঁয়ে ফের পাকা সরু রাস্তা। মাইলটাক গেলেই ডান ধারে বেশ বর্ধিষ্ণু গাঁ।

কিন্তু সাইকেলে চট করে চাপল না জয়লাল। সামনেই কতগুলো গাছের জড়ামড়ি তার নিচে গুটি দুই চায়ের দোকান হয়েছে নতুন। হবেই। আপ ডাউন দুটো বাসই থামছে আজকাল পিপড়াইতে। দু-চারজন নামে ওঠে, সেই সুবাদেই দোকান। জয়লাল ভাবল, একটু চা খেয়ে নিলে হয়।

চা খেয়ে ফুরফুরে হাওয়ায় বাইরের বেঞ্চিতে বসে জয়লাল গায়ের ঘাম শুকিয়ে নিল। সাদা দাড়ি গোঁফের জঙ্গলেও বড় ঘাম হয়। সেও হাওয়ায় শুকোয়। ভারী আরাম হতে থাকে, আরো আরাম হত যদি ঘাড়ে চিন্তাটা না থাকত।

ছেলে তার নয়। রামলালের। রামলাল ছিল তার বড় ভাই। মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে থাকত। তা তারও একদিন মরণ ঘনিয়ে আসায় ছেলেটাকে জয়লালের হাতে তুলে দিয়ে যায়। ফ্যাসাদ আর কাকে বলে। জয়লালের পিছুটান বলে কিছু ছিল না। সাধক জীবন। একটু হোমিওপাথি করত, খানিক কবিরাজিও। একটু মন্দিরমতো করে কালীসাধনাও চালিয়ে যাচ্ছিল। ঘাড়ে চাপল রামলালের ছেলে শিবলাল।

ফেলতে পারেনি জয়লাল। কোলেপিঠে করেও তেমন মানুষ করতে হয়নি। রামলাল মরার সময় শিবলালের বয়স আট নয়। ডাগর ছেলে বেশ গান গাইতে পারত। আর সেই গানেই খেলো ছোঁড়াকে।

জয়লাল গান ভালোবাসে না তা নয়। তবে গান সে তেমন বোঝে না, গলাতেও সুর খেলে না, কিন্তু শিবলালের যে খেলে তা জয়লাল বোঝে। চড়ায় উঠেও ছোঁড়া বেশ সুরে থাকতে পারে। গানে সেটাই তো বাহাদুরি। চড়ায় উঠে বহু কাপ্তানের গলা ফেঁসে যায়, অনেকে কাশতে থাকে, কিন্তু শিবলাল চড়ায় গিয়েও সুরে বসে থাকে গ্যাঁট হয়ে। শুধু তাই নয়, চড়া থেকে আরো চড়ায় ঠেলে উঠতে থাকে তার গলা।

এই কেরামতির জন্য আজকাল শিবলালের খুব কদর। এ-গাঁ সে-গাঁ দাপিয়ে গেয়ে বেড়ায়। বোম্বাইতে কে এক খান্না আছে, তার মতো না হয়েই সে ছাড়বে না বলে গোঁ ধরেছে।

ভাল কথা। জয়লালের তাতে বড় আপত্তিও নেই। শিবলাল লায়েক হয়েছে, যা খুশি করুক। শেষ বয়সটা জয়লাল সাধনভজন আর হোমিওপ্যাথি নিয়ে থাকতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু ঘোর কলি যে। কোথাও কিছু না হঠাৎ শিবলাল কোথা থেকে একটা মেয়ে এনে ঘরে তুলল। বলল, আমার বউ।

সত্যি বটে, জয়লাল সংসারের ঘোরপ্যাঁচ তেমন জানে না। কিন্তু মেয়েটার সিঁথিতে

বাসি সিঁদুরের দাগটা সে এড়ায় কী করে? তারপর আরও আছে। শিবলাল গাইতে যায়, মেয়েটা একা ঘরে ফুচ ফুচ করে কাঁদে। মুখখানা সর্বদা ভার ভার, সারাদিন আনমন উচাটন। জয়লালের উদাসী চোখেও এসব পড়ে। নতুন বিয়ের বউয়ের তো এমন হওয়ার কথা নয়। বেশ একটা তরতাজা ডগমগে ভাব থাকে তাদের। সাজগোজের দিকে নজর থাকে। বিয়ের জল বলে কথা।

একদিন নিতাই ঘরামী এসে গুহ্য কথা ফাঁস করে গেল গোপনে। মনসাপোতার চিতি মণ্ডলের বউকে ভাগিয়ে এনেছে তার গুণধর ভাইপো।

কলিকাল যে জেঁকে বসেছে তাতে আর সন্দেহ কী? মেয়েটা দেখতে শুনতে মোটেই ভাল কিছু নয়। ডবকা এই যা। তার ওপর পরের বউ। বাচ্চার মা। তা তুই কলির কেষ্ট চারধারে এত মেয়েমানুষ থাকতে একটা ঘর লক্ষ্মীছাড়া করলি কেন, একটা বাচ্চাকে মা-হাড়া করলি, নিজের ঘরটাকেও আস্তাকুঁড় বানালি!

জয়লাল একদিন বউটাকে ডেকে একটু ভয় দেখাল, দেখ বাপু, কালটা কলিই বটে, দুষ্ট লোক উচ্চে বসবে, জ্ঞানী মানীর মাথা হেঁট হবে, বেশ্যা আর সতীলক্ষ্মীতে তফাৎ থাকবে না, তবু বলি দুটো কুল মজানো তোমার ঠিক হয়নি। শিবলালকে উচ্ছন্নে দিলে মা, কিন্তু নিজেই কোন সুখে আছো?

বউটা হাউমাউ করে কেঁদে পায়ে পড়ে বলল, আমাকে তাহলে সেখানেই রেখে আসুন। সে যমদূত যদি আমাকে কেটেও ফেলে তো মরব না হয়। মরার চেয়ে বেশি আর কী! এখনো তো মরেই আছি।

জয়লাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রেখে আসব বললেই তো আর রেখে আসা যায় না। ভাগা বউকে হুট করে নিয়ে তুললে ওপক্ষ না আবার ধুন্ধুমার লাগায়. চাইকি দুচার ঘা হয়তো বসিয়েই দিল বুড়ো বয়সে।

জয়লাল তাই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আজ। গিয়ে বুঝবে আবহাওয়াটা কেমন, মেজাজ মর্জি কেমন, বউ ফেরৎ নিতে গা করে কিনা, শিবলালকে নিয়ে চিন্তা নেই জয়লালের। বরাবরই কাকার বাধ্যের ছেলে। তাছাড়া মেয়েমানুষটাকে নিয়ে বোধকরি খুব সুখেও নেই। কাঁদুনে মেয়েছেলেকে নিয়ে ফুর্তিটাই বা হচ্ছে কি করে?

জয়লাল চা'টুকু খেল বেশ সময় নিয়ে। বেঞ্চিতে পাশে আরও একজন বসা। বুড়োসুড়ো লোক। খুব নজর করছিল। ফস করে বলে উঠল, জয়লাল ডাক্তার না?

তা বটে। আপনি?

আমাকে কি আর চিনবে? শালীতলা চেনো?

চিনি। বটেশ্বর ঠাকুরের থান তো! সেই চৌধুরি পুকুরে মেলা কচ্ছপ?

হ্যাঁগো। কচ্ছপে কচ্ছপে ছয়লাপ। তা সেই গাঁয়ের গুরুচরণ হালদারের সাক্ষাৎ খুড়তুতো ভাই।

গুরুচরণকে চিনতুম খুব। খাইয়ে লোক বলে নাম ছিল।

খেয়েই তো মোলো। তোমাকে তার বাড়িতে আনাগোনা করতে দেখেছি।

যেতুম তখন। আমার এক বোনের বিয়ে হয়েছিল কালীতলায়। বেঁচে নেই।

জানি।

এক কথায় দু' কথায় আলাপ জমে গেল। বটেশ্বরের থানের পিছনেই মনসা-পোতার মাঠ। গুরুচরণের ভাই মহেন্দ্র চিতি মণ্ডলের নাম শুনেই বলে উঠল, আরে রাম রাম, ঘোর পাপী। তার কাছেই যাচ্ছো নাকি? তা দরকারটা কিসের তাকে?

কথাটা ভাঙা যায় না, জয়লাল তাই আমতা আমতা করে বলল, না, ঠিক তার কাছে নয় বটে। ওদিকেই যাচ্ছিলাম অন্য কাজে, একজন বলল চিতি মণ্ডলকে একটা কথা বলে আসতে।

কথা বলবে। তাহলে তো শুঁড়িখানায় বা খারাপ পাড়ায় যেতে হয়। অমন নষ্ট মানুষ দুটো নেই।

জিরেন নিয়ে উঠে পড়ল জয়লাল। সাইকেলে চেপে রওনা দিল। আশ্চর্য এই, আজকাল নষ্ট মানুষের সংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে। ভাল মানুষ বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। ক্রমে ক্রমে···

কুঁচোটা আজ চিতির মাথাটাই গরম করে দিল। পেট ঢাঁই করে দুধ খেয়ে এসেছে, কিন্তু ঘুমের নামটি নেই, খুব কিছুক্ষণ হামা দিল, ঘরে আর দাওয়ায়। একবার একটা মোড়া উল্টে ফেলে কিছুক্ষণ চেঁচাল। তারপর আবার হামা টানছে এধারওধার। ঘুম না এলে অবশ্য ওকে দোষ দেওয়া যায় না, বেড়ার ওপাশে আজ লীলাময়ী মাটি কাঁপিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর চিল-চেঁচানিতে পাড়া মাৎ করে হাজু পাকড়াশীর বিধবা বোন সৈন্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া করছে। সৈন্ধবীও বড় কম যায় না। একটু তফাতে নিজেদের বাড়ির পাছদোরে দাঁড়িয়ে সেও আজ গঙ্গাজলে ধোয়াচ্ছে লীলাময়ীকে।

মেয়েছেলেদের এই এক ব্যাপারে আলিস্যি নেই, দেখেছে চিতি। ঝগড়ার গন্ধ পেল তো তুলোর বস্তা খাড়া হয়ে শিং নেড়ে ষাঁড় বনে গেল।

মানুষ কেন যে ঝগড়া কাজিয়া করে তা কিছুতেই বুঝতে পারে না চিতি। এত ঝগড়া কাজিয়ার কী আছে। ফুর্তি করলেই তো জমানো। ঝগড়া করলে ফুর্তিটা হয় কি করে? ঝগড়ার শব্দে চিতির মাথা ক্রমে গরম হচ্ছে। এসব সময়ে সাধারণত সে বাড়িতে থাকে না। কিন্তু এই কুঁচোটাই বড় বিপাকে ফেলেছে।

চিতি দাওয়ায় বসে ছেলের কাণ্ডটা দেখছিল। হামা দিয়ে গিয়ে বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে পড়ে পাছায় ব্যথা পেয়ে কেঁদে উঠল। মরুকগে। কাঁদুক। কাঁদতে কাঁদতে আপনিই চুপ মারবে।

পরশু চিতি ছেলেকে নিয়েই খালধারে তাড়ির আড্ডায় গিয়ে বসেছিল সন্ধেবেলায়। দেখল, তার ছেলেও বেশ তৈরি জিনিস। কোলে বসে চিতির হাতের গেলাস ধরে টানাটানি। তা চিতিও তেমনি। আঙুল তাড়িতে ভিজিয়ে একটু একটু চাখাল। তাড়িপ্রাশনটা হয়ে থাক। আজ একটু নয়াগঞ্জের দিকেও যেতে ইচ্ছে চিতির। অনেককাল ওসব হয় টয় না যেউ গিয়ে ইস্তক। ছেলেকে গছাবার কেউ নেই, তাই নিয়েই যাবে। চোখ ফুটুক ছোঁড়ার।

ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল চিতি। লীলাময়ী আজ আর তিষ্ঠোতে দেবে না। লুঙ্গির ওপর একটা জামা চড়িয়ে ছেলেটাকে ঘাড়ে ফেলে বেরিয়ে পড়ল। আজ আর রান্নার পাট দরকার নেই। নবীনদের বাড়ি দুটো ভেজা মুড়ি খেয়ে নেবে। দুপুরটা জিরিয়ে বিকেল-বিকেল বেরিয়ে পড়বে। সে-বাড়িতেও যে সবাই তাকে সুনজরে দেখে তা নয়। তবে কিনা নবীন হল সংসারের কর্তা, তার মাপ্পাই আলাদা। পঞ্চ ম-কারে সেও কিছু কম যায় না, তবে কিনা তাকে সে কথা বলে এমন বুকের পাটা কার?

বেরোবার মুখেই লোকটাকে দেখে চিতি থেমে গেল। তোটনবাবু।

তবে চিতির মাথায় বুদ্ধি খেলে চিড়িক করে। সে বুঝল, আমার পিছনে মতলব আছে। আর মতলব মানেই দাঁও।

একগাল হাসল চিতি, কি খবর গো তোটনবাবু?

তোমার খোঁজেই এসেছিলাম।

কী ভাগ্যি। বসবেন নাকি?

বসতে বোধহয় একটু হবে। কথা আছে।

চিতি মাথা হেলিয়ে বেড়ার ওপাশটা ইশারায় দেখিয়ে বলল, ওদিকে যা চলছে, আপনি ভদ্রলোক বেশীক্ষণ সইতে পারবেন না। তার চেয়ে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলুন। না হয় তো বটতলায়।

অত দূরে যাওয়ার দরকার নেই। কোথায় বেরোচ্ছিলে চলো, যেতে যেতে বলি। সংক্ষেপেই সারব।

তাই হোক।

তোমার ছেলেটাকে তো বোধহয় দেখার কেউ নেই।

না। বউটা পালাল জানেন তো!

জানি।

কার সঙ্গে গেছে, কোথায় গেছে সব জানি। গদাধরপুরের শিবলাল, চেনেন তো, সেই যে গান গায়!

জানি।

সে-ই। তা যাক। শিবলালের কাঁচা পয়সা, খুড়ো ডাক্তার। সেখানে সুখেই থাকবে। আমার তো অবস্থা একেবারে টাইট। তিন মণ তিসি বেচলাম, গোবিন্দ বিশ্বাস আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি করে ঘোরাচ্ছে। পশ্চিমের বাঁশঝাড়টা আমার বলে সবাই জানে, কালী হাজরা লোক লাগিয়ে কেটে নিয়ে গেল। বাড়ির ভাগও দেখুন কেমন তে-কোণা চে করে নিয়েছে কাঁচ। তা আমার দুঃখের সংসার, এখানে তার মন টিকত না। সব বুঝি। কিন্তু এই বাচ্চাটাকেও যদি নিয়ে যেত।

সেই কথা ভেবেই আসা। তোমাদের জন্য বাচ্চাটা কষ্ট পাচ্ছে।

কী করতে বলেন?

বাচ্চাটা আমাকে দাও।

দেবো মানে? পুষ্যি নেবেন নাকি?

পুষ্যিটুষ্যি নয়। তার অনেক ঝামেলা, এমনি রাখবো। যতদিন তোমার একটা ব্যবস্থা টাবস্থা না হচ্ছে।

চিতি একটু সন্দিহান চোখে তাকায়, তাহলে মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে ?

ওর আর মানে নেই। বাচ্চাটা কষ্ট পাচ্ছে বলে আসা।

চিতি মাথা নেড়ে বলল, কথাটা পরিষ্কার হচ্ছে না। জ্ঞাতিগুষ্টি আমার কিছু কম নেই, তাদের ছেড়ে আপনার কাছে ছেলে গচ্ছিত রাখলে বড় নিন্দে হবে। পুষ্যি নিতে চাইলে অবশ্য অন্য কথা।

তাই যদি নিই ?

চিতি মাথাটা চুলকোলো। বলল, তা সস্তা করে দেবোখন। হাজার খানেক যদি দেন তো হয়ে যায়।

টাকা চাও ?

মূল্য ধরে না দিলে কি এসব হয় ?

হাজার টাকা ?

সেও আপনি বলে। বাজার ঘুরে এলেই বুঝবেন সস্তা কিনা। ঘরে ঘরে সব মেয়ে বিয়োচ্ছে মেয়েছেলেরা। আর এই ছেলেকেও দেখুন। রং ফসাই ধরতে পারেন। নাকমুখচোখ সব ঠিক আছে, কানাখোড়া পেঁচোয় পাওয়া নয়। না হয় দুশো কমই দিলেন।

তোটন একটু থতমত খেয়ে চেয়ে থাকে। চিতি খারাপ সে জানে। কিন্তু এতটাই খারাপ কি ? সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিস্ময়ে। তারপর সামলে নিয়ে বলল, ছেলে নিয়ে ব্যবসা করছো ?

চিতি একটু বুকটা টান করে বলে, ব্যবসা কিসের ? সকলের কি সব হয় ? আপনার হলে বুঝতেন ছেলে বাপের কাছে কী জিনিস। তা সে কথা থাক, বিপদে আমি নানা দিক দিয়েই পড়েছি। তাই দিতে তেমন আপত্তি করছি না। মরুণে ছেলেকে মা-বাপও তো এক কড়ি তিন কড়ি পাঁচ কড়িতে বেচে দেয়। তাতে দোষ ধরে কেউ ?

তা বটে।

তাহলে ? দুপুরবেলাটায় এসে পড়েছেন, বউনিই ধরা যায়। আপনি ভদ্রলোক বলে কথা, পাঁচশোই দেবেন না হয়। ছেলের দাম চাইছি না। ছেলের দাম কি টাকায় হয় তোটনবাবু ? শুধু মূল্য ধরে দেওয়া আর কি।

তোটন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দেবো। কিন্তু একটা কথা। কথাটা যেন কেউ জানতে না পারে। বিশেষ করে আমার বাবা।

লেখাপড়া হবে না বলছেন ?

না।

টাকাটা কি আজ পাবো ?

পঞ্চাশটা টাকা আমার পকেটে আছে, দিচ্ছি। বাকি টাকা পরে।

তাই দিন।

ছেলে কবে দেবে ?

কবে মানে ? ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচি। নিন না নিন। হাত বাড়ান। এ ব্যাটা একেবারে বিশ্ববন্ধু, হনুমান কোলে নিতে চাইলেও লাফিয়ে চলে যায়।

কথাটা মিথ্যেও নয়। তোটন হাত বাড়াতেই ছেলেটা ঝাঁপ খেয়ে চলে এল। বাঁ হাতে পঞ্চাশটা টাকা বুকপকেট থেকে বের করে দিল তোটন।

ভারী উজ্জ্বল দেখাল চিতির মুখ।

কলিকালে বিশ্বাস করত না তোটন। আজ করল।

পঞ্চাশটা টাকা গচ্ছা গেল কিনা কে জানে। কারণ, ছেলেটাকে বাড়ি নিয়ে তুললে বাবা মা'র মেজাজ কেমনধারা হয়ে উঠবে তা আন্দাজ করতে পারছে না তোটন।

তোটন বড় বাচ্চাকাচ্চা ভালবাসে। এই যে তারা ঘুরঘুর করে নানা উদ্ভুটে কাণ্ড করে, এটা ফেলে সেটা ভাঙে, অর্থহীন নানা শব্দ করে আহ্লাদ বা রাগ দেখায় এসব দেখতে দেখতে যেন বুকটা জুড়িয়ে যেতে থাকে, নেশা ধরে যায়। দুনিয়ায় শিশুর মতো এমন মজার জিনিস আর নেই। তোটনের কপালে সেই শিশুই জোটেনি।

বাচ্চাটাকে বুকে চেপে তোটনের গা সিরসির করছিল আনন্দে।

কাঁঠালতলা দিয়ে গেলে সদর এড়ানো যায়, বাপেরও চোখে পড়ে না। ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিয়ে তোটন বলল, এই নে।

সন্ধ্যা বিছানায় বসে সরু কাঠের চিরুনী চালিয়ে মাথার খুসকি ছাড়াচ্ছিল। চেয়ে দেখল একটু। কিন্তু তেমন গা করল না। বাচ্চাটাকে মেঝেয় ছেড়ে দিয়ে তোটন বলল, একটু কিছু খাওয়াবি ছেলেটাকে ? মনে হয় খিদে পেয়েছে।

সন্ধ্যা নিজের কাজ করতে করতে বলল, বাবা কুরুক্ষেত্র করবে দেখিস।

আহা, বিপদে পড়েছিল, অযত্নে মরতে বসেছিল তাই নিয়ে এসেছি। এতে রাগের কী ?

চিরুনীটা খাটের বাজুতে বার দুই ঠুকে সন্ধ্যা উদাস গলায় বলে, তোর যে কী হয় মাঝে মাঝে। কেমন যেন পাগলাটে হচ্ছিস আজকাল।

পাগলাটে ! কথাটায় তোটন একটু হোঁচট খায়। একটু ভাবিত হয়। সন্ধ্যা কথাটা তেমন মিথ্যে বলেছে কি ? তাকে সন্ধ্যার চেয়ে ভাল করে আর কেউ চেনে না। এমন কি বাপ মাও না। ছেলেবেলা থেকে তারা দুজন দুজনকে চিনেছে ঝগড়ায় মারপিটে কান্নায় হাসিতে, ভাই বোনের মতো প্রথমটায়, তারপর খানিকটা স্বামী-স্ত্রীর মতোও। খানিকটাই। পুরোটা নয়। সন্ধ্যা তার মুখ দেখে মনের কথা টের পায়। কথাটা ঠিক। তাকে আজকাল বোধহয় একটু পাগলামিতে পায় মাঝে মাঝে। জীবনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে, কী যেন হয়ে উঠল না, আর হয়ে উঠবেও না, সময় হবে না। বড় বাধা। বড় বাধা চারদিকে। তার যেন আপনা থেকেই শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

চিতির ছেলে খুব হামা টানতে শিখেছে। সন্ধ্যা আর তোটনের এক লহমার অন্যমনস্কতায় চৌকাঠ ডিঙিয়ে বারান্দায় গিয়ে পড়ল। তারপরেই একটা চিৎকার।

না, বাচ্চার নয়। তোটনের বাবার।

এটা কে রে? ওরে ও সন্ধ্যা, বলি তোর দাওয়ায় এটা কে রে?

সন্ধ্যা চমকে উঠে দৌড়ে বেরোয়, বাবা ডাকছো?

ওই বাচ্চাটা কোথা থেকে এল?

সন্ধ্যা খুব খিলখিল করে হেসে বলল, ওই তো চিতি মণ্ডলের ছেলেটা গো। বিন্দুদির কাছে ছিল, একটু নিয়ে এলাম।

চিতির ছেলে! তা তোর পরের ছেলে আনার দরকার কী? ব্যথাট্যাথা লেগেটেগে যাবে কখন, তখন দুষবে। যা দিয়ে আয় গে।

না গো বাবা, দুষবার লোক কই? বাপটা মানুষ নাকি?

সন্ধ্যাকে একটু যেন বেশীই প্রশ্রয় দেয় তোটনের বাবা। তাই নরম গলায় বলল, তবু পরের ছেলে। চিতি লোকও তো ভাল নয়।

আমার তো ইচ্ছে বাচ্চাটাকে পালি পুষি।

একথায় বুড়ো খেঁকিয়ে উঠল, পুষ্যি নিবি নাকি? এখন বোধহয় সেইটেই বাকি আছে। যা যা এক্ষুনি গিয়ে দিয়ে আয়। নিজেদের হয় না, পরেরটা নিয়ে টানাটানি।

সন্ধ্যা বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে ঘরে এসে তোটনের দিকে চেয়ে বলল, হল তো।

তোটন একটু বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিল। এরকমটা হবে সে তো জানত। তবু একটু আশাও ছিল।

সন্ধ্যা তোটনের দিকে চেয়েছিল। বলল, যা দিয়ে আয় গিয়ে।

কাকে দিয়ে আসব? চিতি কি আর বাড়িতে আছে?

তাহলে বিন্দুর কাছে দিয়ে আসি।

চিতিকে যে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছি।

দিলি! বলে চোখ কপালে তোলে সন্ধ্যা, আমাকে না বলে দিলি?

তোটন ভারী লজ্জা পায়। বাস্তবিক সন্ধ্যাকে না জানিয়ে সে কিছু করে না। স্বামী-স্ত্রীর মতো না হলেও তারা পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালবাসে। আর ভালবাসায় দুজনের মধ্যে বড় একটা গোপন কিছু থাকে না। অন্তত তাদের নেই।

তোটন তাই বলল, তুই বকবি ভয়ে বলিনি।

টাকা দিতেই বা গেলি কেন?

না হলে দিচ্ছল না যে। টাকা ছাড়া চিতি মণ্ডল আর কিছু চেনে নাকি? কষ্টের মধ্যেও পড়েছে।

সন্ধ্যা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, ও টাকা আর আদায় হবে না। যা গেছে গেছে। আমাকে বললে দিতে দিতাম না।

সন্ধ্যা বকল না, রাগ করল না বলে ভারী ভাল লাগল তোটনের। সন্ধ্যার সঙ্গে

ছেলেবেলায় তার চুলোচুলি ঝগড়া হত বটে, কিন্তু এখন হয় না। এখন তারা দুজনেই দুজনের মন বুঝে কথা বলে। তা বলে মন-রাখা নয়।

সন্ধ্যা ছেলে কোলে নিয়ে কাঁঠালতলার দোর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জয়লাল বাড়ির সামনে এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। হাঁটু দুটো টাটাচ্ছে। পথ তো কম নয়। তেষ্টায় ছাতি কাঠ। তবে জয়লাল ধৈর্যশীল মানুষ, খিদে তেষ্টা রাগ দ্বেষ তাকে কাবু করতে পারে কমই।

এখন একটু সাবধানে এগোতে হবে। বাড়ির দুটো সদর দেখতে পাচ্ছে জয়লাল। চিতি মণ্ডলের বউ এরকমটই বলেছিল। ডানহাতি অংশটাই চিতি মণ্ডলের।

সাইকেলের স্ট্যাণ্ডটা অনেকদিন ভেঙে গেছে। জয়লাল সেটা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ভিতরে ঢুকল।

হিয়ে, চিতিবাবু আছেন নাকি. চিতিবাবু!

কেউ সাড়া দিল না। জয়লাল দু কদম এগিয়ে বাড়ির ভিতরে উঁকি মেরে হাঁ করে রইল। উঠোন আগাছায় ভর্তি ঝাঁটপাটের চিহ্ন নেই, মাটির দাওয়া লেপাপোঁছা হয় না বহুকাল। ঘরের দরজা হাট হয়ে খোলা।

চিতিবাবু!

সাড়া নেই। জয়লাল দাওয়ায় এসে ওঠে। ঘরে উঁকি দেয়। নাঃ, নেই। সব একেবারে ভোঁ-ভাঁ। তবে ঘরে দু-চারটে জিনিসপত্র আছে। ঘরে যে কেউ বাস করে তাও বোঝা যায়, আর বোঝা যায় যে, এ ঘরে লক্ষ্মী নেই।

জয়লাল বেরিয়ে এসে চিতির দাদার অংশে উঁকি দিল। খুব দজ্জাল চেহারার একটি সধবা একটা ঝাঁটা আছড়ে আছড়ে তাতে গোঁজা ভরছে। এ যে কচি মণ্ডলের বউ তা বুঝতে দেরী হয় না তার। জয়লাল গলাখাঁকারি দিতেই তাকাল।

কে ওখানে?

জয়লাল হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বলল, মা, অনেক দূর থেকে আসছি।

নিরন্তর সৎচিন্তা করে বলে জয়লালের চেহারায় একটা সহজ সরল সাত্ত্বিক ভাব আছে। চট করে তাকে কেউ বড় একটা দূরছাই করে না। সেইটেই জয়লালের ভরসা।

লীলাময়ী এগিয়ে এল। ভাল করে আপাদমস্তক দেখল। তারপর বলল, কাকে চাইছেন?

জয়লাল দাড়ির ফাঁকে বিগলিত হাসি অবিরল ঝরাতে ঝরাতে বলল, মামনি, একটু জল না খেলে যে বুড়োর স্বর বেরোবে না।

লীলাময়ী নরম পাত্রী নয়। তবে তারও মানুষের শরীর আর এই বুড়ো লোকটাকে দেখে হঠাৎ তার মরা বাপের কথা মনে পড়ে গেল। এমনই দাড়ি, এমনই সর্বদা বিনয়ী ভাব।

দিচ্ছি। বলে নিজেই দৌড় পায়ে গিয়ে এক ঘটি জল আর দুখানা মোয়া নিয়ে এল।

জয়লাল বলল, মোয়া থাক।

জল দিয়ে কণ্ঠা পর্যন্ত ভরিয়ে জয়লাল ঘটি ফিরিয়ে দিল। তারপর দাওয়ায় ল। বলল, তোমাকে আমি আন্দাজে চিনি মা। কচি মণ্ডলের বউ। তা তুমিই মার এখন একমাত্র ভরসা।

লীলাময়ী ঘোমটা তুলে সামনেই দাঁড়িয়ে বলল, বলুন।

জয়লাল তার সাদামাটা গলায়, বিশেষ ভণিতা না করে সব বলে দিল। কিছু দ রাখল না। শুনতে শুনতে লীলাময়ীর চোখ দুখানা গোল থেকে গোলতর চ্ছল। তবে শব্দ করল না। নিঃশব্দে শুনল।

বৃত্তান্ত শেষ করে জয়লাল বলল, অসতী বললে অসতী। তবে আমি বলি কী ়, শরীরের তত দোষ নাই, যত দোষ মনের। বউটাকে যা বুঝলাম সে তার মনটা খানে দেয় নাই। অত্যাচারের চোটে গা বাঁচাতে পালিয়েছিল। গর্ভটাকে পেয়ে য়েছিল সঙ্গতি।

লীলাময়ী কথাটা অবিশ্বাস করল না। এই দাড়িওয়ালা সহজ সিধে মানুষটিকে বিশ্বাস করার কিছুই নেই। তবে সে মৃদু স্বরে বলল, আমাকে কী করতে লেন? চিতি মণ্ডলকে তো আমরা ভিন্ন করে দিয়েছি। ওই দেখুন বেড়া।

জয়লাল তাকাল, কোথায় বেড়া মা, কোন বেড়া? বাঁশের? বলে খুব হোঃ ঃ করে হাসল জয়লাল। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল। তারপর মাথা ড়ে বলল, খুব বেড়া মা, জব্বর বেড়া। একেবারে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, এর াছতে যম ঘেঁষে না।

লীলাময়ী কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

জয়লাল ধুতির খুঁটে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, কত ভাগ করবে মা নিজেকে? ই যে আজ নিজের অংশে আছো, এই বা কদিন? তোমার ছেলেপুলে বড় হবে, ারা আবার ভাগে বসবে। ভাগ করতে করতে কী থাকবে বলো তো!

লীলাময়ী পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে উঠোনে গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে বলল, ভাগ তা আর আমি করিনি। হয়েছে।

তা হোক মা। ভাগও থাক। আমার কিন্তু ভরসা তুমি। তুমি ইচ্ছে করলে চিতির বউকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে বাধা হবে না। শুনেছি চিতি পাষণ্ড লোক, বে তোমাকে খুব ভয় করে।

আমি আমার জা-কে দুষছি না। সে যা করেছে প্রাণের ভয়ে করেছে। কিন্তু মাজ আছে, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে তো!

জয়লাল আবার খুব হাসে, এখন বুঝি বলছে না? চিতি মণ্ডলের কি খুব নাম মা?

তা নয়, তবে বাবা, পুরুষমানুষ বলে কথা। মেয়েমানুষ তো আর তা নয়। সব জানি না। তবে আমার যেন মনে হয়, তুমি অভয় দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে কী করতে হবে বলুন।

জয়লাল দুলে দুলে মিটিমিটি হাসল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, চিতির বা
আমাকে কী বলে জানো মা! বলে, আমার জা খুব দাপের মানুষ, তার হাঁকে ডাবে
গগন ফাটে। আমি বলি, এরকমটাই তো চাই। শাস্ত্রে কি মায়ের একটা রূপ?
কখনো নৃমুণ্ডমালিনী, কখনো দশপ্রহরণধারিণী, যখন যেমন দরকার তেমনটি হ
দাঁড়াতে না পারলে আর জগদ্ধাত্রী বলেছে কেন? রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দেয়
আবার মহিষাসুরের ঝুঁটিও ধরে। তাই চিতির বউকে বললুম, তুমি যা বলনে
তোমার জা যদি তাই হয়ে থাকে তবে তোমার আর ভয় নেই। সে যদি তোমা
পাশটায় দাঁড়ায় তবে চিতি মণ্ডল থেকে গাঁয়ের সব মুরুব্বির গলায় কানাইবাঁ
বাজবে। আজ রওনা দেওয়ার কালে কালীবেটির কাছে কী বলে এসেছি জানো
বলেছি, মা গো, লীলাময়ী মা যেন আমাকে ফিরিয়ে না দেয়, ওই বেটির মধ্যে তে
তোরই অংশ আছে মা।

লীলাময়ী যেন কেমন অন্যধারা হয়ে যাচ্ছিল। তার এত রাগ, তার চণ্ডমূর্তি
তার খাপদাপ এসবও যে কারো কাজে লাগতে পারে এ সে কল্পনা করেনি তে
কোনোদিন। সে জানে লোকে আড়ালে তাকে ঘেন্না করে, ভয় করে, কুচ্ছো গায়
তবে এ কী শুনছে সে?

নেশাটা আজ জমল না একদম। একটা বোতল ফাঁক করার পরই কেমন বমি-বা
লাগছে। বাঁ কোলটা খালি। ছেলেটাকে বেচে দিয়েছে। তা, গেছে ভাল
বাঁচোয়া। কিন্তু নেশাটা জমছে না।

চিতি আজ একটু আগেভাগে উঠল।

পথে পড়ে' নয়াগঞ্জের দিকে রওনাও দিল। বিকেল অবধি বেশ একটা ডগোমগে
ভাব ছিল শরীরে। নয়াগঞ্জের মেয়েগুলো ছলাকলাও জানে মন্দ নয়।

কিন্তু খানিকটা হাঁটার পর তার মনে হতে লাগল, দূর বাবা, অনেকটা পথ! অতট
হেঁটে গিয়ে পোষাবে না। কাল হবে'খন।

বলে ফিরল চিতি। রাস্তাটা বেজায় অন্ধকার। ঘরে ফিরলেও ঠিক একইরক
জমাট অন্ধকার দেখবে। এ সময়ে ফেরার পথে ছেলেটা বাঁ কাঁধে মাথা রেখে নেতিে
ঘুমোয়। তার শ্বাস এসে মুখে লাগে, গালে লাগে। বিরক্তিকর, কিন্তু আজ নে
বলে একটু যেন অস্বস্তি হচ্ছে। বাড়িতেও ছেলেটা নেই।

চিতি জোর কদমে হাঁটতে লাগল।

বাদামতলায় এসে সে একটু দাঁড়াল। বাঁ দিকে একটু ঘুরে জেলেপাড়ার পথ দিে
গেলে তোটনবাবুদের বাড়িটা পড়ে। যাবে নাকি ও পথে?

দোনামোনা করে বাঁ দিকেই ফিরল চিতি।

একটু বাদে তোটনবাবুদের বাড়িটা ভেসে উঠল অন্ধকার ফুঁড়ে। যেন একখান
জাহাজ। অন্ধকারে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে দূরে থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। চিতি
বুকপকেটে এখনো চল্লিশটা টাকা।

ছেলেটার আজ অবধি কোনো নাম দেয়নি কেউ। চিতির ইচ্ছে করল একটা নাম দতে। নাম না হলে মানুষের চলে!

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিছু দেখার এবং শোনার চেষ্টা করল চিতি। কিন্তু তোটন-াবুদের জানালায় মোটা কাপড়ের পর্দা। কিছু দেখা গেল না, শব্দও নেই কোনো, ছলেটা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

চিতি নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়ি ঢুকতে গিয়ে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে চিতি। এ কী! আলো জ্বলছে য়'! ভুল করে কাঁচর অংশে ঢুকে পড়েনি তো! লীলাময়ী যা খাণ্ডার, ঢুকলে দু'খানা করে ফেলবে। চিতি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে ভাল করে দেখল। না, ঠিকই আছে। ডানধারেরটাই তার অংশ। কোনো ভুল নেই

চিতি ঢুকে চারদিকে চাইল, ঘর থেকে হ্যারিকেনের জোরালো আলো ছিটকে আসছে। তাতে দেখা যায়, বারান্দাটা যেন একটু সাফসুতরো।

চিতি অবাক হয়ে দাওয়ায় উঠল। তারপর ঘরে উঁকি দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে লীলাময়ী। তার কোলে চিতির ছেলে। আর লীলাময়ী তাকে ঝিনুকে করে আষ্টেপৃষ্ঠে দুধ গেলাচ্ছে।

চিতির মাথাটা ঘুরে উঠল। ধপ করে বসে পড়ল সে।

লীলাময়ীর গলা ডাঙসের মতো এসে কানের পর্দায় লাগল, কে ওখানে?

চিতি কোনোরকমে বলল, আমি:

তোমার পকেটে কত টাকা আছে?

চল্লিশ।

ওটা তোটনবাবুকে ফেরত দিয়ে এসো। আর ফিরে ও-বাড়িতে ভাত খাবে।

আর কিছু?

কাল ছোটো বউ আসবে। সকালে বাড়ি থেকো।

চিতি তবু বসে রইল। কোথায় একটা গোলমাল হচ্ছে। আজ তো নেশা হয়নি। তবে হলটা কী? স্বপ্ন দেখছে? ভাবতে ভাবতেও সে উঠল। বাঁ কোলটা খালি-খালি লাগছিল এতক্ষণ। এখন লাগছে না।

যখন আধো-ঘুমের মধ্যে চলে গিয়েছিল তোটন তখন ঘটনাটা ঘটল। অপ্রস্তুতের একশেষ। স্বপ্ন দেখছিল, চিতির বাচ্চাটা দাওয়া থেকে পড়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে হাত বাড়িয়েছিল তোটন। হাতটা গিয়ে পড়ল বাচ্চার তুলতুলে গায়ে। চেপে ধরল সে বাচ্চাটাকে।

তখনই চমকে ঘুমের চটকা ভাঙল তার। হাতখানা সন্ধ্যার গায়ে। টেনে নিতে যাচ্ছিল। সন্ধ্যা বাধা দিল না। তবে সন্ধ্যা এপাশ ফিরল। পাশবালিশটা সরিয়ে দিয়ে বলল, তুমি ভেবেছোটা কী?

কী ভাবব?

পাগলামি করলেই চলবে ?

তার মানে ?

মানে তুমিই জানো। আমি তোমাকে পাগল হতে দেবো না। তুমি ছাড় আমার যে আর কিচ্ছুটি নেই।

সন্ধ্যা।

বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি। অন্ধকারে আর আমার মুখ দেখতে পাবে না। বলে সন্ধ্যা কল ঘুরিয়ে বাতি নিবিয়ে দিল।

তারপর বলল, এসো।

সন্ধ্যা!

আমি তোমাকে পাগল হতে দেবো না। এসো।

অন্ধকারে ভেসে গেল জামাকাপড়। মুচকি হেসে অন্ধকারে এক দেবতা সেগুলো কুড়িয়ে বুকে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপেক্ষা করতে লাগল পৃথিবী অপেক্ষা কবতে লাগল চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র।

অপেক্ষা করছিল চিতিও। বাইরের অন্ধকার দাওয়ায় হাতে চারখানা দশ টাকা নোট নিয়ে সে ভাবছিল তোটনবাবুকে ডাকা ঠিক হবে কিনা। তারপর ঘরের বেড়া ফাঁক দিয়ে কতগুলো অদ্ভুত শব্দ শুনল সে। চেনা শব্দ। স্বামী-স্ত্রীর শব্দ নাঃ, ডাকাটা ঠিক হবে না।

চিতি মণ্ডল ফের নেমে এল পথে। টাকা কাল ফেরত দিলেই হবে। কাল চিতি মণ্ডলের বউ আসবে।

ত্রয়ী

॥ ১ ॥

সুপারম্যান

সুপারম্যানের সঙ্গে আমার দেখা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। বলছি।

পাপড়িকে বলা যায় আমার প্রেমিকা। সাদামাটা বাংলায় এর চেয়ে যুৎসই শব্দ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পাপড়ি যথারীতি একটু বোকা এবং ইংলিশ ফিডিয়ম। প্রেমিকার সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে প্রেম কথাটি। অর্থাৎ লায়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট বা রাধা-কৃষ্ণ। পাপড়ি এবং আমার সম্পর্ক অবশ্যই তেমন নয়। আমরা দুজনেই দুজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ইংরিজিতে যাকে বলে ওয়েল উইশার। আমাদের বিয়ে কোনোদিন হতেও পারে, নাও হতে পারে। হলে যে আমরা দারুণ খুশি হবো তা নয়, না হলে যে ভীষণ দুঃখ পাবো এমনটিও মনে করার কারণ নেই।

আপাতত পাপড়ি একটু সমস্যায়। ওর মা আর বাবার মধ্যে ডিভোর্সের মামলা চলছে। ওর বাবা ইতিমধ্যে এক পানজাবী মহিলার সঙ্গে দিল্লীতে বসবাস করছেন। ওর মা প্রাণপণে বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পাপড়ির মাকে আমি পাত্র নির্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কাজটা সহজ নয়। বয়স, মেচেতা, মেদ কোনোটাই বড় বাধা নয়। কথা হল, ঝাড়াই বাছাইয়ের পর যে দু'টি পাত্র ঠিক করা গেছে তাদের মধ্যে কোনজন? রাম জালান, না সোমনাথ বসু?

সেদিন রাত প্রায় সাড়ে দশটা অবধি পাপড়িদের সাততলার ফ্ল্যাটে আমি, পাপড়ি আর পাপড়ির মা একটা ফাইনাল ডিসিশনে আসার চেষ্টা করছিলাম।

পাপড়ি বলল, দেখ মা, রাম সব দিক দিয়েই ফিট। ব্যাচেলর, ওয়েল কানেকটেড, ডিগনিফায়েড অ্যান্ড এভরিথিং। কিন্তু আমার ওপর ওর একটু উইকনেস আছে। বয়সে তোমার চেয়ে ঢের ছোটো। তুমি যদি ওকে নজরে নজরে রাখতে না পারো তাহলে এনি নাইট হি মাইট বি ল্যান্ডিং ইন মাই বেড।

পাপাড়ির মা বললেন, সোমনাথের যে ছেলে নিয়ে প্রবলেম। একটা পাগল ছেলে বাড়িতে থাকলে দেয়ার উইল বি নো কমফোর্ট।

বস্তুত সোমনাথ বসুকেই পাত্র হিসেবে আমার আর পাপাড়ির কিছু বেশী পছন্দ। তবে বাধা ওই ছেলেটা। বেশ লম্বা চওড়া চেহারার চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে। কিন্তু তার রোগ হল, সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে। নড়াচড়া কম করে, কথা বলেই না, শুধু চারদিকে চেয়ে একটা সন্দিহান তীক্ষ্ম নজরে সব কিছু দেখে যায়। সোমনাথ এই ছেলে নিয়ে উদ্বিগ্ন, তটস্থ, স্বস্তিহীন। নইলে বিপত্নীক, বড় কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হওয়ার কারণ ছিল না।

রাত সাড়ে দশটা অবধি সিদ্ধান্তে আসতে না পারায় আমরা তিনজনেই বেশ গরম হয়ে গেলাম। পাপাড়ির মা একটা চমৎকার ককটেল করে দিলেন। সেটা খেয়ে যখন আমি বিদায় নিলাম তখন পাপাড়ি সিঁড়ির মুখ অবধি এগিয়ে দিতে এসে বলল, জন, তুমি কিছু করতে পারো না ?

কী করার কথা বলছ ?

সোমনাথকেই আমি নতুন বাবা হিসেবে চাই।

আমিও চাই।

পাপাড়ি চোখ বড় করে বলল, তোমার নতুন বাবা হিসেবে ?

ওর বোকামি দেখে বিরক্ত হয়ে বললাম, আরে না। তোমার নতুন বাবা হিসেবে।

কিন্তু হবে কী করে ? বলে পাপাড়ি প্রায় ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলে আর কি।

আমি ওর হাতটা ধরে বললাম, মেনে নাও।

কি মেনে নেবো ?

সোমনাথের ছেলেটাকে।

মেনে নেওয়াটা আবার কিরকম ?

লেট হিম বি দেয়ার।

মা যে পাগলদের ভীষণ ভয় পায়।

অর্থাৎ সমস্যাটা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে যাচ্ছে। এক চুল নড়ছে না। দিন তিনেক বাদে আবার যখন সিটিং বসল তখন সুষমা দেবী, অর্থাৎ পাপাড়ির মা পরিষ্কার বললেন, দেখ জন, দেখ পাপাড়ি, আমার কিন্তু বয়স হয়ে যাচ্ছে। এরপর খুব দেরি হয়ে যাবে।

পাপাড়ি আমার দিকে চাইল, আমি পাপাড়ির দিকে।

সুষমা বললেন, আমি জানি তোমরা সোমনাথকেই আমার হাজব্যাণ্ড হিসেবে চাও। বেশ ভাল কথা। সেক্ষেত্রে তোমাদের কিছু কনস্ট্রাকটিভ কাজ করতে হবে। কিডন্যাপ দ্যাট বয় অ্যাণ্ড রিমুভ হিম টু এ মেণ্টাল হোম।

আমরা দুজনেই সমস্বরে বলে উঠলাম, কিডন্যাপ! সে কী ?

সুষমা বিরক্তির গলায় বললেন, এ মাইনর সিন। এমন কি রিস্কি কাজও নয়

ওয়াটগঞ্জে ডাক্তার সানি সেনগুপ্তর একটা পাকা এস্টাব্লিশমেণ্ট আছে। অল ফাইভ স্টার অ্যারেঞ্জমেণ্টস। ইটস আ মেণ্টাল হোম ফর একস্ট্রিমলি রিচ পিপল।

পাপড়ি খুব ঘাবড়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু আমি আইডিয়াটা নাড়াচাড়া করে দেখলাম, প্রস্তাবটার মধ্যে মাল আছে। ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

সুষমাদেবী বললেন, আমাকে সুখী দেখার জন্য তোমরা এটুকু নিশ্চয়ই করতে পারো। মে বি দি বয় উইল পুল আউট অফ দ্যাট স্টুপর ইন এ গুড মেণ্টাল হোম। সোমনাথটা বোকা আর অবসেস্‌ড বলে ছেলেটাকে ওরকম আগলে রেখেছে।

আমি বললাম, দ্যাটস ওকে। কিন্তু ছেলে নিরুদ্দেশ হলে সোমনাথ ক্ষেপে যাবে যা! হি ইজ অ্যান একস্ট্রিমলি স্টাবোর্ন ম্যান।

সুষমা বললেন, তুমি ভীষণ বোকা জন মাই ডারলিং। সোমনাথ ক্ষেপে যাবে তো ঠিকই। কিন্তু তারপর কী করবে? হি উইল সার্চ এভরিহোয়্যার, হি উইল গো টু পুলিশ, হি উইল ইনসার্ট অ্যান অ্যাড ইন নিউজপেপারস। দেন হোয়াট? যখন কিছুতেই কিছু হবে না তখন ওয়ান ডে হি উইল কাম টু মি উইথ টিয়ারস ইন হিজ আইজ। তখন আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেবো শুধু ভালবাসা দিয়ে। বুঝলে?

সুষমা এমন ভাবে বিবরণটা দিচ্ছিলেন যেন সব ব্যাপারটা তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল চোখ স্বপ্নাতুর। ওর ওপর আমার খুব একটা শ্রদ্ধা হল। ভদ্রমহিলা বুদ্ধিমতী, দূরদর্শী।

একটু গলা খাঁকারি দিয়ে আমি বললাম, দ্যাটস ও কে। কিন্তু অত বড় একটা ছেলেকে কিডন্যাপ করা খুব সহজ কাজ নয়। ছেলেটা বেশ শক্ত পোক্ত চেহারারও। রেজিসট্যান্স দেবে।

সুষমা বললেন, রাফ হ্যাণ্ডলিং আমি পছন্দ করি না। তবে ছেলেটার দুটো অবসেশন আছে। হাই পাওয়ার মোটর বাইক অ্যাণ্ড বিউটিফুল গার্লস।

সুষমা এইটুকু বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার আর পাপড়ির দিকে তাকালেন। আমার একটি হোণ্ডা মোটরবাইক আছে, আর বলাই বাহুল্য পাপড়ি সুন্দরী। সুতরাং সোমনাথ বসুর পাগল ছেলেকে গুম করার দায়িত্ব নিঃশব্দে আমাদের ওপরেই বর্তাল। আমাদের মধ্যে একটু অনিচ্ছে হয়তো দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সুষমা চোখ এবং ব্যক্তিত্ব দিয়ে সেটাকে শাসন করে দিলেন।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ আমি আমার হোণ্ডার পিছনে পাপড়িকে চাপিয়ে নিয়ে সোমনাথের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিই। সোমনাথ অফিসে গেছে। বাড়িতে ছেলেটা একা। চারদিকে রোদ ঝলমল করছে এবং শীতকাল। নির্জনতাই যথেষ্ট। উপরন্তু পাগলের ভয়ে সোমনাথের বাড়িতে কাজের লোক থাকে না বলে বাড়িতেও পরিবেশ খুব জনহীন। উঁকি ঝুঁকি দেওয়ার কেউ নেই।

কিন্তু মুশকিল হল পাপড়িকে নিয়ে। তার মুখ সাদা এবং শুকনো। চোখে ভয়। মিনমিনে গলায় বলল, জন, আমিও যে পাগলদের ভীষণ ভয় পাই।

আমি ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে বললাম, সেলফ স্যাক্রিফাইস করা ছাড়া আমি তো আর অন্য কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

তুমি কি যথেষ্ট কাছাকাছি থাকবে?

চেষ্টা করব। বিপদে পড়লে চেঁচিও। কিন্তু চেঁচামেচি করার জন্য তুমি আসোনি এসেছো ছেলেটার সঙ্গে একটু ইয়ে করতে। মনে রেখো।

পাপড়ি বিপন্ন গলায় বলে, আমি যে কোনো পাগলের সঙ্গে কখনো প্রেম করি জন। এক্সপেরিয়েনস নেই।

অভিজ্ঞতাটা তাহলে আর বাকি থাকে কেন। হয়ে যাক।

পাপড়ি অগত্যা দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে গেল। আমি বাইরে অপেক্ষা লাগলাম, উৎকর্ণ এবং কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে।

ঘণ্টাখানেক বাদে যখন পাপড়ি বেরিয়ে এল তখন তাকে দেখে কে বলবে এ পাপড়ি। আমি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। পাপড়ি সুন্দর কিন্তু এখন তার মুখ চোখ সমেত সমস্ত শরীর যেন এক অদ্ভুত আলোয় ঝলমল করছে দুই চোখ স্বপ্নাতুর। মুখে এক সম্মোহিতের ভাসমান হাসি। আর যখন তা স্পর্শ করলাম তখন স্পষ্ট টের পেলাম তার সমস্ত শরীরে একটা কাঁপুনি—না, কাঁপু নয়—একটা ঝংকার রিনরিন করছে।

পাপড়ি আমার চোখে এক আনমনা চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভ পাগলদের কি আলাদা কোনো ল্যাংগুয়েজ থাকে?

সবসময়ে নয়। তবে কারো কারো থাকে। কেন?

পিঙ্কুর আছে জানো? ওর কথার একটি বর্ণও আমি বুঝতে পারিনি। কি তবু আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত কমিউনিকেশন হয়ে গেল। আর কী দুষ্টু জানে প্রথম দিনেই··· মা গো······

বলে কাচ-ভাঙা হাসি হাসতে হাসতে শতখান হয়ে পড়ছিল পাপড়ি। আ হোণ্ডায় একটা লাথি মারলাম। সেটা ঘেউ-ঘেউ করে গর্জে উঠল।

পরে সোমনাথের বাড়ির সামনে আমার হোণ্ডা থামতে না থামতেই পাপ হাল্কা লাফিয়ে নেমে একটা রঙিন প্রজাপতির মতো উড়ে ভিতরে চলে গে আমার দিকে ফিরেও চাইল না। পৃথিবীতে আত্মত্যাগের মহান সব ঘটনার ক ভাবতে ভাবতে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সোমনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে তিন ঘণ্টার ওপর সময় নিল পাপ আমি আমার হোণ্ডার সীটে বসে বার দুই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একবার এক বুড়ি ও আর একবার এক পুলিশ আমাকে সজাগ করে দিয়ে নাগরিক দায়দা সম্পর্কে খানিকটা অবহিত করে যায়

আজ পিঙ্কু পাপড়ির শরীরে নানাবিধ রহস্যময় সুইচ অন করে বিচিত্র সব আ জেলে দিয়েছে। আমার তো মনে হচ্ছিল, পাপড়ি যেন দেয়ালীর রাতের এক বা সার সার পিদিম জ্বলছে, তারাবাতি ফুলকি ছড়াচ্ছে এবং সলতের আগুন ধর

একটা বিকট বোমা অপেক্ষা করছে বিস্ফোরণের জন্য।

পাপড়ি আজ খুব ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছিল, নিচ্ছিল। আমার পিছনে বসে ও শ্বাসের শব্দের মতোই ফিস ফিস করে বলল, বিজন ডারলিং, আজ তোমাকে এমন একটা কথা বলব যা শুনে তুমি চমকে উঠবে।

সাংঘাতিক উত্তেজনার কিছু না ঘটলে পাপড়ি আমাকে সহজে বিজন বলে ডাকে না। বিজন নামটা ভ্যাতভ্যাতে, ন্যাতানো, বি বাদ দিলেই নামটা পাঁচ হাজার মাইলের দূরত্ব রচনা করে।

যাই হোক, আমি একটু ভয়ে ভয়ে বললাম, কি কথা?

পিঙ্কু কিন্তু মানুষ নয়।

চলন্ত হোণ্ডা গোঁত্তা খেয়ে একটা ট্যাকসির পিছনে গিয়ে গুঁতো দিচ্ছিল আর কি, অতি কষ্টে সামলে নিলাম। হেসে বললাম, তবে কি রোবো?

পাপড়ি ভেজা গলায় বলে, ও যে আসলে কী তা আমি এখনো জানি না। তবে ওর আই কিউ ঢের ঢের উঁচুতে।

পাগল নয় বলছো?

পাগল তো বটেই।

তা কী করে হয়?

পাগল না হলে—বলে কী ভেবে চুপ করে গেল পাপড়ি।

আমি বললাম, ডাক্তার সেনের ফাইভ স্টার মেণ্টাল হোমে ওকে পাচার করতে আর দেরী করা উচিত নয় পাপড়ি।

পাপড়ি শ্বাসের শব্দ তুলে বলল, কাল।

পরদিন যখন আমরা সোমনাথের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম তখন অবাক হয়ে দেখি, সোমনাথের তথাকথিত পাগলু-বোকা-আখাম্বা ছেলেটি কাঁধে একটা ঝুলন্ত ব্যাগ নিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। চোখে তীক্ষ্ন ও সন্দিগ্ধ একটা দৃষ্টি। মোটরবাইক থামতে না থামতেই আমাদের অবাক করে দিয়ে ও টপ করে পাপড়ির পিছনে সীটে উঠে বসে পড়ল।

আমি একটু বুরবক বনে গেলাম। এ-রকম কথা ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। নীচু স্বরে পাপড়িকে জিজ্ঞেস করলাম, ও কি জানতো যে ওকে আমরা নিয়ে যেতে আসছি।

না। এ-রকম কথা হয়নি।

তাহলে?

চুপ করো। ওর আই কিউ অনেক বেশী। ও সব টের পায়।

আমার গাটা কেমন ছমছম করতে লাগল। প্রকাশ্য দিবালোকে এবং আব্রুহীন মোটরবাইকে বসেও। অন্য সময়ে মোটরবাইকের পিছনে বসে পাপড়ি আমার গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে, কোমর জড়িয়ে ধরে আলতো হাতে। আজ আমি টের পাচ্ছিলাম, পাপড়ি আমাকে জড়িয়ে তো ধরেইনি, এমন কি আমাকে স্পর্শও করছে না। তিনজনে

যাচ্ছি. বেশ চাপাচাপি হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ওরা দু'জন যে পিছনে আছে তা আমি টেরও পাচ্ছি না, পিছু ফিরে দেখতে আমার সাহস হল না। আমি শুধু ঝুঁকে পড়ে মোটরবাইকের সবটুকু শক্তি নিংড়ে দিতে লাগলাম গতিতে। চারপাশে ঘূর্ণি ঝড় তুলে ছুটছে হোণ্ডা। ভীষণ শব্দে গর্জাচ্ছে মেশিন। কানের পাশে ফেটে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়া। ওয়াটগঞ্জ কি এখনো অনেক দূর?

জন। জন। আরো জোরে! আরো জোরে। পিছন থেকে কাতর স্বরে বলে উঠল পাপড়ি।

কেন বলল? কী হচ্ছে পিছনে? আমি পিছু ফিরে না তাকিয়েই মাথা নেড়ে বললাম, আর স্পীড তোলার উপায় নেই পাপড়ি। আমরা ওয়াটগঞ্জে প্রায় পেঁছে গেছি।

পাপড়ি কান্নার ফোঁপানির মতো শব্দ তুলে চেঁচিয়ে বলল, আমরা কোনোদিন ওয়াটগঞ্জে পেঁছিতে পারব না জন।

কথাটা শুনে আমার ভয় করল। বড় ভয় করল। তবু আমি আরো ঝুঁকে পড়লাম। মিশে যেতে লাগলাম মেশিনের সঙ্গে।

বলতে নেই, মোটরবাইক আমি ভালই চালাই। বিশেষ করে নিজস্ব এই হোণ্ডা বাইকটির সঙ্গে আমার সমঝোতা চমৎকার। তবু ঘটনাটা ঘটল আদিগঙ্গার পোল পেরোনোর পর।

যে যে কারণে দুর্ঘটনা ঘটে তার কোনটাই দায়ী নয়। তবু যে কি করে ঘটে গেল সেটাই বিস্ময়ের। আমার শুধু মনে হল, কোনো বৃহত্তর ইচ্ছাশক্তি, কোনো অতিমস্তিষ্ক খুব হিসেব নিকেশ করে ছোট্ট একটা টাল খাইয়ে দিল ভারসাম্যে, একটু দোল, একটু ভয়, আত্মবিশ্বাসে এক সেকেণ্ডের দ্বিধা। মোটরবাইকটা খুব অসহায়ভাবে আকাশে উঠল। তারপর স্তূপাকার হয়ে ভীষণ শব্দে ঝরে পড়ল আমাদের ধ্বংসস্তূপ।

সেই ধ্বংসস্তূপে ভাঙা দুটি ডল পুতুলের মতো পড়ে রইলাম আমি আর পাপড়ি। দুটি গাড়ল, বুদ্ধু, আহাম্মক মানুষ ও মেয়েমানুষ। কিছুই করার নেই আমাদের। শুয়ে, ঘাড় গুঁজে নিজেদের ক্ষত ও বেদনার জন্য শোক অনুভব করতে করতে আমরা দেখলাম, ছেলেটা নিষ্কলুষ সেই ধ্বংসস্তূপে উঠে দাঁড়িয়েছে। ক্ষত নেই, দাগ নেই। কাঁধে ব্যাগ। চোখে সেই সন্দিহান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একবারও আমাদের দিকে ফিরে তাকাল না। একটু দীর্ঘ পদক্ষেপে ধীরে ধীরে ফিরে যেতে লাগল, যে পথ ধরে আমরা এসেছি সেই পথে।

॥ ২ ॥
ভূতের গল্প

বাথরুম থেকে আমার নতুন বউ চেঁচিয়ে উঠল, ভূত ! ভূত !

আমি দৌড়ে গেলাম, কী হয়েছে ?

আমার বউ চোখ বড় বড় করে বলল, ভূত !

কী রকম ভূত ?

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছিল। খোঁনা সুরে বলল, নতুন বিয়ে বুঝি ? বেশ বেশ। মজা বুঝবে।

আমি একটু চিন্তিত হয়ে বললাম, আর কিছু বলেনি তো !

বলেছে।

কী বলেছে ?

আমার বউ মাথা নেড়ে বলল, সেটা তোমাকে বলা যাবে না।

আমার বুকটা একটু কেঁপে উঠল। ভূতকে আমি ভয় পাই নানা কারণে। সবচেয়ে বড় কারণটা হল, ভূত আমাদের নানা গুপ্ত কথা জানে। আমার মতো ছা-পোষা লোকেরও গোপন করার মতো কিছু কথা আছে, ঠিক জানি না ছা-পোষা লোকেদেরই গুপ্ত কথা বেশী থাকে কিনা। যেমন, আমি ছ'শো বিয়াল্লিশ টাকা পঁচিশ পয়সা মাইনে পাই। বিয়ের আগে আমার হবু শ্বশুরমশাই খুব কুণ্ঠিতভাবে কথাটা তুললেন, তা বাবাজী কি হাজার খানেকের মতো পাচ্ছো আজকাল ? আমি কিন্তু তখন খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলাম, আজ্ঞে ও-রকমই, আমার নতুন বউ-ও তাই জানে। আর একটা ব্যাপার হল, পটল। ভারী গেছো মেয়ে। অন্তত তেরোবার সে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। কারো সঙ্গেই তিনদিনের বেশী টিকতে পারেনি। ত্রয়োদশতম ব্যক্তিটি ছিলাম আমি। পটলের সঙ্গে পালানোর মতো বুকের পাটা আমার ছিল না। বলতে গেলে সে-ই আমাকে নিয়ে পালায়। ব্যাণ্ডেল অবধি পেঁছে আমি বিস্তর কান্নাকাটি করতে থাকায় পটল আমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিল। একটা অসভ্য গালাগালও দিয়েছিল বটে, কিন্তু সে কথা থাক। কথাটা হল গোপন কথা আমার মতো লোকেরও কিছু আছে। আর ভূতেরা সবজান্তা, কাজেই আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভূতটা আমার বউকে কী এমন বলেছে যা আমার জানা বারণ ?

রাত্রিবেলা খেতে বসে আমি আমার নতুন বউকে বললাম, বাড়িটা যখন ভুতুড়ে তখন ছেড়ে দিলে কেমন হয় ?

বউ একটু কুট চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, ভালই হয়। তবে কয়েকটা দিন যাক। ভূতটার কাছে আমার কয়েকটা কথা জানার আছে।

শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। গলাটা আটকে এল। কিছু বলতে পারলাম না। এমন কি বউয়ের চোখে চোখ রাখতেও কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

বউ ঘুমোনোর পর নিশুত-রাতে আমি ভূতটাকে পাকড়াও করতে উঠলাম। ভূত সম্ভবত ঘুষ খায় না, ভয় খায় না এবং সহজে পোষও মানে না। তাদের ব্ল্যাকমেল করাও বোধহয় সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার মতো ছোটখাটো লোককে পাত্তা দেওয়ারও কোনো কারণ নেই। তবু আমাকে তো চেষ্টা করতেই হবে।

অন্ধকার বাথরুমে দাঁড়িয়ে আমি জানালার দিকে চেয়ে ফিস ফিস করে বললাম, ওহে, ও মশাই, শুনছেন!

হিঃ হিঃ করে একটা রক্ত-জল-করা হাসি শোনা গেল। জানালায় ভেসে উঠল একটা অতিকায় খচ্চর ও ধূর্ত ভূতের মুখ। সে মুখের বর্ণনা দিতে যাওয়া বৃথা। ভূতেরা যেমন হয় তেমনই। গোল গোল চোখ, বড় বড় দাঁত, কাঠ-কয়লার মতো চামড়ার রং।

মাথা চুলকে আমি বিনীতভাবেই বললাম, আমার বউকে আপনি কি কোনো ইনফর্মেশন দিয়েছেন!

ভূতটা হিঃ হিঃ করে হেসে বলল, তাতে ক্ষতি কি? তোমাকেও দু একটা দিই তোমার বউ সম্পর্কে।

আমি অবাক হয়ে বলি, আমার বউ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

খুব জানি। এই তো গত বছর বিজয়া দশমীর দিন বলাইদের ছাদে বলাই ওকে···। তাছাড়া বিদ্যুতের সঙ্গে সেবার মধুপুরে গিয়ে···। আরো আছে। শুনবে?

আমার কান বেশ গরম হয়ে উঠল। মাথা নেড়ে বললাম, একদিনে বেশি সইতে পারব না। আস্তে আস্তে হবে।

আবার সেই হিঃ হিঃ হাসি, আরে বাবা কলির তো সবে সন্ধ্যে। আরব্য রজনীর মতো হাজার এক রাত কেটে যাবে তবু তোমার বউয়ের কেচ্ছা ফুরোবে না। তবে বউয়ের বি-এ সারটিফিকেটখানা একবার দেখতে চেয়ো।

আমি তাড়াতাড়ি চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলাম। মাথাটা কেমন করছিল। বউয়ের পাশে এসে যখন ফের শুলাম তখন গাটা রীতিমতো রি-রি করেছে।

পরদিন সকালেই আমাদের ঝগড়া লাগল। বলতে গেলে বিয়ের পর সেটাই আমাদের প্রথম ঝগড়া। তবে ঝগড়াটা বেশিদূর গড়াল না। আমার বউ পটলের কথা তুলতেই আমি বলাই এবং বিদ্যুতের কথা তুললাম। বউ আমার মাইনের কথা তুলতেই আমি ওর বি-এ সার্টিফিকেট দেখতে চাইলাম।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আমার বউ কাঁদতে বসল। আমি গুম হয়ে রইলাম। আমরা দুজনেই হেরেছি, না হয় দুজনেই জিতেছি। কিন্তু কোনটা তা বুঝতে পারছিলাম না। আড়াল থেকে ভূতটা হেসে উঠল হিঁঃ হিঁঃ।

আবার একদিন রান্নাঘর থেকে আমার বউয়ের চিৎকার এল, ভূত! ভূত!

দৌড়ে গেলাম, কী হয়েছে ?

তোমার যে বাহান্ন টাকা মাইনে বেড়েছে তা আমাকে বলোনি তো !

একটু মাথা চুলকে বললাম, আমার শখের রনসন লাইটারটা যে গোপনে তুমি তোমার ভাইকে দিয়েছো তাও তো তুমি আমাকে বলোনি। বরং খুঁজে না পাওয়ায় তুমি বলেছিলে নিশ্চয়ই লাইটারটা পকেটমার হয়েছে।

বউ অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমিও ওর দিকে। আড়ালে শোনা গেল, হিঃ হিঃ।

কিছু দিনের মধ্যেই আমরা পরস্পর সম্পর্কে বিস্তর তথ্য জেনে গেলাম। পরস্পরের পরিবার সম্পর্কেও। বলা বাহুল্য এর ফলে আমাদের মধ্যে রোজই ঝগড়া লাগতে লাগল। এবং কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করতেই আমরা আর বাকি রাখলাম না। আমাদের দাম্পত্য জীবন একটা অশরীরী হিঃ হিঃ হাসিতে ভরে যেতে লাগল।

তবে বলতেই হবে যে, ভূতটি ছিল ভারী নিরপেক্ষ। পক্ষপাতশূন্যভাবেই সে দুজনকে দুজন সম্পর্কে জানাত। কারো দিকে টানত না।

একদিন সে আমার বউকে চুপি চুপি বলল, কী গো ভালমানুষের মেয়ে, বড় যে দিনের পর দিন হেঁশেল ঠেলেই চলেছ ! কর্তাটি দিব্যি গায়ে ফু দিয়ে মোচ তাইয়ে অফিস আর বাড়ি মাকু মারছে। তা তোমার কি এভাবেই চলবে ? তার অফিস আছে, আড্ডা আছে, তোমার কী আছে বলো। এবার ধরে পড়ো, তোমাকে নিয়ে গিয়ে কোথাও বেড়িয়ে টেড়িয়ে আসুক। সিনেমা বায়োস্কোপেও তো যাও না। আর রুপটান, শাড়ি, গয়না, এসেন্স এসবও কি লাগে না তোমার ?

এর পরই সে আমাকে কানে কানে বলল, রোজ ওই টালট্যালে ঝোল আর ভাত খেয়ে খেয়ে অরুচি হয় না তোমার ? কোথায় গেল মায়ের হাতের সেই মোচার ঘণ্ট, পোলাও, মুড়িঘণ্ট, নিমঝোল ? বউ যা রাঁধে তাই সোনা হেন মুখ করে খাও, ও কেমন ধারা ? পুরুষ হবে পুরুষের মতো। হুকুম করবে, তামিল হবে। বিয়ের শালটা রিপু করতে পারে, ডালের বড়ি দিতে পারে, কত কি করার আছে মেয়েদের। করছে কি ?

তাই বলছিলাম, ভূতটি ভারী নিরপেক্ষ।

যাই হোক এরকমভাবে বেশিদিন চলে না। ভূতের ষড়যন্ত্রে আমার ও বউয়ের মধ্যে সম্পর্কটা এমনই ঘোরাল হয়ে উঠল যে, আমরা পরস্পরকে রীতিমতো এড়িয়ে চলতে লাগলাম। কেউ কাউকে একদম সইতে পারি না। একদিন বউ বলল, ভূতটা দিন দিন খুব পেয়ে বসছে।

আমি সায় দিয়ে বললাম, ব্যাটাকে আর পাত্তা দেওয়াটা ঠিক হবে না।

তাহলে কী করবে ? বাড়ি ছাড়বে ?

ছাড়তে তো অরাজি নই। কিন্তু বাড়ি পাওয়া কি সোজা ? ভাড়ার রেটও দ্বিগুণ বেড়েছে।

এরকম কথাবার্তা বলতে বলতে আমি আমার বউয়ের বাঁ গালে কালো জড়ুলটার

সৌন্দর্য লক্ষ্য করলাম। আমার বউও মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার লম্বা নাকটার দিকে চেয়ে ছিল।

অনেক দিন বাদে সেই রাত্রে বিভ্রমবশে দুজনে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ামাত্র আড়াল থেকে একটা গলা খাঁকারির আওয়াজ এল। খোনা গলায় ভূতটা বলে উঠল, দেখছি কিন্তু।

বউ ছিটকে সরে গেল। আমিও ঠাণ্ডা মেরে গেলাম। কিন্তু দুজনেই বুঝলাম, এভাবে পারা যায় না।

খুবই সংকোচের সঙ্গে বাড়িওয়ালাকে কথাটা বললাম, দেখুন ইয়ে···এ বাড়িতে বোধহয় একজন ইয়ে আছেন। তা সেটাকে যদি তাড়ানোর একটা ব্যবস্থা করা যায়···

বাড়িওলা তেড়িয়া হয়ে বললেন, পছন্দ না হলে বাড়ি ছেড়ে দিন না মশাই, আমার তিনশো টাকার অফার আছে। আর ভূতের কথা বলছেন তো! ও আমার সেজো কাকার ভূত। বড় ভালবাসতেন আমায়। ওঁকে তাড়ানোর কথা মুখেও আনবেন না

মুখ চুন করে ফিরে আসতে হল। বউকে বললাম, এভাবে হবে না। শোন, এরপ থেকে ভূতটা গায়ে পড়ে কিছু বলতে এলে পাত্তা দিও না।

তুমিও পাত্তা দিও না।

দিনসাতেক আমরা ভূতটার কোনো কথাই তেমন গ্রাহ্য করলাম না। বলা বাহুল্য গ্রাহ্য করার মতো অনেক কথাই কিন্তু ভূতটা বলেছিল সাত দিনে। অনেক ন্যায্য কথাই। তবু আমরা না শোনার ভান করে রইলাম।

এমন কি একদিন তিন মাস খরার পর আমি আর আমার বউ পরস্পরকে একটুখানি চুমুও খেয়ে ফেললাম। অবশ্য একথাও ঠিক যে, চুমু খাওয়াটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং বলা ভাল একটা অসৎ শক্তির বিরুদ্ধে ওটা ছিল আমাদের বাঁচার লড়াই

ঠোঁট থেকে ঠোঁট ভাল করে সরাইনি তখনো, হিংসুটে ভূতটা ফুঁৎ করে আমাদে দুজনের মুখের ওপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল, ওটা কী হল শুনি! ঘেন্না করল না তোমাদের? লজ্জা হল না?

বলতে কি আমাদের একটু ঘেন্না আর লজ্জা হতে লাগল। একটু সরেও গেলা দুজনে। যথেষ্ট রুক্ষ করে তুলতে গিয়েও খুব করুণ শোনাল আমার গলা, কী কর বলুন, আমাদেরও বাঁচতে হবে।

বাঁচার জন্য চুমু খেতে হয় জন্মে শুনিনি বাবা। যাও গিয়ে মুখ-টুখ ভাল ক ধুয়ে ফেল। তারপর মাঝখানে পাশবালিশ রেখে দুজনে দুজনের দিকে পিঠ ফির শুয়ে থাকো।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। খুবই অসহায় লাগল। ভূতটা ভূত হলে আসলে বাড়িওয়ালার সেজোকাকা। অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় বুড়োমানুষ। তার চোখে সামনে ঢলাঢলি করাই বা যায় কি করে?

আমরা মুখ ধুয়ে এলাম। মাঝখানে পাশবালিশ রেখে পরস্পরের পিঠ ফির শুলামও। কিন্তু শোওয়ার আগে বউয়ের জড়ুলটার দিকে নজর গেল। তা টানছে জড়ুলটা। বউও দেখি আমার লম্বা নাকটার দিকে বিহ্বল হয়ে চেয়ে আছে

পরদিন আর সত্যিই পারা গেল না। দোষ আমাদের নয়, বউয়ের জড়ুল আর আমার লম্বা নাকের। বলতে কি, পাশবালিশ অতিক্রম করার পাপ আমাদের নয়, তাদের।

কিন্তু দৈববাণীর মতো বাড়িওয়ালার সেজোকাকার ভূত বারংবার সাবধান করতে লাগল, ওরে. ও কাজ কারসনি। ওসব কি ভাল? ছিঃ ছিঃ, তোরা না ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে? ওরে শোন, বউয়ের সঙ্গে আমারও মাঝে মাঝে ওরকম ভাব ভালবাসা হত। তবু আমি দুবার সন্নিসি হই, তিনবার সুইসাইড করতে যাই, একবার মাথা খারাপ হয়। শেষ দিকে মদ গাঁজা ধরে ভ্যাবলা হয়ে গিয়েছিলাম।…অ্যাই, খবর্দার বলছি, ওসব করবি তো কাল এ ঘর থেকে জোড়া লাশ বেরোবে। একেবারে শেষ করে ফেলব।…তোদের পায়ে পড়ি, করিস না ওরকম, তাহলে কিন্তু আমাকে সুইসাইড করতে হবে…ছিঃ ছিঃ, কী ঘেন্না…ওরে…ওফ্…

ভূতের গলার স্বর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল। তারপর আর শোনা গেল না।

আমি আর বউ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান খাড়া করে রইলাম।

ভূতটা যে মরেছে মাসচারেক বাদে সে বিষয়ে আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আমার বউয়ের পেটে সেই ভূত এখন ভবিষ্যৎ হয়ে নড়াচড়া করছে।

॥ ৩ ॥

এখন কটা বাজে?

এক যন্ত্রণাময় মৃত্যুর পর আমি অন্য এক জগতে চোখ মেললাম।

আলো আধাঁরিতে পথ ভাল দেখা যাচ্ছিল না। তবে আবার বাঁ ধারে একটা অন্তহীন কাঁটা তারের বেড়া চলেছে। মাঝে মাঝে শক্ত খুঁটি। নজরদারও আছে বলে শুনেছি।

আমি বাঁ ধারে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলাম। ওদিকটার গাছপালার আভাস দেখা যায়। এ ধারে কিছু নেই। একদম কিছু নেই। ন্যাড়া, এবড়ো খেবড়ো জমি আর তার ওপর দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা পথ।

একটু দূরে টাওয়ার। খুব উঁচু। অনেক সিঁড়ি। ফুরোতেই চায় না, একটার পর একটা ধাপ। আমার হাঁফ ধরছে না। উঠছি তো উঠছিই।

ওপর থেকে চটপটে পায়ে একটা ছেলে নেমে আসছিল। থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, কোথায় যাচ্ছো?

একজনকে সি অফ করে আসছি। আপনি ওপরে যান, ওখানে অনেকেই আছে।

ছেলেটা নেমে গেল। আমি একটু ভাবতে ভাবতে উঠতে লাগলাম। ছেলেটাকে চিনি না তো, তবু এমনভাবে কথা বললাম যেন কত কালের চেনা। কাকে সি-অফ করতে গেল? কোথায়?

ক'টা বাজে তা জানতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, আমার হাতে ঘড়ি নেই। যে ছেলেটা নেমে গেল তার কব্জিও ফাঁকা।

একটা চাতালে উঠে এলাম। বেশ উঁচু, এখান থেকে নিচেটা ধু ধু রহস্যের এক গভীর কুয়োর মতো ভয়াবহ। এত উঁচুতেও দু'জন লোক—মাঝবয়সী—রেলিঙের ওপর পাশাপাশি বসে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

হাঁপাইনি, নিশ্বাস নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু আমি দু দণ্ড দাঁড়াই।

একজন লোক অন্যজনকে জিজ্ঞেস করে, সময় জিনিসটা কী বল তো?

একটা ধারণা, বোগাস।

দূর্ বোকা।

তাহলে?

সময় হল গতি। ছোটো থেকে একটা মানুষ যে বড় হয় সেটা তার হয়ে ওঠার গতি। মানুষ সেটা বোঝে না। দিন থেকে যে রাত হয় সেটাও গতি। সূর্যের, পৃথিবীর, তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায়।

আমার ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করি, ক'টা বাজে?

ওরা হয়তো জবাব দিত না। দু'জনেই নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে আছে কুয়াশার মতো আবরণের দিকে। চারদিকেই ওই আবরণ। কী যেন আছে আবরণের আড়ালে। নাকি কিছুই নেই?

একটু ভয়-ভয় করল আমার। আমি ফের উঠতে লাগলাম।

একটা সাদা খরগোস মুখ তুলে তাকাল। মুখে সবুজ কচি ঘাস। নিচু হয়ে তাকে একটু আদর করলাম। সে গ্রাহ্য করল না। সরেও গেল না, ভয়ও পেল না। ঘাস খেয়ে যেতে লাগল।

অনেক ওপরে আর একজন যেন কে উঠছে। তার পায়ের শব্দ শুনছি। সে কে তা জানবার আগ্রহ বোধ করলাম না। আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করছিল, এখন ক'টা বাজে।

উঠছি, উঠছি, উঠছি। একজন যুবতী আচমকা পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যেতে হরিণ-পায়ে একটু থমকায়। তারপর তাকায়।

এলেন?

আসারই তো কথা ছিল। তাই না?

যুবতীটি হাসল। মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, যাই?

তাড়া আছে নাকি?

না, না। আমি তো বরাবরই এরকম। একটু তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভাঙতে ভালবাসি।

কত সিঁড়ি, তাই না?

হ্যাঁ, কত সিঁড়ি।

আচ্ছা এখন…

বলতে গিয়েও আমি সতর্ক হই। "কটা বাজে" কথাটা আর উচ্চারণ করি না। থাক গে, জেনে নিলেই হবে। তাড়া নেই।

যুবতী উঠে যায়।

একজন মিস্ত্রি সিঁড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে উবু হয়ে বসে। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট কি? গায়ে শার্ট? না, আমার চোখের ভুল।

একটু দাঁড়াই। দেখি। লোকটা উবু হয়ে বসে সিঁড়ির খুঁটিনাটি দেখছে। হাতে মেরামতির যন্ত্র।

কী দেখছেন?

দেখছি কোথাও ভেঙেছে কিনা।

পেলেন কিছু?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে না, শালারা ভাল বানায়।

কোথাও ভাঙেনি? ফাটেনি?

না। কতকালের সিঁড়ি, তবু কী মজবুত!

কতকালের···?

বলেই আমি জিভ কাটি। অনেকটা "কটা বাজে" গোছের প্রশ্ন। আজকাল মিস্ত্রিদের হাতে ঘড়ি থাকে। এ লোকটার হাতে নেই।

উঠছি। উঠছি। উঠছি। বেশ লাগছে। গরম নেই, শীত নেই। আলোর সঙ্গে অন্ধকার অবিরত মিলে মিশে যাচ্ছে চারদিকে।

কাকু!

মায়ের কোলে একটা ছেলে। রেলিঙের পাশে দাঁড়ানো তার মায়ের কোল থেকে আমার দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে।

একটু হাসলাম। হাত নাড়লাম।

ওপারে যাচ্ছো কাকু?

যাচ্ছি।

আমার বাপিকে দেখলে বোলো···।

বলব।

কী বলব তা জিজ্ঞেস করলাম না, জানি। জানি, কিন্তু কি করে জানি?

উঠছি। হাঁফ ধরছে না। ক্লান্তি নেই। তবু একটু দাঁড়াই। উঠতেই তো হবে। উঠতে উঠতে যতটা দেখা যায়।

কিন্তু দেখার কিছু নেই। ম্লান গোধূলি, সিঁড়িতে না শীত না গ্রীষ্ম।

মোটা একজন মানুষ ওপর থেকে নামছে।

কি খবর?

এই তো, আপনি?

ভাল ভাল। যান, ওপরে যান।

আপনি নিচে নামছেন বুঝি?

নামি একটু। নামাও যা, ওঠাও তাই। একই তো।

লোকটা একটু হাসল। লক্ষ করলাম, তার হাতে ঘড়ি নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ক'টা বাজে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

আমি কি দু ধাপ নামবো? নামাও যা, ওঠাও তো তাই?

তবু আমি উঠছি। উঠছি। উঠছি। কোথাও যাচ্ছি কি? যাচ্ছি বোধহয়।

একটা রুমাল কে ফেলে গেছে সিঁড়িতে। আমি নিচু হই। হাত বাড়াই। সবুজ রুমালের এক কোণে হলুদ সুতোয় লেখা 'এস'। চোখে জল আসে, হাতটা গুটিয়ে নিই। জানি, রুমালে সুগন্ধ আছে, আছে আমন্ত্রণ। তবু নিই না। নিতে নেই, দেওয়ারও তো কিছু থাকতে পারে না এখানে। উঠতে উঠতে একবার পিছু ফিরে চাই। সিঁড়িতে পড়ে আছে সবুজ রুমাল। বহুকাল ধরে পড়ে আছে আমার জন্যই। যাক।

আমি উঠছি। উঠছি। উঠছি। মাঝে মাঝে শুধু জানতে ইচ্ছে করে, এখন ক'টা বাজে। এখন ক'টা বাজে!

চালচিত্র

কে হে বট বাঁশের দোলাতে চেপে যাচ্ছো চলে শ্মশানঘাটে ? কে হে বট ? তোমার
টিবাটি রইল পড়ে জুড়িগাড়ি কে হাঁকাবে ? কে হে বট ? যাচ্ছো চলে…

এই সময়টায় কাশি এসে পড়ে। গলায় কে বিচুটি ঘষে দিয়েছে বটে। কাশিটার
কানও বাপ-মা নেই। সেই কবে থেকে সেঁদিয়ে আছে। কাশির তাড়সে তামাক
গাছ, তেঁতুল গেছে, পাকা কলার ছায়াটি মাড়ানো পাপ। বটেশ্বরকে বাঁচতে হচ্ছে
সব ছাড়াই। গান-বাজনা যাই-যাই করেও একটু ছিল। এখন তাও যায় বুঝি।

কাশিটা কিছুক্ষণ নাগাড়ে হয়ে যেতে লাগল। কোন বেটাচ্ছেলে শিরীষ কাগজ
দি করিয়েছে গলার মধ্যে। তারপর ঘষটাচ্ছে আর ঘষটাচ্ছে। শব্দ সাত পাড়া
রে শোনা যাচ্ছে। শুধু নিতাইয়ের মায়ের কানেই বোধ হয় যাচ্ছে না। পুরোনো
তেঁতুল আর এথোগুড় জলে গুলে খেলে কাশি ফর্সা। তা এ বাড়িতে দুটোর
কানওটারই যোগাড় নেই। যোগাড় অনেক কিছুরই নেই। এ বেলা হাঁড়ি চড়ে তো
-বেলা চড়ে না। বটেশ্বরের তিন ছেলে তিন রকমের কুষ্মাণ্ড, বড়টা ছিঁচকে চোর,
খন হাজতে আছে। মেজোটা হাবাগোবা, ছোটটা বাউণ্ডুলে, যাত্রা দলের নটবর।
ড়ে এখনও একটা সোমত্থ মেয়ে। সংসারের হাল দেখে বটেশ্বর এখন ফাঁক বুঝে
ক করে মরে যাওয়ার তালে আছে। চোখটি বুজে ফেললে আর কার বোঝা কে
. যতক্ষণ শ্বাস চলছে ততক্ষণই এই কাশির কষ্ট, ভাতের কষ্ট, ছেলের কষ্ট,
য়ের কষ্ট। কত মাপের কত দুঃখ আর কষ্ট, জুড়ে-জুড়ে সেলাই করে তবে
শ্বরের জীবনের কাঁথাখানা ভগবান বানিয়েছেন। অনেক হয়েছে, এখন বটেশ্বর
াঁথাখানা খুলে ফেলে দিয়ে একখানা ভোঁ-দৌড় মারতে চায়।

কাশিটার পর শরীর একটু হাঁদানো লাগে। বটেশ্বর রোদে পা ছড়িয়ে মাটির
লে হেলান দিয়ে বসল। যতক্ষণ রোদ থাকে ততক্ষণ বটেশ্বর যতদূর পারে
জকে উল্টেপাল্টে রোদে বেগুনপোড়া করে রাখে। শীতটা ঘনিয়ে উঠছে খুব।
বাঘা মাঘ। এমন কাঁপন দেবে এবার 'বাপ' ডাকিয়ে ছাড়বে। কিন্তু এই

সারাদিন রোদে ভাজা-ভাজা হয়েও লাভ নেই। যে-ই সন্ধেটি নামল অমনি একেব অাঁত-অবধি অবশ করে দিয়ে ভেজা কাঁথার মতো শীতও এসে সাপটে ধরল।

বটেশ্বর খানিক জিরিয়ে উঠল। যতই ভাঙা কুলোর মতো ফেলে রাখা হে তাকে, সে যতদিন না নির্ঘস মরছে ততদিন বাড়ির কর্তা। এই যে তিনখানা টি চালের ঘর, দরমার বেড়া, ইঁটের গাঁথনির ওপর, মাটির পলেস্তারা দেওয়া ভিত এ বল গেলে তার নিজের হাতেই গেঁথে তোলা। এক সঙ্গে নয়, তিনখানা ঘর তুলতে ব পাঁচেক লেগেছিল। প্রথমটায় নতুন টিন রোদে এমন ঝিক মারত যে, মাইলটাক দ থেকে মালুম হত, ওই হল গো বটেশ্বরের ঘর। রং করার পয়সা ছিল না বলে সেই টিন এখন মরচে ধরে ঝুরঝুর করছে। মাটির ভিতেও মাটি আলগা হয়েছে অনেককা বিস্তর গর্ত। ডেবেও গেছে কয়েক জায়গায়। বেড়ায় মেলা হোঁদল। উঠোন দশাও চোখে দেখা যায় না। মাঝখানটা যাহোক একটু নিকোনো বটে, কিন্তু ঘেঁষে ঘেঁষে বুক সমান জঙ্গল উঠেছে ঠেলে। ঘণ্টা দুই কোদাল চালালেই সব উ গিয়ে ফের ন্যাড়া হয়ে যায় উঠোন। কিন্তু কোদালটা টেনে তুলবেটা কে? তিন ছেলেই কুষ্মাণ্ড। বটেশ্বর তো এক বুক শ্বাস টানতেই নেতিয়ে পড়ে।

চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখল বটেশ্বর। রোজই দেখে। বেলাটা বাড়লে শরীরট একটু ছাড়ে। উঠোনের পশ্চিমধারে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে বটেশ্বর দেখল, উনু জ্বালাই হয়নি আজ। নিতাইয়ের মা বোধ হয় পাড়া-বেড়াতে গেল। সাঁদটাকে দেখা যাচ্ছে না কাছেপিঠে। পাড়া-বেড়াতেই গেছে বোধ হয়, নয়তো শাকপা তুলতে।

চোরের বাড়ি বলেই বোধহয় এ-বাড়িতে চোর আসে না। আর এসে করবেই কী? ছুঁচো মারলে নিজের হাতেই গন্ধ। বটেশ্বর তাই দোর খোলা রে বেরোলো।

আজ খুব নিতাইয়ের কথা ভাবছিল সে। ব্যাটা চোর বটে, কিন্তু চুরি কর বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেনি আজও। আজকাল তো সোজা বাপের কাছে বিড়ি আর ম্যাচিসের পয়সা চায়।

তেমন তেমন চোর হতে পারলে চোরের বাপ হয়েও সুখ ছিল। যত লো লুটেপুটে খাচ্ছে চারদিকে। নিতাই সেসব নয়। সে হল গ্যাদড়া চোর। লোক ঘটিটা-বাটিটা সরায়। চোরের মারও খায়। দেগঙ্গার তোতারামের মোটর কারখান ঢুকে ব্যাটারি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। হাটুরে কিল তো খেলই। তার ও আরও পাঁচটা চুরির মামলা ঘাড়ে চাপিয়ে পুলিশ হাজতে চালান দিল। তিন মা মেয়াদ হয়েছে, তার দু মাস পেরিয়ে তিন মাস চলছে। ছাড়া পেড়ে বাড়ি এলে সকলের আহ্লাদ হবে এমন নয়। তবে জেল খাটছে বলে বুকের মধ্যেটায় একটু কে করেও যেন। শ্বাসবায়ুটার বড্ড বাধা হয় এক এক সময়ে।

বটেশ্বর তার স্থাবর সম্পত্তি দেখতে একটু বাইরের দিকে এল। উত্তর দিকটায় মে রাস্তা, দক্ষিণে জঙ্গল, পুবে গিরিধারীদের বাড়ির হাতা, পশ্চিমে পুকুর। মাঝখা

ারে কেটে কাঠাপাঁচেক জায়গা হবে। এটুকু বটে নির্যস বটেশ্বরেরই। তা এই অজ াড়াগাঁয়ে এটুকুরই বা দাম কী? নাবাল জমি। বর্ষায় এক হাঁটু জল হয়।

বাইরে ফর্সা রোদে দাঁড়িয়ে তবু বটেশ্বরের বুকখানা একটু ঠেলে উঠল। অনেকের া পাঁচ কাঠা বাস্তুজমিও নেই। তার চেয়েও মেলা গরিব রয়েছে সংসারে।

জঙ্গলের দিক থেকেই বটেশ্বরের দু নম্বর কুষ্মাণ্ডটা বেরিয়ে এল। চেহারাটা রাপ ছিল না। কালোর মধ্যে মিঠে একখানা ভাব আছে মুখে। চোখ দুখানা নাটানা। তাকালে মায়া হয়। কিন্তু ওইখানেই যত গণ্ডগোল। ওই ড্যাবা াবা চোখের পিছনে কোনও মগজের খেলা নেই। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হল, নেও রাতে বিছানা ভিজিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে. খিদে পেলে বাচ্চা খোকার মত াঁদে ওঠে, কথাবার্তায় এখনও আড় ভাঙেনি। সে যাহোক এক রকম সয়ে যেত, ন্তু বিপদ হয়েছে রাস্তায় বেরোলেই গাছের ছেলেপুলে ওর পিছুতে লাগে। ল্যাং রে ফেলে দেয়, ঢিল মেরে মাথা ফাটায়, জামা ছিঁড়ে দেয়, অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়ে য়। ছোঁড়া মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে গালমন্দ করে বসলে তখন সবাই মিলে পিটিয়ে তের সুখ করে নেয়। দু নম্বরের কথা ভেবেও বটেশ্বরের শ্বাসবায়ুটা কাঁপে মাঝে ঝে। মারধর বটেশ্বরও কিছু কম করে না বলাইকে। মায়ের হাতে মার খায়, ানের হাতে মার খায়, ভাইদের হাতে মার খায়, পাড়াপড়শীর হাতে মার খায়। টা শরীরে আর কত সইবে ওর? মার খেয়েই না একদিন মরে।

আজও খেয়েছে। ছেলেটা একটু কাছে এগিয়ে আসতেই বটেশ্বর দেখতে পেল, থার চুল খামচানো, গলায় দগদগে লাল দাগ, গালে কার আঙুল বসানোর দাগ ট আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বটেশ্বর রক্তচক্ষুতে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল। আগে মায়া হত, যারা মেরেছে াদের ওপর রাগও হত, এমন কি ছেলের হয়ে তাদের সঙ্গে গিয়ে ঝগড়াও করে এসেছে ুবার। আজকাল আর মায়া হয় না। মনে হয়, মেরেছে বেশ করেছে। মেরেও াধ হয় ফেলবে একদিন। শিবু আর নন্দর দল হল গাঁয়ের সবচেয়ে ওঁছা। ারা না পারে হেন দুষ্কর্ম নেই। ধুতরো-বিচি আর করবীর গোটা খাইয়ে বলাইকে ারা প্রায় বৈতরণী পার করে দিয়েছিল একবার।

কোথায় গিয়েছিলি? বলে বটেশ্বর একটা চড় তুলল। কিন্তু অত বড় চড়টা ানোর মতো জুত নেই শরীরে। কষালে চড়ের ধাক্কায় যে নিজেই কাটা কলাগাছের তো ভূমিশয্যা নেবে।

বলাইও চড়টা উঠতে দেখল, কিন্তু গা করল না। ডান হাতে ডান চোখ কচলাতে াতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, মেরেছে।

তা তো হাল দেখেই বুঝেছি। যাস কেন?

খুব মেরেছে।

বাতাসে গন্ধটা শুঁকল বটেশ্বর। ভাল গন্ধ নয়। এই সাত-সকালেই ছোঁড়াকে খেনো গিলিয়েছে।

কী খেয়েছিস হারামজাদা ?

নন্দ দিলে যে। খেতে বিচ্ছিরি। বলল না খেলে জুতোপেটা করবে।

তাই খেলি ?

খেলুম। সঙ্গে বাদাম ছিল।

ওঃ সেই লোভে।

বটেশ্বর কি আর বলবে! ছেলেটার তো খিদেও পায়। খিদে পেলে চো রাখতে পারে না। আপনাপর ভেদবুদ্ধি নেই বলে নানা কাণ্ড করে বসে। দোক থেকে খাবার তুলে খায় বা কারও হেঁসেলে ঢুকে পড়ে পিঁড়ে পেতে বসে যায়, নয় কারও পাত থেকেই খাবলা মেরে তুলে খায়। তার জন্য লাঞ্ছনা গঞ্জনা কিছু কম না। বাড়ি বয়ে এসে কত লোকে আকথা কুকথা বলে যায়।

হ্যাঁ রে, রাস্তার কুকুরে আর তোতে তফাতটা কি তা বুঝতে পারিস ?

বলাই এ কথার জবাব দিল না, বলল, বড্ড পেট গুলোচ্ছে। বমি করব।

যা, ওই পুকুরধারে গিয়ে গলায় আঙুল দিয়ে উগরে দিয়ে আয়। লোভে পা পাপে মৃত্যু।

বলাই টলতে টলতে পুকুরধারে গেল। দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দেখল বটেশ্বর।

হুস হাস করে উত্তুরে হাওয়া ছাড়ল। রোদটা পিছলে যাচ্ছে গা থেকে। বটেশ খয়েরি খদ্দরের চাদরটা আর একটু সেঁটে নিল গায়ে। তারপর উঠোনে ঢুকে ঘ আড়ালে হাওয়া বাঁচিয়ে উঠোনের রোদে বসল। সকাল থেকে পেটে খোঁদল। দা নেই। তবে জল অনেকটা করে সাঁদ করিয়েছে ভেতরে। লাভ হয় না। একটু বা বাদে পেচ্ছাপ হয়ে বেরিয়ে যায়। তা এরকম প্রায়ই হয়, গা-সওয়া।

হেলেদুলে সাঁদ এসে উঠোনে এক বোঝা কচুর শাক ফেলে বলল, বাব্বাঃ, মুখ তো, আস্তাকুঁড়। চিঁড়ে কুটে দিলুম সেদিন, আজ একটু চাইতে গেছি, নন্দীবাড়ি গিন্নিমাগী কত কথাই শোনালে।

চিঁড়ের কথায় বটেশ্বর নড়েচড়ে বসে। শব্দই ব্রহ্ম। 'চিঁড়ে' বলতেই না নতুন চিঁড়ের গন্ধ এসে লাগে, জিভটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠতে চয়ে। বটেশ্বর মে দিকে জুলজুলে চেয়ে রইল, দিলে না বুঝি ?

দেবে! সে আত্মা কি ও-মাগীর আছে ? দিয়েছিল তো মোটে পাঁচসিকে পয় আর একটা ছেঁড়া কাপড়। তা সে-ই তাঁর দানসাগর।

অত কথা কানে গেল না বটেশ্বরের। সে চিঁড়ের কথা ভাবতে লাগল। আঃ চিঁড়ের মতো জিনিস হয় না। নতুন চিঁড়ের সোঁদা গন্ধখানা যেন একেবা গন্ধমাদন।

*　　*　　*

কচুর রসে গা চিড়বিড় করছিল সাঁদর। কচু ধরলেই তার এ রকম হয়। চুল চুলকে ডুমো ডুমো হয়ে ফুলে যায়। কচু খেলে তার গাল ধরে। তবু ওই ক রোজ গিলতে হয়। যেমন গা চিড়বিড় করছে তেমন মন চিড়বিড় করছে চটপা

মতো। রাগের তাড়সে বাজি পটকা ফাটছে মাথায়, চোখে ফুলঝুরির ফুলকি। রাগটা ফেটে বেরোতে চাইছে বলেই নন্দীবাড়ির গিন্নিমাগীর ওপর ঝাল ঝাড়ছে সে। নইলে তার দোষ কী। বিশ্ব সংসারে কোন লোকটা কম বজ্জাত। ওই যে উঠোনে বসে মৌজে রোদ পোহাচ্ছে লোকটা—ও হারামজাদা কি কম বজ্জাত? সংসার থেকে গা বাঁচিয়ে কেত্তন গেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিল। এখনও হাঁ করে বসে থাকে কখন বউ-মেয়ে কিছু জুটিয়ে আনবে। আড়াই বিঘে ধান জমি ছিল, কবে পেটায় নমঃ হয়ে গেছে। এখন শুধু মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু আছে। তিন তিনটে হুমদো ভাইকেও কি সইতে পারে সদি? তিনটে তিন রকমের বজ্জাত। রাগ আর রাগে দিনরাত খাক হয়ে যায় সে। রাগ তার মায়ের ওপরেও—তবে একটু কম।

ঘরে এসে যে ভেজা কাপড়খানা ছাড়বে তার উপায় নেই। মোট চারখানা শাড়ি মায়ে ঝিয়ে ভাগাভাগি করে পরতে হয়। বাহারী জিনিস নয়। নিতান্তই মিল-এর মোটা কাপড়, ছিরিছাঁদ নেই, সাদা খোলে লম্বা পাড়। সকালেই দুখানা জলধোয়া করে গেছে। শুকিয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু ধোয়া কাপড় পরলে মা এসে এমন চেঁচাবে যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। নিয়ম হল, শাড়ি ভেজালে গায়ে গায়ে শুকোও। পরা কাপড়খানা থেকে একটা বিদিকিচ্ছিরি গন্ধ আসছে। কচুর শাক তালার সময় একটা রোগা পেট-পাতলা গরুর লেজ এসে কবার লেগেছিল গায়ে। লজটা হড়হড়ে গোবরে মাখামাখি। আড়াআড়ি সেই গোবরের দাগ এখনও দগদগ করছে শাড়িতে। থাকগে যাক, শুকোক গায়ে, কে তাকে দেখতে আসছে?

আসবেও না কেউ দেখতে এ জন্মে। হবেও না বিয়ে। দুগাছা ব্রোঞ্জের চুড়িও দিতে পারবে ওই হাড়হাভাতে বুড়ো শয়তান? আসল না হোক নকল বেনারসী? দিবের একখানা সস্তা ঘড়ি বা সাইকেল? খাওয়াবে পনেরো জন বরযাত্রীকে? তার চেয়ে মুখে মেচেতা ধরুক, চামড়া আরও খসখসে হোক, মাথার চুল খাক উকুনে আর সেকিতে। এই ভাল সদির। আমগাছ আর দড়ি আছে। একদিন ঝুলে পড়লেই য়। ঝুলবে ঝুলবে করছে অনেকদিন ধরে মনটা।

ঘরে এসে সদি নড়বড়ে চৌকিতে বসে একা একা ফুঁসছিল।

গায়ের চুলকোনি যত বাড়ছে, তত রাগ বাড়ছে সদির, মর মর মর সবাই মর। নন্দীমাগী মর, ভাইগুলো মর, মা মর, বাপ মর, নিকেশ হয়ে যা…

কত লোক লটারি জেতে। গুপ্তধন পায়। সাধু-সন্নিসি এসে তাবিজ কবচ দিয়ে যায়। এই মরুণেগুলোর কপালে তাও জুটল না কোনোদিন। সকাল থেকে কেবল শুরু হয় আঁদার-পাঁদার ঠেঁওয়ে, মেগেপেতে ভিক্ষে করে পেটের যোগাড় করা।

বুড়ো ভোঁদড়টা কাশছে। এমন কাশি যে মাথা ঘুরিয়ে দিল।

সদি কিছুক্ষণ শুনল, তারপর দুমদুম করে পা ফেলে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, গলা টিপে কাশি বন্ধ করব, বুঝেছো?

বুড়োটা সভয়ে মেয়ের দিকে মুখ তুলে চাইল। কথা বলার অবস্থা নয়। কাশির

দমকে নাল গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। গাল গলার রগ কেঁচোর মতো ফুলে আছে।

সদি দাঁতে দাঁত পিষে বলে, দিন-রাত কেবল কাশি আর কাশি। কেন, যাও আরও ফুর্তি ওড়াতে। তেঁতুল চাই, অম্বল চাই, তামাক চাই ঘাড়িঘাড়ি। এখন কেমন? গলায় খন্তাটা এনে ঢুকিয়ে দেবো এখন?

লোকটা ভয় খেয়েছে। হাত তুলে বুঝি মাপই চাইল। তারপর চাদরে মুখ চাপা দিয়ে কাশি আর দম দুটোই আটকানোর একটা চেষ্টা করল, কোনোটাই পারল না।

সদির মাথাটা পাগল-পাগল। বিড়বিড় করেছিল, এখন চেঁচিয়েই বলল, মর মর মর…

বটেশ্বর একেবারে নাভিমূল থেকে কাশি তুলে আনছে। আজ বোধ হয় জীবনের শেষ কাশি কেশে নিতে চায়। এমন খিল ধরেছে বুকে যে দম টানতে পারছে না। যদি বা টানে নাল গিয়ে শ্বাসনালীতে ঢুকে বিষম খায়।

মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে উবু হয়ে কাশতে লাগল বটেশ্বর। একটা কথাও বেরোলো না মুখ দিয়ে। কিন্তু সদির কথাটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে। তাকে মরতে বলছে সদি।

কথাটার জবাবও বটেশ্বরের জানা। সে বলতে চাইছে মরার ফাঁকটাই তো খুঁজছি কবে থেকে। ফাঁকই যে পাই না, তবে ভাবিসনি, কাশির দমকে একদিন ফটাং করে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবেই। এ রকম কয়েকটা জম্পেশ কাল-কাশি হতে থাকুক।

কিন্তু কিছু বলাই গেল না।

সদি অবশ্য দাঁড়াল না। তার সারা গা কুটকুট করছে। পাগল পাগল লাগছে। খিদে মরে গিয়ে মুখে তিতকুটো স্বাদ। কষে ফেনা জমে আছে।

সদি ঘরে এসে একটা আস্ত সুপুরি মুখে দিল। একটা সুপুরি গাছ আছে তাদের। মেলা সুপুরি হয়। খিদে চাপতে হলে সুপুরি খেয়ে কত বেলা কাটিয়ে দেয়। একটু কাঁচা থাকলে ভাল। নেশামতো হয় তাতে, কাঁচা সুপুরির ধক পেট অবধি অবশ হয়ে দেয়।

সদির দাঁত শক্ত। মাংসের হাড় চিবিয়ে ছাতু করতে পারে। শুধু জোটে না এই যা। সুপুরিটা কাঁচাই বটে। চিবোলে লহমায় তার মজবুত দাঁতে পিষে কাদামতো হয়ে যাবে। তাই চিবোলো না সদি, আছে যতক্ষণ থাক।

ঘরে আয়না নেই, কিন্তু পুকুরে জল আছে। সদির এখন একটু নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে। বয়স যে যায়। যৌবন এল বটে, শরীরে বসবার জয়গাই পেল না। তেমন ঠেলে উঠল না বুক, ভারী হল না উরু, কেমন সব দড়ি পাকিয়ে রইল, গুটি পাকিয়ে রইল। কাচের চুড়ি অবধি জোটানো যায় না। আর জোটালেও, রাখতে পারা কি সোজা? কাপড় কাচো, কাঠ টুকরো করো, বাসন মাজো, বেড়া বাঁধো।

কাঁচের চুড়ি কি অত ভর সয় ? পটাপট ভাঙে। ওসব বিবি-হাতের জন্য, তার মতো উঁছা মেয়েদের হাতের জন্য নয়।

সদি সাজে না ঠিক কথা, কিন্তু কখনো সখনো দু-একজন বলে ফেলে, সে দেখতে নাকি মন্দ নয়। তাই একটু দেখতে ইচ্ছে যায় নিজেকে মাঝে মাঝে।

বটেশ্বর আর কাশছে না। রোদের দিকে হাঁ করে বসে আছে। ওভাবেই গলা অবধি রোদ সাঁদ করিয়ে ভিতরটা সেঁকে নেওয়ার চেষ্টা করে বটেশ্বর, সদি জানে। সেঁক তাপ আর দিচ্ছে কে ?

সদি রান্নাঘরে ঢুকে লক্ষ্মীছাড়া চেহারাটা একবার দেখল। নিবন্ত উনুনের পাশে হাকুচ কালো মেটে ভাতের হাঁড়ি বিড়ের ওপর একটু কেতরে আছে। ঢনঢন। মালসায় একটু নুন পড়ে আছে। অ্যালুমিনিয়ামের চারখানা তোবড়ানো থালা আছে পড়ে। রাতে চালভাজা খেয়েছিল তিনজনে। কানাই ফেরেনি, তবে তারটাও বাড়া ছিল, মা তুলে রেখেছে কানাইয়ের ভাগ। একটা কড়াই উনুনে বসানো, তাতে খানিকটা জল। কিছু আনলে সেদ্ধ হবে বলে কাজ এগিয়ে রেখে গেছে সদির মা। এ রান্নাঘরে বেড়ালেও ঢোকে না। ভারী রাগের মুখ করে সদি চেয়ে রইল। তারপর থালা ক'খানা তুলে নিল। ঘাটে গিয়ে ধুয়ে আসবে। ভাতের এঁটো নয়, তবু ধোয়ার নিয়ম।

সুপুরিটা দাঁতের চাপে তিন টুকরো হয়েছে। মুখ ভরে গেল কাঁচাটে সুপুরির তিতকুটে রসে। গলায় ধক লাগছে খুব। মাথাটা ঝিনঝিন করছে। নেশাটা ভারী ভাল লাগে সদির। সুপুরির ধক তার রাগটাকে খেয়ে নিচ্ছে।

যখন উঠোন পেরোচ্ছিল তখন বটেশ্বরের মুখের সামনে কয়েকটা মাছি ভন্ ভন্ করছে। বটেশ্বর নির্বিকার। হাঁ করে গলার ভিতরে রোদ ঢোকাচ্ছে। পিছনে ভর দিয়ে চিতিয়ে আছে একটু, চোখ বোজা। চোখের কোল জলে ভরে আছে।

একবার বাবা বলে ডাকতে ইচ্ছে হল সদির। তারপর ভাবল, থাকগে মরুকগে।

জামতলায় বদ্রী দাঁড়িয়ে আছে। ওই। কোমরে ঠেস দেওয়া সাইকেল। ভারী রোগা আর ফচকে। সদিকে দেখলেই চোখ নাচিয়ে বলে "হবে নাকি ?"

কী হবে তা অবশ্য বলে না। কিন্তু কুপ্রস্তাব বুঝতে পারে না এমন মেয়ে কে-ই বা আছে।

সদি বরাবর মাথা নামিয়ে নেয়। যৌবন বৃথা চলে গেল। মাঝে মাঝে ইচ্ছে যায় শোধ তুলতে, বদ্রীকে বলে দেয়, হবে। না হবেই বা কেন ? এর চেয়ে বেশী আর কীই বা কেলেংকারি হবে তাতে ?

বলা যায় না, বদ্রীর দল একদিন টেনেও নিয়ে যেতে পারে তাকে। ওর পেছনে নন্দ আছে, শিবে আছে। ষণ্ডা গুণ্ডা সব ছেলে-ছোকরা। কোথা থেকে পয়সা পায় কে জানে। মদ খায়, সিগারেট খায় হাতে ঘড়ি বাঁধে। সদি শুনেছে, ওদের মেয়েমানুষও আছে।

তবু কেন যে বদ্রী মাঝে মাঝে তার দিকে চোখ নাচায় তা কে বলতে পারে ?

জামতলার পাশ দিয়েই সরু রাস্তা। আড়চোখে একবার কলির কেষ্টকে দেখে সদি। বদ্রী আজ চোখ নাচাল না। তবে তাকে চমকে দিয়ে বলল, অ্যাই, বলাইয়ের কী হয়েছে রে?

সদি থামল, বলাইয়ের আবার কী হবে। ঘরে নেই তো।

পুকুরঘাটে যা। ডুবে যাচ্ছিল, ক'জন মিলে তুলেছে। মুগী নেই তো!

সর্বনাশ!

সদি হরিণের বেগে দৌড়োলো।

তিন-চারজনে মিলে বলাইকে তুলে এঁটেল মাটির ওপর শুইয়েছে। কাদাগোলায় মনুষ্যাকৃতি নেই বলাই, ঠিক যেন একমেটে একটা মূর্তি। চুল অবধি থকথকে কাদায় মাখামাখি। হাঁ করা মুখ দিয়ে ফুক ফুক করে জল উথলে বেরোচ্ছে।

সদি কাঠ হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে। শুধু হাত থেকে চারখানা থালা খসে পড়ল।

ঘরামি বীরেশ্বর মুখ তুলে দেখল সদিকে। বলল, খুব টেনেছিল শালা। তাতেই মরণ লেখা ছিল।

সদি নড়ল না। তার হাতে পায়ে সাড় নেই।

শান্তি কয়াল সদির দিকে চেয়ে বলল, আমিই আগে দেখলুম কি না, জলেও আমিই প্রথম লাফিয়েছি। কিন্তুক, এ যে সেঁতিয়ে যাচ্ছে, যেন চায়ে ডোবানো বিস্কুট!

* * *

গলা ফেঁসে গিয়েছিল দ্বিতীয় সিনের আগেই। তা ফাঁসবারই কথা। কানাই তো আর মণ্ডলমশাইয়ের পেয়ারের লোক নয়। সে মাল বয়, ফরমাশ খাটে, পা দাবায়, এত সব করে দু নম্বর সীনে তিন মিনিটের একখানা অন্ধ ভিখারির গান গেয়ে হেঁটে যায়। বাঁধা তিন মিনিট, ব্যস পার্ট ওখানেই খতম।

কিন্তু কানাই জানে তার গলা ভাল। মিষ্টি গলা। যত্নআত্তি করলে এই গলা দিয়ে সুরের সঙ্গে ঝকাংঝক টাকাও ঝরে পড়বে। কিন্তু যত্নআত্তি করবে কি করে? একখানা কমফরটারই জোটানো গেল না আজ অবধি। মায়ের পুরনো শাড়ির ছেঁড়া একখানা পাড় গলায় সময় সময় জড়িয়ে রাখে। পরশু কৃষ্ণনগরে পালা ছিল। সীতার বনবাস। জমে গিয়েছিল খুব। কানাই গাইলও ভাল। তবে ক্ল্যাপ পড়েনি। ক্ল্যাপ সব হাতিয়ে নিল মহীন পাল। গায় ভাল। ওস্তাদি গলা। তার গানে ক্ল্যাপ মারতে মারতে লোকের হাতে ব্যথা।

মণ্ডলমশাইয়ের হাঁটুতে বাত ব্যথা। প্রতি রাতে কানাইকে দিয়ে খানিকক্ষণ দাবিয়ে নেয়। কানাই দাবায় আর দাবায়। মণ্ডলমশায়ের নাকের ডাক উঠলে সে পায়ের কাছেই পড়ে থাকে একখানা চট বিছিয়ে। তাতে আর যাই-হোক, রাতটা দিব্যি চারখানা দেওয়ালের মধ্যে কেটে যায়।

পরশু রাতে মণ্ডলমশাইয়ের অন্য রকম ব্যথা উঠল। খাওয়ার পর "কইরে কানাই" হাঁক শোনার জন্য যখন কান পেতে আছে কানাই তখন মল পরা দুখানা পা ঝুমুর ঝুমুর করে মণ্ডলমশাইয়ের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর সারা রাত দরজা বন্ধ।

দোষঘাটের কথা হচ্ছে না। মণ্ডলমশাইয়েরও তো আমোদ আহ্লাদ আছে। মধু হাজরা শুধু চাপা গলায় বলল, আসছে পালার হিরোইন হবে।

কে বল তো ?

চম্পাদাসীর মেয়ে। খারাপ মেয়েছেলে, তবে উদয়পুরের সাহাবাবুদের মেজো ছেলে তপন সাহার রাখা ছিল। তারই মেয়ে। নাম শুনেছিলুম লক্ষ্মী।

এতে কানাইয়ের কিছু গেল এল না। তবে তাকে শুতে হল চার দেওয়ালের বাইরে। বারান্দায়। কৃষ্ণনগরের ব্যবস্থা ভাল নয়। ছোট্ট একখানা ক্লাবঘরের দুটো কুঠুরিতে বন্দোবস্ত। একটাতে মণ্ডলমশাই। অন্যটাতে তারা গাদাগাদি এতগুলো লোক। কানাইয়ের জায়গা হল না।

বারান্দায় শুয়ে গলাটা গেল। সকাল থেকেই বসা-বসা ভাব। বিকেলে ঘঙঘঙে আওয়াজ। দ্বিতীয় সীনে তার নামবার কথা। বাদ পড়লে নরহরির পোয়াবারো। সে তো ঢোকার জন্য মুখিয়েই আছে। কানাইয়ের কপাল তো ওই তিন মিনিটের জন্য খোলে। সে তাই গলার কথা চেপে গিয়ে নেমে পড়ল আসরে।

তারপর গলা দিয়ে যা বেরোলো তা গাধা আর বেড়ালে মেশালে যা হয়। একেবারে কেলেংকারির একশেষ। কানাই যত গলা তুলতে চায় গলা তত টেনে নামায় তাকে। হাসি টিটকারির হল্লা বয়ে যেতে লাগল চারধারে। ভাল গাইলে এরা তার সীনে হাততালি দেয় না কখনো, কিন্তু টিটকারির বেলায় রস দেখ।

মণ্ডলমশাই কম কথার মানুষ। কথার ধার দিয়েও গেলেন না অবশ্য। চটিপরা একখানা পা তুলে মাজায় একখানা লাথি কষিয়ে আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

কানাই চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল।

মধু হাজরা একটু নেকনজরে দেখে তাকে। বলল, পা দুখানা যদি চেপে ধরে পড়ে থাকতে পারতিস।

ধরব গিয়ে এখন ?

পাগল। লগ্ন পার করে দিয়ে দিলি। তার চেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে কয়েকদিন জিরিয়ে নে। সাগরদীঘিতে আসর বসবে সাত তারিখে। ওখানে গিয়ে জুটিস। আমি মণ্ডলমশাইকে ভিজিয়ে রাখবখন।

ভিজবে ?

সে তোর বরাত। লক্ষ্মীদাসীর সঙ্গে ফাস্টনাস্টি হচ্ছে, হতে দে। এ সময়টায় মেজাজ একটু টং থাকে। বুড়ো বয়সে ছুকরিকে সামাল দিতে অনেক মেহনত রে, তুই বুঝবি না। এখন হবে না।

কানাই কাটল।

কৃষ্ণনগর জায়গা ভাল নয়। লোকগুলো কেমন যেন ডাকাতে চেহারার। তার চেয়েও ভয়ের কথা হল কুকুর। রাস্তার কুকুর দিনের বেলায় ভালো মানুষটি, ল্যাং ল্যাং করে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। রাতে এক-একটি বাঘ। তখন তারা জোট বেঁধে তাড়া করে।

কানাইকে বেরোতে হল রাতেই। বেশ নিশুতি রাত। চারদিকটা কুয়াশায় আর জ্যোৎস্নায় একেবারে দুধমুড়িতে মাখামাখি হয়ে আছে। কানাই একটু দৌড়-পায়েই হাঁটছিল। আজ রাতটা পড়ে থাকতে পারত বারান্দায়। কিন্তু মণ্ডলমশাই যা ক্ষেপেছেন তাতে ভরসা হয় না। আসর আজ একেবারে মাটি। বদনাম হয়ে গেল খুব।

শীতলাথানের কাছ বরাবর কুকুর না বাঘ কে বলবে! আর গলার জোরও বটে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে চেঁচানির চোটে।

কানাই একখানা দৌড় মারবে কিনা ভাবল। কিন্তু কুকুরের স্বভাবগতিক সে খানিকটা জানে। দৌড়োলেই পিছু নেবে আর ছিঁড়ে খাবে।

কানাই তাই কুকুর-ঘেরা হয়ে দাঁড়িয়ে ধমকচমক করতে লাগল। কিন্তু ভাঙা গলা, গলায় ধমকও খুলছে না। গলায় গাধা আর বেড়ালের মিশেল ছিল। এখন বুঝল, গলা থেকে গাধাটা সটকেছে, শুধু বেড়ালের ম্যাও ম্যাও বেরোচ্ছে। ওতে কুঞ্জনগরের বাঘা কুকুরদের ভয় খাওয়ার কথা নয়। তারা বরং আরও দু কদম চেপে এল এবং তার মুখের দিকে চেয়ে এমন বকাঝকা করতে লাগল যে মণ্ডলমশাই অবধি লজ্জা পেতেন।

রাতের খাওয়াটা মার গেছে। পেট জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়। পকেটে পয়সা নেই, বিড়ি নেই, দেশলাই নেই। এত 'নেই'-এর মধ্যে পড়ে গেছে কানাই যে, সে নিজেও আছে কিনা তাইতেই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। ভাবতে ভাবতে চোখটা ভিজে উঠল তার। মাজায় এখনো মণ্ডলমশাইয়ের লাথিটা কন কন করছে।

কুকুর-ঘেরা কানাই উবু হয়ে বসল। তারপর বলল, খা বাবারা, খা। নিকেশ করে দে।

তবে উবু হয়ে বসতে দেখে কুঞ্জনগরের বীর কুকুরেরা ভড়কাল। লোকটার ভাবগতিক তাদের সুবিধের ঠেকছে না। তারা কয়েক পা পিছোলো। আরও কিছুক্ষণ তড়পাল।

কতক্ষণ এভাবে থাকতে হত কে জানে। হঠাৎ গোটা পাঁচেক ডাকাতে চেহারার লোক লাঠি হাতে যেন আকাশ থেকেই নেমে এল।

কে র‍্যা ওখানে? কী মতলব? অ্যাঁ!

কানাই উঠতে গিয়ে দেখল হাঁটুতে খিল ধরে গেছে, ঝিঁঝিঁতে পা দুখানা অবশ। সে বলল, আজ্ঞে কোনও মতলব নেই, এমনি বসে আছি…

কিন্তু কথাগুলো কুকুরের ডাক ছাপিয়ে লোকগুলোর কান অবধি গেল না। গলার এখন সেই ক্ষমতা নেই। গলায় যতক্ষণ গাধাটা ছিল ততক্ষণ তবু একটু ভরসা ছিল এখন একা বেড়ালটা সুবিধে করে উঠতে পারছে না।

লোকগুলো লাঠি তুলতেই কুকুরগুলো তফাৎ হল। তবে খুশি হয়ে নয়। এমন একটা বীরত্ব দেখানোর মওকা ফসকে যাচ্ছে তাদের।

লোকগুলো কত লম্বা তা খিদে আর ভয়ের মুখে হিসেব করতে পারল না কানাই।

তবে বসা অবস্থায় মুখ তুলে তার মনে হল, তালগাছ প্রমাণ হবে এক-একজনের আকার। মুখে একটা নিবু নিবু টর্চের হলদেটে আলো এসে পড়ল।

অ, এই সেই লোক। তুফান অপেরার গানাদার। তা এখানে কী মনে করে হে?

কানাইয়ের একটু দেমাকও হল, একটু রাগও হল। দেমাক, কেন না লোকে তাকে দেখেই চিনে ফেলছে। আর রাগ,' তার বসে থাকা নিয়ে অত খতেন কিসের? লোকে কি একটু ইচ্ছেমতো বসেও থাকতে পারবে না নিরিবিলিতে? কোনও আইন আছে নাকি?

যখন উঠে দাঁড়াল কানাই তখন অবাক হয়ে দেখল, লোকগুলো মোটেই তালগাছের মতো লম্বা নয়। তারই সমান সমান হবে। গায়েগতরে অবশ্য দশাসই। কুঞ্জনগরের লোক বোধ হয় খায়দায় ভাল।

সামনেই গোঁফওয়ালা একটা লোক। বলল, কী হে, তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

কানাই কথাটার সোজা জবাব দিল না। বলল, ফের পায়ে ধরে সেধে আনবে। না এনে উপায় আছে!

সেই ম্যাও ম্যাও বেরোচ্ছে গলা দিয়ে, টাগরা জ্বালা করছে। চোখে যেন লংকাবাটা ঘষে দিয়েছে কেউ। না, ঠাণ্ডাটা বেশ জমিয়েই লেগেছে তার।

লোকটা তেমন তেড়িয়া নয়। তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, যাত্রাদলের ওইটেই বিপদ, বুঝলে। আজ রাজা কাল ফকির। তা বলতে নেই বাপু, তোমার গানখানা আমার বেশ ভালই লেগেছিল। কী বলিস রে পদ?

পদ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, গলায় মাল আছে। তা গলাখানা বসালে কীভাবে বাপ!

সে অনেক কথা। গলা বসার পিছনে লক্ষ্মীদাসী আছে, মণ্ডলমশাই আছেন, আছে কানাইয়ের পোড়া কপালও। কিন্তু অত কথা এই গলায় সাপটে ওঠা মুশকিল।

গোঁফওয়ালা বলল, তা রাতবিরেতে কোথায় বেরিয়েছো? কুকুরে ছিঁড়ে খেত যে। রাস্তাঘাটও সুবিধের নয়। যাবে কোথা?

বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলুম আজ্ঞে। মাইল পাঁচেক পথ হবে।

আরে দূর, পাঁচ মাইল ঠেঙাতে যাবে কোন্ দুঃখে? তুমি গুণী মানুষ, চলো রাতের মতো একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

ভগবান যে আছেন এ কথাটা মাঝে মাঝে কানাইয়ের মনে হয়। তবে কিনা ভগবান থাকলেও তাদের মতো মনিষ্যির জন্য নয়। এই যেমন মণ্ডলমশাইয়ের ভগবান আছেন, তাদের গাঁয়ের নন্দীদের জন্যও ভগবান আছেন। এই সব গুরুতর লোকদের মধ্যে ভগবান ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গিয়ে তাদের ভাগে আর ভগবান পড়ে থাকেন না। একা মানুষ তিনি কত দিক সামলাবেন? তবে মাঝে মাঝে এক-একটা এমন কাণ্ড হয় যে, ভগবান হঠাৎ মাছের মুড়ো হয়ে পাতে এসে পড়েন, কখনও বা নতুন একখানা লাল গামছা হয়ে কাঁধে এসে এলিয়ে থাকেন, কখনও বা মণ্ডলশাইয়ের থলি থেকে টাকাটা সিকেটা হয়ে তার হাতে এসে পড়েন। এরকম কাণ্ড ন'মাসে ছ'মাসে ঘটে বটে, কিন্তু

তখন কানাই ভগবানকে ঠিকই টের পায়। নইলে ফুলপুরে পালা গাইতে গিয়ে ওই কাণ্ড ঘটে? সাতটা পাত পেরিয়ে এসে তার পাতেই কেন মুড়োখানা ফেলল লোকটা? গামছাখানার বৃত্তান্ত অবশ্য অন্য রকম। বরুর হাটে গামছার কারবারী হরিহর সাঁপুই তার মায়ের শ্রাদ্ধে কীর্তনীয়াদের একটা করে দিয়েছিল।

ভগবান যে আছেন তা জ্বলজ্যান্ত আজও টের পাচ্ছে কানাই। সামনে পিছনে গোটাকয় লাঠিধারী তাকে নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরগুলোও আসছে বটে পিছু পিছু তবে তাদের আর সেই তেজ নেই। একেবারে চাকরবাকরের মতো অবস্থা।

গুঁফো লোকটার অবস্থা ভাল। বিষয়ী গেরস্ত লোক। গোটা পাঁচসাত ঘর আছে উঠোনের চারধারে। ধানের মরাই আছে। গোয়াল আছে। রান্নাঘর থেকে সেদ্ধ ডালের গন্ধও আসছে।

'বোসো' বলে ঘরে নিয়ে একখানা মোড়া ঠেলে দিল তার দিকে। কানাই বসে পড়ল। লেঠেলরাও সব বসে গেল চারদিকে। বোধ হয়, রাত পাহারা দেয় সবাই।

গুঁফো বলল, আর বোলো না হে, বড্ড ডাকাতের উপদ্রব বেড়েছে। সাঁঝবেলা থেকেই আমরা তাই তক্কে তক্কে থাকি। মাসটাক আগে তিনটেকে ওই শীতলাতলাতেই পিটিয়ে মেরেছি। তাইতেও কি দমে? তবু আসে। তা তোমার অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে কিছু খাওটাওনি! খাবে কিছু?

গলার বেড়ালটাও যাই-যাই করছে। গলার ওপর ভরসা রাখল না কানাই। তবে ঘাড়টা এমন হেলাল যে আর একটু হলেই মাথাটা খসে পড়ে যেত ঘাড় থেকে। বেশী করে না হেলালে যদি লোকটা ভুল বোঝে সেই ভয়টাও তো আছে।

তাহলে বলি গে ভিতরবাড়িতে। আর ওই একটা খাটিয়া আছে, লেপও পাবে। খেয়ে শুয়ে পড়ো। ও আমার ঠাকুর্দার বিছানা। এই মাস দুই হল গত হয়েছেন।

ভগবান আজ গরম ভাতে ভাজা মুগের ডাল হয়ে, আলুপোস্ত হয়ে, চুনো মাছের চচ্চড়ি হয়ে, ডালের বড়া হয়ে নেমে এলেন ধরাধামে। পেটের রাক্ষস বধ হয়ে গেল লহমায়। ভগবান তারপর বিছানা হলেন, তারপর ঘুম হয়ে চেপে বসলেন কানাইয়ের চোখের ওপর। মণ্ডলমশাইকে ডেকে এনে যদি দেখানো যেত কাণ্ডটা!

* * * *

কৃষ্ণনগরের কুকুরদের চিনল হাড়ে হাড়ে নিতাইও। এখনও সড়গড় হল না তার অনেক কিছুই। অন্ধকারে অচেনা ঘরে সে হোঁচট খায়, ধাক্কা খায়, হাত থেকে বাসনপত্র পড়ে যায়, হাঁচি বা কাশি পেয়ে বসে। সে তো গেল ঘরে ঢুকবার পরের কথা। তার আগে আছে কুকুরের ল্যাঠা। কুকুর বরাবরই ছিল, চোরও ছিল। কস্মিনকালে কেউ শোনেনি যে, রাস্তার কুকুরের সঙ্গে চোরের আড়াআড়ি আছে। এও ওকে চেনে, ও-ও একে চেনে। কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু কপালদোষে নিতাইকে মাথা ঘামাতে হয়।

হাড়ভাঙা খাটুনি ছিল বটে, কিন্তু জেলখানা জায়গাটা মোটেই খারাপ ছিল না। দুবেলা খাবার জুটত। ঘুম হত দিব্যি। পাঁচজনের সঙ্গে পাঁচ রকমের সুখ দুঃখের

কথা হত। সময়টা জলের মতো কেটে গেল। তিন মাসের মেয়াদ কোন আদিখ্যেতার হিসেবে কমে গিয়ে দু মাসে দাঁড়াল। হপ্তা দুই হল ছাড়া পেয়ে নিতাই এখন সত্যিকারের জেল খাটছে। জেল খাটা ছাড়া আর কী? সময়ে অসময়ে খিদে চাগাড় দেয়, রাতবিরেতে আস্তানা খুঁজতে হয়, কুকুরের ভয়, মারধোরের ভয়, সাপখোপের ভয়। নিতাইয়ের তো মনে হয়, জেলখানা দিব্যি জায়গা ছিল। আবার ধরা পড়তে নিতাইয়ের আপত্তি নেই। তবে কিনা গাঁ-গঞ্জে পুলিস তো আর হাতের মোয়া নয়। মাইল মাইল জুড়ে পুলিসের ছায়াটিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আর আজকাল গাঁয়ের লোক-গুলোও হয়েছে ভারী বজ্জাত। ধরতে পারলে পুলিসটুলিস ডাকে না, নিজেরাই কিলিয়ে নিকেশ করে দেয়। নিতাইয়ের যা অবস্থা, আড়াইটে কিলও হজম হবে না।

হপ্তা দুয়েক ধরে গ্রহের ফের চলছে। হাত এখনো পাকেনি। ভয়ডর আছে। সংকোচ আছে। চক্ষুলজ্জা আছে। এত সব গেরো থাকলে পেট চালানো দায়। তবু নিতাই যে চেষ্টা করেনি তা নয়। চরণগঙ্গায় মাধব কুণ্ডুর বাড়িতে সিঁধ দিয়েছিল। মাধব কুণ্ডুর মেলাই টাকা। বাড়িতে মালপত্রও মেলা। কিন্তু তার বাড়ি পাকা। সিঁধ দিতে হলে মাটির ভিটে ছাড়া সুবিধে নেই। মাধব কুণ্ডুর মাটির ভিতের একখানা মেটে ঘর আছে। সেখানে সেঁদিয়ে নিতাই পেল কিছু পুরোনো শিশিবোতল, কিছু কিছু লোহালক্কর কাঠের তক্তা। কপালটাই খারাপ। কষ্টেসৃষ্টে একখানা তক্তাই সরাল নিতাই। বেশ ভারী। মাথায় বয়ে মাইল তিনেক হেঁটে তবে এক জায়গায় চার টাকায় বিক্রি করল।

সোনাচরের এক বাড়ি থেকে এক টিন গুড় সরিয়ে ফেলে ট্যাঁকে এল আটটি তংকা। এইভাবেই চলছিল। আলায় বালায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এ জায়গায় এসে শুনল জায়গাটার নাম কুঞ্জনগর। নামটা চেনা। তা ছাড়া, মাথায় একটা কথা টিক টিক করে জানান দিচ্ছিল। হারাধন নস্করের মেয়াদ হয়েছিল সাত বছর। বছর দুই মোটে কষ্টেসৃষ্টে কেটেছে। বাকি মেয়াদটা কাটানোর কথা নয়। তাকে মরুনে রোগে ধরেছিল। নিতাই তার খুব দেখাশোনা করত জেলখানায়। যেদিন হারাধনকে হাস-পাতালে নেওয়ার কথা তার আগের রাতেই হঠাৎ বাড়াবাড়ি হল খুব। বুকে ব্যথা, তার মধ্যেই হাঁসফাঁস করতে করতে নিতাইকে বলেছিল, কুঞ্জনগরের চণ্ডীতলায়—বুঝলি …চণ্ডীতলায়…আছে সব। মেলা জিনিস…

রাতটা কাটেনি হারাধনের।

এই সেই কুঞ্জনগর। চণ্ডীতলাও বেশী খুঁজতে হয়নি। একখানা পুরোনো পোড়ামাটির মন্দির আছে। ভিতরে চণ্ডীর মূর্তিও আছেন। চারধারে নানা আগাছা, এঁদো পুকুর, ফাঁকা জমি। এখানে কী আছে—কোন গুপ্তধন তা কে জানে। চাপে-টোপে জায়গাটা পরখ করেছে নিতাই। কোনো লক্ষণ ধরতে পারেনি।

কোনও গাঁয়ে বাইরের লোকের গা-ঢাকা দিয়ে থাকা মুশকিল। তবে সুবিধে হল কুঞ্জনগরে দু দিন হল একটা যাত্রার দল এসেছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে সে বলে দিচ্ছে, যাত্রাদলের লোক। বাঁচোয়া।

আজ রাতের দিকে নিতাই চণ্ডীতলার হানা দিয়েছিল। রাত ছাড়া সুবিধে নেই। কিন্তু কৃষ্ণনগরের হারামজাদা কুকুরদের সে চিনত না। কোথাও কিছু নেই, দিব্যি গটগটিয়ে গিয়ে সে চণ্ডী মন্দিরের দরজার কব্জা আলগা করছে, এমন সময় খা-খা করে যমদূতের মতো কুকুরেরা তেড়ে এল।

নিতাইয়ের আর কিছু না থাক, হাতে পায়ে চটপটে ভাবটা আছে। সে এক লম্ফে নেমে দৌড় যা একখানা মারল, কুকুরেরা পর্যন্ত অবাক। দম ধরে খানিকটা সোজা দৌড়ে, ফের কিছু আঁকাবাঁকা হয়ে সে এক জায়গায় থামল। একটু জিরিয়ে নিল। তারপর ঘরখানা নজরে পড়ল তার। একেবারে নাকের ডগায় জ্যোৎস্নায় হাসছে। আয়—আয় করে ডাকছে। আহা! কী ঘর। মাটির নরম ভিত। দেখলেই বোঝা যায়, ভিতরে মাল আছে।

নিতাই কাজে লেগে পড়ল।

ভজঘট্ট বাঁধল মোড়াটা। ব্যাটাচ্ছেলে পায়ে লেগে কেৎরে একেবারে রেলগাড়ির মতো গড়িয়ে গিয়ে গদাম করে লাগল একটা লোহার ড্রামে। একেবারে বাজপড়ার শব্দ।

একটা থুপথুপে ভুতুড়ে গলায় কে যেন বলে উঠল কে!

একটু ভড়কে গিয়েছিল নিতাই। এমন শব্দ শোনেনি কখনো। মানুষের গলাই বটে তো! সে পিছিয়ে সিঁদের গর্তে সেঁদিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। কপালটাই খারাপ।

সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফটা সামলাচ্ছে ঠিক এমন সময়ে নিবু-নিবু একটা টর্চের আলো এসে পড়ল মুখে। ঘাড়ের ওপর এক ঘা লাঠি।

নিতাই তাতেই বসে পড়ল। হাতজোড় করে বলল, পেটে দানাপানি নেই, মারলে মরে যাব। ধরা তো দিচ্ছিই, বরং পুলিসে দিন।

গুঁফো একটা লোক কোমরে লাথি কষিয়ে বলল, পুখুরধারে গর্ত খোঁড়া আছে। তোকে মেরে সেখানেই পুঁতব।

আজ্ঞে ও কর্মটি করবেন না। আমি যাত্রাদলের লোক। সকালেই আমার খোঁজ হবে।

যাত্রাদলের লোক! বলে সবাই মুখ তাকাতাকি করল।

গুঁফো বলল, যাত্রাদলে কি মড়ক লেগেছে নাকি। সব খসে পড়ছে যে! তা তোমাকে তো পালায় দেখিনি বাপ।

আজ্ঞে, আমি মেক-আপ করি।

দাঁড়াও, যাত্রাদলের আরও একজন আছে। তাকে ডাকছি। তার আগে বলো তো বাপ, যাত্রাদলের লোক হয়ে সিঁধ দিলে কেন?

যাত্রাদলের একজন এখানে আছে শুনে নিতাইয়ের হয়ে গেল। সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, থানা কতটা দূর হবে বলতে পারেন? না হয় হেঁটেই যাব।

সবাই ফের মুখ তাকাতাকি করতে থাকে। এর মধ্যে একটা লোক এগিয়ে এসে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে, কই দেখি।

ফের মুখে টর্চের আলো। গঁফো জিজ্ঞেস করে, কী হে চিনতে পারছো?

নিতাই মুখখানা নববধুর মতো নামিয়ে ফেলেছিল। বিড়বিড় করে বলছিল, দেশে াইন আছে, থানা-পুলিস আছে, মারধর করাটা কি ভাল? পাপ হবে যে!

ফ্যাসফ্যাসে গলা হঠাৎ বলে ওঠে, আজ্ঞে ছিল। দাগী চোর। তবে গুণী লোক লে মণ্ডলমশাই ছাড়েননি। পুরোনো অভ্যেসবশে করে ফেলে চুরিটুরি। তবে আবার াল ফেরতও দেয় শুনেছি।

গঁফো লোকটা সমেত সবাই অবাক হল। এমন কথা তারা জন্মে শোনেনি। চুরির াল ফেরত দেয়! এর তো পায়ের ধুলো নেওয়া লাগে।

নিতাই ভাল করে বুঝতে পারছিল না কিছু। একটা গণ্ডগুলে ব্যাপার হচ্ছে, এইটুকু যা বুঝতে পারছে। যা শুনছে তা ভুল শুনছে কিনা তাও ভেবে দেখা দরকার।

কানাইকে চিনতে আরও একটু সময় লাগল তার।

গঁফো আর তার দলবল একটু পরামর্শ করে বলল, ওহে, তোমরা কেউই লোক সুবিধের নও। ব্যাপারটা আমাদের ভাল ঠেকছে না। তবে মানে মানে যদি বিদেয় হও তাহলে এ যাত্রায় কিছু আর বলছি না। ওরে পদ, এ দুজনকে ঘাট পার করে দিয়ে আয়।

* * * *

খরচার খাতা থেকে জমার খাতায় ফিরতে বলাইয়ের বিস্তর মেহনত গেল। পাক্কা একটি দিন সে চায়ে ভেজানো বিস্কুটের মতো নেতিয়েই রইল। এমন ঝিম মারল যে ার মা মাঝে মাঝে নাকের সামনে সুতো ধরে শ্বাস চলছে কিনা দেখে নিচ্ছিল।

তবে হ্যাঁ, পুকুরে ডুবে মরতে বসেছিল বলেই বলাইয়ের খাতিরও বাড়ল খুব। শিবে নন্দর গোটা দলটা কাঁধে গামছা নিয়ে চলে এল। কখন কী হয়, তৈরি থাকা ভাল। ধেনো সে-ই গিলিয়েছিল বলে নন্দ বলাইকে ডলাইমলাইটাও বেশী করল। অনেক জল ওগারল বলাই। তারপর ঝিম মারল।

শিবে শ্মশানঘাটে যাওয়ার গামছাখানা কোমরে পেঁচিয়ে নিয়েই হরেন ডাক্তারকে ধরে আনল।

এ বাড়িতে চোরও আসে না। আজ মেলা লোক। বটেশ্বর কাশতে কাশতেও দৃশ্যটা দেখছিল। হ্যাঁ, লোক হয়েছে বটে। বটেশ্বরের বেশ একটু খুশি-খুশিই লাগছিল। তাদের ভারী খাতির করছে সবাই।

নন্দী গিন্নি ঝি দিয়ে চিঁড়ে পাঠালেন। একটু আধটু নয়, এক ধামা। সঙ্গে কয়েক ডেলা গুড়। দেখে সদি হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছিল না। তবে কান্নাটাই এল। অনেক কথা ভেবে এল। সকালেই 'মর মর' বলে সবাইকে শাপশাপান্ত করেছিল। তা সেই শাপই ফলল কি না কে জানে। হাবাগোবা ভাইটা যদি মরে তাহলে কী হবে?

চিঁড়ের ধামা চৌকির তলায় ঢুকিয়ে রাখল সদি। কে খাবে এখন? কার মুখে রুচবে? অপলক চোখে সে বোকা ভাইটার মরুনে মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল

সারা দিন। সারা রাত। বিড়বিড় করে কী বকছে ভাইটা? জ্বর এল নাকি তড়াসে?

শিবে দশখানা টাকা ফেলে গেল বলাইয়ের বিছানায়। বলল, কিছু লাগলে কিনে নিস। ওষুধ আমরাই কিনে দিয়ে যাচ্ছি।

কিনে দিয়েও গেল।

বলাইয়ের চেতনা ফিরল পরদিন সকালে। চোখ চেয়েই বলল, মা, খিদে পেয়েছে।

খিদের কথা শুনলে বলাইয়ের মায়ের রক্ত মাথায় চড়ে। সংসারটা সর্বদাই খাই-খাই করে। আজ রক্ত চড়ল না। চোখের জলে ছেলের মুখ ভাসিয়ে মায়ের গলা বলে খাবি বাবা, অনেক খাবি। পেট ভরে খাবি।

খিদে-পাওয়া আরও দুই মূর্তি এসে উদয় হল দরজায়। কানাই আর নিতাই মুখে দেঁতো হাসি। কেমন যেন জব্দ চেহারা।

* * * *

সব বুঝে সমঝে উঠতে একটু সময় গেল। তারপর সবাই আজ শোওয়ার ঘরে গোল হয়ে বসল। সকলের পেটেই খোঁদল।

ভেজানো চিঁড়ে আর ডেলা ডেলা গুড় সদি বেড়ে দিচ্ছে থালায়। গপাগপ খাচ্ছে সবাই।

বটেশ্বর খেতে খেতে বলল, বরাবর বলে আসছি আমি, চিঁড়ের মতো জিনিস হয় না।

সদি জলে-ভাসা নির্ঘুম জ্বালাধরা চোখে দেখছিল বাপ বটেশ্বর, ভাই কানাই-বলাই নিতাই আর তার মাকে। মরার বাড়া গাল নেই। না, সে আর কখনও মরার গাল দেবে না বাবা। খুব হয়েছে।

চাঁদ ও অতসীকে ভালবাসি

চাঁদের ঘোর লেগে আমি পড়ে ছিলাম ছাদে, শীতলপাটিতে। এক দুরন্ত চাঁদ সাজ আকাশ ভাসিয়ে দিচ্ছে। মনে হয় চন্দ্রাহতের মতো শীতলপাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা বড়ো ভয়ংকর। এমন চাঁদ ও আমি এক সঙ্গে মিলে গেলে প্রায়ই অঘটন ঘটে যায়।

এমন সময় আমার বৌ অতসী ছাদের ওপর উঠে এল। এক পলক আমার দিকে মুখ করে বলল, একা একা ছাদের ওপর শুয়ে চাঁদ দেখা ভাল নয়।

—ভূতে পায়। অতসী বলল।

—অ্যাঁ ?

একা একা চাঁদ দেখা ভাল নয়। অতসী হাসছিল, দুহাত তুলে ওর মস্ত খোঁপাটা ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল। দ্বিধা করছিল, আমার কাছে আসবে না আলসের কাছে যাবে।

এসো না। এক সঙ্গে দেখি। বললাম।

—ইল্লি! আবার হাসল, আশে পাশের ছাদে লোক রয়েছে।

—নইলে আসতে ? আমার সঙ্গে চাঁদ দেখতে ?

হুঁ—উ। তুমি তো লোক খারাপ নও। হাসলাম। অতসীকে রোগা দেখায়। প্রায়ই ভোগে ও। রোগা হাতে টালমাটাল খোঁপাটা সামলিয়ে ও আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

—ঘুমিয়ে পড়ো না। দূরে গলায় বলল।

—পড়লে ?

আলসেয় ঝুঁকে নীচের গলি দেখতে দেখতে বলল—কাতুকুতু খাবে। আর ঝনাৎ করে ওর চুড়ি পড়া হাত শব্দ করে।

—আর ?

—কিছু না।

—বোকা। বলতে পারলে না।

বেশ, বোকা তো বেশ। গলি থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইল। 'ফের লুঙ্গি পরেছ ? যা আমি দেখতে পারি না।' প্রায় ধমক দিল—হাঁটু ঢেকে শোও।

আমি নিঃশব্দে হাসছিলাম। আমি চাঁদ দেখছিলাম।

—জেদ না ?

—আমাকে না দেখ, চাঁদ-ফাঁদ দেখ—বললাম।

তারপর পাশ ফিরে শুই। আড় চোখে দেখি হাত তুলে টপ করে খোঁপা ভেঙে দিল অতসী। রাগের লক্ষণ। গুণ গুণ করে গান গাইতে থাকি—'ও চাঁদ চোখের

অতসী ফিরে দ্রুতপায়ে সিঁড়ির ঘরের দিকে চলে যেতে থাকে।

একা থাকব ? চেঁচিয়ে বললাম।

ইচ্ছে।

যেও না! পিছু নেব কিন্তু। ও সিঁড়ির ঘরের দরজায় পৌঁছুতেই আমি লাফিয়ে উঠি। কিন্তু ধরা গেল না। অসম্ভব দ্রুতবেগে নেমে গেল। চেঁচিয়ে বললাম—চা পাঠিয়ে দিও। উত্তর পাওয়া গেল—কাঁচকলা।

সামান্য হাঁফ ধরেছিল। আবার শুয়ে পড়লাম এই শীতলপাটিতে মাথা রেখে।

আমাদের তিন তলার এই ছাদটা খুব নির্জন আর ছোট্ট। আমি শুয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। দেশলাইয়ের শেষ কাঠিটা শেষ হয়ে গেল। একটা দেশলাই আনানো দরকার। মনে হচ্ছে অতসী আবার আসবে। ইচ্ছে হলো আলসে থেকে ঝুঁকে ঘরের মধ্যেই অতসীকে চেঁচিয়ে বলি, 'আর দেশলাইটা এনো।' উঠতে আর ইচ্ছে হল না। চিৎ হয়ে শুয়ে দুচোখ জুড়ে চাঁদ ভেসে উঠল।

পলকেই সব ভুল হয়ে যেতে থাকে। একষট্টি সালের প্রেম ও তেষট্টির বিয়ে। দেশলাইয়ের শেষ কাঠি ও সিঁড়ির ঘরের অন্ধকারের স্পর্শ ও একটি রোগা হাতে চুড়ির শব্দে ভুল হয়ে যায়। এই জ্যোৎস্না বড়ো মাদক ও অবিবেচক। আমি চাঁদ ও জ্যোৎস্না কি অনেক দেখিনি ? তবু মনে হয় আমার ওপর এই চাঁদ চাঁদ আকাশ 'নিস্তব্ধতার নির্বাহ অধিকার রয়ে গেছে এবং খুব খাঁটি আর অরিজিনাল এবং পুরনো রয়ে গেল। আকৃতি এতটুকু পালটে গেল না। প্রভাব নষ্ট হয়ে গেল না। বোকার মতো চেয়ে থেকে এখনও আমি চাঁদ দেখছি। আমি স্পষ্ট চাঁদের নির্জনতা শুনতে গলির ভেতর পায়ের শব্দ, কোথা থেকে উঠে আসা চা-তৈরি করবার শব্দ, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর

ভাবুক ঘোষকের ধীর কণ্ঠ ভেসে আসা, সব ভুল হয়ে গেল। নিজেকে আজই আদি-অন্তহীন তুচ্ছ মনে হয়। এই মনে হওয়া ভাল লেগে যায়। আমি আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুই। আর একবার 'ও চাঁদ চোখের জলে…' গাওয়ার চেষ্টা করে দেখি—বৃথা।

আমার চেনা জানা কোনও শব্দ দিয়ে কিছুই তৈরি করা যাচ্ছে না। আমি উসখুস করি। গলা চুলকোই। আবার পাশ ফিরে শুই। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। অতসী। অনেকক্ষণ ধরে সিঁড়ি ভেঙে অতসী উঠছে। ক্রমে ঝুলঝুল অন্ধকার সিঁড়িঘর থেকে অতসীর ধীর ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অবয়ব দেখা যায়। বেচারী। অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙতে এক হাতে চায়ের পেয়ালা ও অন্য হাতে সারাক্ষণ মস্ত খোঁপাটা সামলাতে হয়েছে। মায়া হয়।

ঠোঁট-টিপে হাসল। চায়ের জন্য হাঁ করে থাকা হয়েছিল এতক্ষণ? তোমার জন্য।

—'ছাই', চায়ের কাপ দিয়েই পেছন ফিরল।

—'যেও না' বললাম।

—রান্না করছি যে।

—একটু থাকো।

মাথা হেলিয়ে চুপ করে বসে পড়ল—নীচে যেতে ইচ্ছে করছে না।

—একা থাকা ভাল নয়। ছাদেও না ঘরেও না।

—থাকতে দিও না।

—তুমিও দিও না।

—বেশ, কিন্তু কেন, কি হয়?

—ভাল নয় এইটুকু জানি, অতসীর কাছে শিখেছিলাম।

—ভাল নয় বুঝি! বলে চটি খুলে শীতলপাটির আধখানা জুড়ে শুয়ে পড়ল। আমি সিগারেট বের করে বলি—দেশলাই একটা চাই যে…। শুনে অতসী উঠবার ভঙ্গি করে বলে 'আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ইস্, বলে ওকে জড়িয়ে ধরে শুইয়ে দিই। সিগারেটটা আস্তে ছুঁড়ে দিলে চাঁদের আলো কেটে অতি তুচ্ছ বস্তুর মতো আলসের ওপারে উড়ে গেল।

বাঃ, অতসী লাজুক হেসে উঠে ঠোঁট থেকে ঠোঁট সরিয়ে নেয়। আমরা পাশাপাশি নিঃশব্দে শুয়ে থাকি। একষট্টি সালে আমরা প্রেম করি। তেষট্টিতে বিয়ে—মনে পড়ে, তার আগে বরাবর নিজেকে খুব তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল!

—এই, এবারে আমি যাবো। অতসী খুব লাজুক গলায় বলে।

—কেন!

—কেন আবার। তোমার কোন বে-আক্কেলে বন্ধু যদি হট করে উঠে আসে।

—আসলেই কি।

—কিছু না বুঝি। বাঃ।

—কি আবার। দেখবে লজ্জা পাবে…ক্ষমা চাইবে…আর আমরা হাসব।

ও পাশ ফিরল। আমার গলায় ও বুকে ওর লম্বা সরু আঙুলগুলো বুলিয়ে দিয়ে বলল—হিম লাগছে না! এত হাওয়ায় থাকা ভাল নয়।' গলা আলতো জড়িয়ে বলল 'আমি রাঁধব, আমার কাছে বসে থাকবে চল।' চকিতে চোখে চাঁদ ভেসে ওঠে। ওর কোমরের দিকে উদ্যত আমার হাত এলিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে শীতলপাটির ওপর পড়ে থাকে। অতসী নিঃসাড়ে শুয়ে আছে। ঝিম ঝিম ভাব।

নিঃশব্দে, বড়ই নিঃশব্দে চাঁদ তার কাজ ক'রে যায়। তার উদ্দেশ্যে বাসনের করনিক্ষিপ্ত শিল্প ও প্রেমের তীরগুলি কেবলই বিপথগামী হয়।

অতসীর একটা হাত আস্তে আস্তে আমার গলা জড়িয়ে ধরল, ওর নরম ভেজা ঠোঁট আমার কানে এসে লাগল, ওর ঈষদুষ্ণ শ্বাস ও কথা একই সাথে শোনা গেল, 'সোনা আমার সোনা, এবার যেতে দাও।'

—খারাপ লাগছে?

—না।

—তবে?

—কাজ রয়েছে না।

—আর কিছু নয়?

উঠে বসে হাসল, খোঁপা ঠিক করতে করতে বলল, 'কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয়। মনে হয় মরে গেছি। ভয় করে। এমন খোলা জায়গায়।' হাসলাম, 'পাগল'।

—তুমি বেশিক্ষণ থেকো না। বলে চলে গেল। চেঁচিয়ে বললাম 'মাঝে মাঝে এসে দেখে যেও মরে গেছি কি না।'

সিঁড়ির ঘর থেকে ওর ক্ষীণ গলা শোনা গেল 'আজ ঘরে এস মজা দেখাবো।' আমাদের প্রেম বড়ো ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। আমরা আত্মীয় হয়ে গেছি নাকি! মাঝে মাঝে ভ্রম হয়—আমি অতসীকে বড়ো ভালোবাসি। চাঁদ বড়ো ভালোবাসি। মনে হয় আমি বড়ো প্রকৃতি প্রেমিক। কিন্তু হায়, আমি চাঁদ ও অতসীকে ভালোবাসি। এই ভালোবাসা থেকে পরিত্রাণ নেই।

মেঠো ও জংলা চাঁদ আমার দিকে চেয়ে থাকে। ক্রমে ম্যাজিসিয়ানের চোখের মতো সেই জ্যোৎস্না তার সম্মোহনে আমাকে টেনে নিতে থাকে। আমি এক নিঃশব্দ চিৎকার অনুভব করি। গান গাইতে গাইতে যাই। কোনও শব্দ হয় না। অতসীকে ডাকবো—ভাবি। উঠতে পারি না।

হু হু করে আকাশ পেরিয়ে যাচ্ছি—টের পাই। সকলেই আছে—কেউ ছাদে, রান্না ঘরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে, মাঠে। কেউ কি অনুভব করে আকাশ পেরিয়ে যাওয়া। লক্ষ লক্ষ মাইল অনির্দেশ্য গতি—কোথাও চলে যাওয়া চিরকালের মতো। এমন চাঁদ ও আকাশ ও তারাদের সাথে কোন জন্মসূত্রে বাঁধা আছি—অনুভবে আসে কি। আমার জন্ম, আগামী মৃত্যু, আমার চেতনা ও বুদ্ধি এক মুহূর্তেই একচোখ চাঁদের ভিতর দিয়ে প্রয়োজনহীন বলে মনে হয়। আমি ছাদে শীতলপাটির ওপর শুয়ে থেকে, চাঁদে চোখ রেখে নিঃশব্দে সেই লক্ষ লক্ষ মাইল পেরিয়ে যাওয়া টের পেয়ে সমস্ত শরীরে খাড়া রোমকূপ অনুভব করি। মনে হতে থাকে বহুদূর থেকে, সিঁড়িঘর থেকে কে যেন সিঁড়ি ভাঙছে…ভাঙছেই। অতসী, নিশ্চিত অতসী। ক্রমশ তিনতলা…চারতলা…পাঁচতলা…ক'শো তলা অন্ধকার পার হয়। তার পায়ের শব্দ সিঁড়িগুলিকে পরম্পরায় শিউরে দিয়ে আসতে থাকে। সে উঠছে…উঠছে। …কিন্তু কিছুতেই আর আমার কাছে উঠে আসতে পারে না অতসী। পলকে পলকে আমি লক্ষ মাইল পেরিয়ে যাচ্ছি…আ-মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে…আজন্ম এবং জন্মের আগেও। মাঝখানে শুধু কে যেন চেতনা দিয়ে এ চাঁদ ও অতসীর ধাঁধা তৈরী করে রেখেছিল।

অসহায় আমি চাঁদকে প্রত্যক্ষ ও সত্য জেনে ছাদের শানের ওপর হাত ঠুকে বিড় বিড় করে বলি—হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, আমি চাঁদ ও অতসীকে বাস্তবিক ভালোবাসি।